মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা
আলোকপাত
নভেম্বর ১৯৯১ * মূল্য ৯.০০
প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম
পদ্মানদীর মাঝি : সেলুলয়েডে ক্লাসিক
মার্শাল আর্ট : ক্যারাটে কাহিনী
নেপথ্য কণ্ঠদায়িনী
অপহরণের অন্তরালে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান : অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লন্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০, ৩৩১৩৭৪৯, ৩৩১৭৪১৬
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন

বম্বে কার্যালয়:
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬, ২৪৪৮৪৭
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি–১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মাগ হজরতগঞ্জ, লখনউ–২২৬০০১
দূরভাষ: ২৪৮৮৭৮/২৪৬৩০০
ব্যুরো প্রধান। অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯০০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪–২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট– সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

অসম, কাশ্মীর, পঞ্জাব, বিহার, দিল্লি জুড়ে অপহৃত পণবন্দীদের নিয়ে চলছে সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক জুয়া। এসময় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিক নীতিগ্রহণে ব্যর্থ। তাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে জনজীবন। কেন এই অপহরণ? পণবন্দী সমস্যাকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা? এর সমাধানই বা কোন পথে? ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে আলোকপাত।

চোদ্দশ' বছর আগে চীনজাপানে বৌদ্ধসন্তরা আত্মরক্ষার জন্য যে 'ক্যারাটে কৌশল' প্রচলিত করেছেন এখন মার্শাল আর্টের মধ্য দিয়ে তার জনপ্রিয়তার ঢেউ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদন ক্যারাটে-কুংফু'র অজানাকাহিনী পেশ করছে।

রেলওয়ে স্টেশন, হোটেলের লাউঞ্জ, পাতাল রেলের কম্পার্টমেন্ট, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ, রেডিও কিংবা টেলিফোনে সাহায্যকারিণী যেসব অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনি সেইসব অন্তরালবর্তিনীদের অজানা কাহিনী পেশ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়াতেও কমিউনিজমের ভাঙ্গন সারা বিশ্ব রাজনীতির একশ বছরের ইতিহাস ছাড়িয়ে সৃষ্টি করেছে অনন্য নজির। সমগ্র বিশ্ব এখন শংকিত। ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বের এক নম্বর শক্তির আসন নিয়ে আমেরিকাও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অস্থির রাজনীতির পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান ভারতবর্ষও এক বিপন্ন গোলক ধাঁধায়। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতীয় রাজনীতির অভিনব সংযোজনঅপহরণ। সন্ত্রাসবাদী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরীহ মানুষজন ও উচ্চপদাধিকারীদের অপহরণ করে বিনিময়ে মুক্তিপণ হাঁকছে। ভি·পি·সিং প্রধানমন্ত্রীত্বে থাকাকালীন তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবেয়ার মুক্তিপণ হিসেবে জঙ্গী উগ্রপন্থীদের জেলমুক্তি করার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সন্ত্রাসবাদীরাও হাঁকছে মুক্তিপণ বন্দীমুক্তি। এই পণবন্দী অপহরণের অন্তরালে-কিসের চক্রান্ত কাজ করছে? সংবাদ মাধ্যমগুলি কিভাবে পরোক্ষে অপহরণকারীদের সুবিধে করে দিচ্ছে বিশেষ ভাবে সংবাদ শিরোনামে ফলাও করে খবর ছাপিয়ে? অপহরণের রাজনীতি এদেশের বুকে কিভাবে জন্ম নিল? আলোকপাতটিম শারদীয়া-পরবর্তী এই সংখ্যায় বিশদভাবে তদন্তানুসন্ধান করে সংগ্রহ করেছে অপহরণের অন্তরালের যাবতীয় ঘটনাবলী। পাঠক সাধারণের কাছে এবারের এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বিশেষ মনোগ্রাহী হওয়ার দাবী রাখে।

'সব পাখি ঘরে আসে'–জীবনানন্দের বনলতা সেন-এর সেই বিখ্যাত লাইনটি আজও মনে করিয়ে দেয় পাখীদের বিচিত্র জগৎ। যাযাবর জীবন যাত্রার মাঝে শেষে নীড়ে ফিরে যায় মুক্ত বিহঙ্গের দল। এবারে যাযাবর পাখিদের নিয়ে আলোকপাতে রঙিন প্রতিবেদন, 'আশ্চর্য-পক্ষী সংসার।' শীতের শুরুতে যাদের দেখা পাবেন কলকাতার চিড়িয়াখানায়।

রেলস্টেশন চত্বরে এসে কান পেতে বসে থাকি আমাদের গন্তব্যের ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। সামান্য একটু ভুল ঘোষণার জন্য মৃত্যু পথযাত্রী আত্মীয়ার সঙ্গে শেষ দেখা হয় না। নেপথ্য থেকে যাদের কণ্ঠ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে 'অন্ধের ষষ্ঠী'র মত সাহায্য করে সেইসব নেপথ্য কণ্ঠ দায়িনীদের জীবন নিয়েই একটি উপজীব্য ভিন্নস্বাদের প্রতিবেদন।

সন্ত্রাসবাদীদের আগ্নেয়াস্ত্র যখন অগ্ন্যুৎপাত করে অবিশ্রান্তভাবে, কিংবা পথে ঘাটে সশস্ত্র হামলাবাজেরা যখন কথায় কথায় চড়াও হয় তখন আমরা সকলেই ভাবি নিজেদের নিরাপত্তার কথা। তেমনি এক নিরাপত্তার নাম-মার্শাল আর্ট। জুডো, ক্যারাটে, কুংফুর জগত নিয়ে তাই এবারে বিশেষ প্রতিবেদন।

যে মানুষটি দিল্লির শাহী মসনদে বসে সারা দেশ পরিচালনা করছেন সেই পি·ভি·নরসিমা রাওয়ের নিজের গ্রামেই চলুন না আপনাদের নিয়ে যাই, দেখুন সেখানকার হালচাল ও শাসনব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম আপনাদের কেমন লাগল অবশ্যই জানাবেন।

নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে কি এই দশকের শেষে বিশ্ব মানচিত্র হুবহু মিলে যাবে? সেবিষয়ে জল্পনা কল্পনা যতই চলুক জীবনের আঙ্গিক থেকে এখন বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছে 'নিরাপত্তা' নামের শব্দটি। সারা বিশ্ব, সারা দেশ, সারা রাজ্য বিভিন্ন সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক ব্যাপারে তটস্থ। আসুন না, তবুও আমরা এই অনিশ্চয়তার মাঝেও নিজেদের মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সিদ্ধান্তটি বেছে নিই।

আলোক মিত্র

একালের দ্রৌপদীরা

মহাভারতের যুগ শেষ হলেও এই ভারতবর্ষে দ্রৌপদী প্রথা অর্থাৎ বহু পতির প্রথা বর্তমান তা জানলাম সেপ্টেম্বর '৯১ সংখ্যা আলোকপাতের 'চেনা দেশ অচেনা মানুষ' পর্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী 'এই অমরার কিন্নরেরা-তে।' এমন নিত্য নতুন বিষয় বৈচিত্রের উপস্থাপনা আলোকপাতের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আলোকপাতের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েছে, বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি।

প্রতিবেদক গুরুমিত বেদি জানিয়েছেন অনেক তথ্য। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার রমণীরা পরিবারের এক ভাইকে বিবাহ করেন কিন্তু সব-ভাইয়েরই ভর্ত্রী হন। পরে অন্য ভায়েরা আর বিবাহ করেন না। এই কিন্নর সমাজে রমণীদের ওপর সব ভায়ের সমান যৌন অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। এমন প্রথা বোধহয় বিশ্বের কোথাও নেই। আর একালে তো ভাবাই যায় না। তবে প্রতিটি ভাই স্ত্রীকে সমান মর্যাদা দেয়।

এই প্রসঙ্গে জানাই কেবল হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার রমণীরা দ্রৌপদী নয়, অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিংয়া জেলার অধিবাসী গ্যালং রমণীরাও একালে দ্রৌপদীর ন্যায় জীবনযাপন করেন। এনথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তিনজন নৃতত্ত্ববিদ দীর্ঘদিন ধরে কিন্নর ও গ্যালং জেলার মানুষদের ওপর গবেষণা করে জানিয়েছেন, সেখানে পরিবারের কিভাবে আয় বাড়বে, কিভাবে পরিবার ভালভাবে টিকবে, কিভাবে সবাই খেয়ে পরে থাকবে, সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করেন মেয়েরা। তাঁরাই কৃষিকাজে পুরুষদের চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সবচেয়ে মজার কথা হল, আজও কিন্নর ও গ্যালং সমাজে কনে-পণের প্রথা চালু আছে। বর-পক্ষকে সামর্থ অনুযায়ী পণ দিয়ে তবেই কনেকে গ্রহণ করা চলে। এখানকার মহিলারা দ্রৌপদী হলেও তাঁরা ঝুম প্রথায় চাষ করেন। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। এত যুগ পরেও ভারতের বুকে আজ এই দুই এলাকায় সেই পৌরাণিকী ব্যবস্থা চালু আছে দেখে বিদেশিরা নন, খোদ ভারতবাসীরা পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবে এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আজকাল আর কিন্নর ও গ্যালং রমণীরা দ্রৌপদী হতে চান না। তাঁরা শহুরে বিবিদের মত স্বামীর সঙ্গে আলাদা ঘর করতে চান। কিন্তু তাঁদের সমাজই বাধা দেয়। এই সমাজে ব্যবস্থা পালটানো খুবই জরুরী।

পথিক মণ্ডল
নিউ ব্যারাকপুর

আনন্দমূর্তিজী কথা

আলোকপাত' এক প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। আলোকপাতের ধর্মীয় চিন্তা, সংস্কৃতি চেতনা, কুখ্যাত অপরাধ কাহিনী, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ প্রভৃতি বিষয়ক রচনাগুলি প্রশংসার দাবি রাখে। বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনীমূলক প্রতিবেদনগুলিও আমাদের পথ নির্দেশ করে। মোট কথা আলোকপাতের সব ক'টি প্রতিবেদনই নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং নিপুণ রচনা কৌশলে অতুলনীয়।

আলোকপাতের মত উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় যদি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতে পারদর্শী, পাঁচ সহস্রাধিক সঙ্গীত রচয়িতা, নব্যমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা, 'প্রাউট' তত্ত্বের প্রবর্তক, মাইক্রোবাইটার আবিষ্কর্তা, বহু বিতর্কিত ধর্মগুরু শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি ওরফে প্রভাত রঞ্জন সরকারের জীবন রহস্য কি ছিল, তথা 'বিশ্বব্যাপী স্বল্প সময়ে আনন্দমার্গ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল-এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় তাহলে অনেক উপকৃত হব ও চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সনতচন্দ্র মাহাতো
রাঁচী, বিহার

বি.দ্র. আনন্দমূর্তিজীর ওপর এধরনের লেখা আমরা আলোকপাত জুন '৯০ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছি।

পুণ্যাত্মার খোঁজে

আলোকপাত'-এর ১ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকেই আমি এর অনিয়মিত পাঠক। আমি হৃদয় দিয়ে আস্বাদন করেছি এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে বহু ব্যক্তিত্বের জীবনী, কর্মধারা, রাজনীতি, ছল চাতুরী, কেচ্ছা কাহিনীর ইতিবৃত্ত। বিজ্ঞানের উপর যেমন পড়েছি গবেষণামূলক রচনা, তেমনি পড়েছি সর্ব ধর্মের পীঠস্থান এই ভারতবর্ষের বুকে পূণ্যপীঠ সমূহের মাহাত্ম। ১ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় যেমন পেয়েছি পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরের বুকে কৃষ্ণ কামিনী ও বিদ্যাভারতীকে, তেমনি ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যা আমাকে নিয়ে গেছে মহাকুম্ভে স্বামী মৃত্যুঞ্জয়-এ। যেন ঘরের এক কোণে বসে পেয়েছি তাঁদের দর্শন, চিন্তাধারা। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ এর স্রষ্টারা যে আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, তাঁদের চিন্তাধারায় আমাদের সঞ্জীবিত করে যাচ্ছেন-এ খবর যেন নতুন করে আরও একবার 'আলোকপাত' আমাদের জানিয়ে গেল।

'আলোকপাত'কে ধন্যবাদ, সে যেমন ধর্মের সত্য সার অংশটুকু পাঠকদের উপহার দিয়েছে, পাশাপাশি ধর্মের ভান করে যাঁরা ব্যবসা চালাচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে জীবন্ত চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছে। তুলে ধরেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পূর্ণ জেহাদকে। তাই অনুরোধ করছি, নিউজপ্রিন্ট এর দোহাই দিয়ে এর দাম ১০ টাকা করবেন না। তা হলে পড়ার সামর্থ থাকবে না।

নীহাররঞ্জন বসু
আসানগর, নদীয়া

মাননীয় পৌরমন্ত্রী সমীপে

কর্পোরেশন নয়, চোরপোরেশন-এই অর্থবহ অনুপ্রাশটি আজকাল প্রায় সকলের মুখেই শোনা যায়। উন্নয়নের বদলে যদি পৌরসভাগুলি এরকম দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যায়, তাহলে এমন ডামাডোল প্রশাসনিক রঙ্গের প্রয়োজনই বা কি! বস্তুত নাগরিক আর পৌরকর্মীদের মধ্যে এ হেন 'ইচ এণ্ড আদার' প্রথা মার্ক্সবাদী সরকারের যুগে পরিষ্কার সাম্যবাদে পরিণত হয়েছে। মহামান্য পৌরমন্ত্রীকে তাই এ হেন অত্যাধুনিক সাম্যাবাদ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য দিতে চাই

১) এ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে মিউটেশন করাতে গেলে ঘুষ দিতে হয় ১০০ থেকে উর্দ্ধে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত।

২) প্লান মেকারদের কোন বাধা ধরা রেট নেই। এঁরা পার্টি বুঝে রেট বলেন। মনে করুন, এঁদের একজন প্লান মেকারকে যদি মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী পার্টির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাহলে ওই প্লান মেকারকে টাকার অংশ অনুযায়ী পৌরকর্মীকে কমিশন দিতে বাধ্য থাকতে হয়। শতকরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা হিসাবে কমিশন পান।

৩) ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট: আপনি জলের কানেকশন চাইতে গেলে, প্রথমে বলবে এখন তো জলের কানেকশন দেওয়া হচ্ছে না। এবার ৫ থেকে ৭ শত টাকা দিন। এর উর্দ্ধেও চুক্তি হয়। ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে জলের কানেকশন পেয়ে যাবেন।

৪) ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্টে তো আরও ভয়ংকর ব্যাপার। গভর্নমেন্ট এ্যাসেসার ৫ বৎসর অন্তর এ্যাসেসমেন্ট করে যায় প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে। বাড়িওয়ালাকে ৫০ টাকা ট্যাক্স হলে বলে ৫০০ টাকা ট্যাক্স হবে। এই কথা শোনার সাথে সাথে ভদ্রলোকের মানসিক পরিস্থিতি কি হতে পারে ভাবুন তো। বাধ্য হয়ে এক থেকে দু'হাজার টাকা রফা করতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বাড়ির চেয়ে ছোট বাড়ির ট্যাক্স বেশি হয়ে যায়, কারণ তারা উপযুক্ত ঘুষ দিতে পারে না। এই এ্যাসেসারদের সঙ্গে পৌর কর আদায়কারীরাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

এই হল আজকের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু বাস্তব চিত্র। মাননীয় পৌর মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সব বিষয় কি কিছুই জানেন না?

শ্রী নকুলচন্দ্র দাস
বিরাটী, কলকাতা-৫১
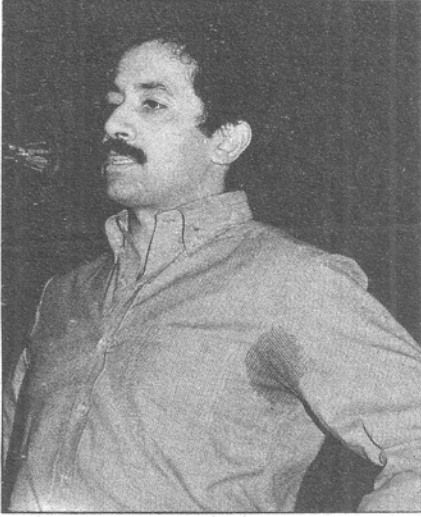
মার্শাল আর্ট: ক্যারাটে কাহিনী

চোদ্দ'শ বছর আগে চীনজাপানে বৌদ্ধসন্তরা আত্মরক্ষার জন্য যে 'ক্যারাটে কৌশল' প্রচলিত করেছেন এখন মার্শাল আর্টের মধ্য দিয়ে তার জনপ্রিয়তার ঢেউ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদন ক্যারাটে–কুংফু'র অজানা কাহিনী পেশ করছে।

ক্যারাটের উজ্জ্বল নক্ষত্র অনিল সিন্‌হা

উত্তেজনায় টান টান হিন্দি ছবির কয়েকটি অ্যাকশন দৃশ্য : লকলকে অস্ত্রধারী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নায়ক খালি হাতে বিভিন্ন কায়দায় লড়াই করে হঠাৎ প্রায় মহাশূন্যে লাফিয়ে টো দিয়ে আক্রমণকারীর থুতনিতে আঘাত করে ধরাশায়ী করল। অন্য দৃশ্য : কুড়ি পঁচিশ ফুট উঁচু ছাদ থেকে নায়ক এক লাফে মাটিতে পড়েই নিজের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা শত্রুর গাড়িকে একেবারে শেষ মুহূর্তে মেসিনের দ্রুততায় ডজ করে মৃত্যু এড়িয়ে গেল। আর একটি দৃশ্য : একটি প্রিয় চরিত্র মেঝের ওপর বিদ্যুৎগতিতে ডিগবাজী খেতে খেতে শত্রুর ছোঁড়াগুলিকে এড়িয়ে গেল। কিংবা ছুরি মারতে উদ্যত বেপরোয়া শত্রুকে খালি হাতে ব্যর্থ করলেন পুলিশ অফিসার। এরকম সব রকমের আঘাত এড়িয়ে কৌশলে শত্রুকে ধরাশায়ী করার দৃশ্য হরহামেশা সিনেমায় দেখা যায়। ক্যামেরার চালাকি বাদেও এইসব অভিনেতারা ক্যারাটের মারপ্যাঁচ আয়ত্ব করছেন। বর্তমানে আত্মরক্ষা, প্রতিপক্ষকে জব্দ করা এবং শরীর গঠনের তাগিদে ক্যারাটে চর্চায় এগিয়ে আসছেন বহু যুবক যুবতী। ক্যারাটের প্রয়োজনীয়তা রক্ষীবাহিনীও স্বীকার করছেন। ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির কিছুদিন আগে মূলত কেন্দ্রিয় রিজার্ভ পুলিশের (সি আর পি এফ) কর্মীদের নিয়ে শুরু হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে এই ধরনের শিবির মহারাষ্ট্র পুলিশ বিভাগের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এবার খোদ কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পুলিশের মধ্যে এই শিক্ষার শুরু হয়েছে। ক্যারাটে তালিম নেওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর মহড়াও দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে।

ক্যারাটে আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা লাভ করছে সন্দেহ নেই। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং জেলাগুলিতেও ক্রমশ এই প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। আগ্রহী ছেলে–মেয়েরা শুধুমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে বা ছবিতে অ্যাকশানের টানেই এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন না। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীতে চাকরির সম্ভাবনাও তৈরি করছে এই ক্যারাটে।
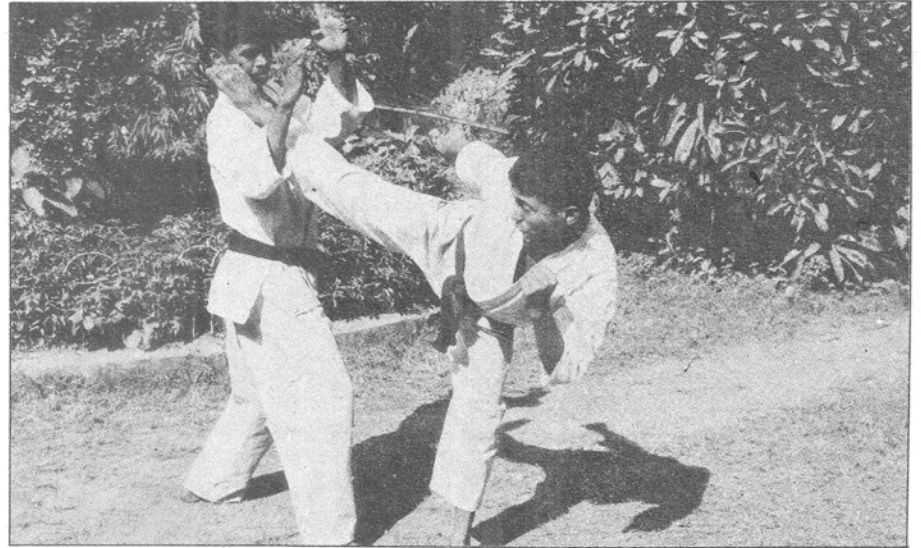
অনুশীলন চলছে (ক্যারাটে)

ক্যারাটের পাশাপাশি আর একটা অবিচ্ছিন্ন নাম জুডো। জুডোর বিষয়ে আলোকপাত করার আগে ক্যারাটের উৎস এবং সূচনা কি ভাবে হয়েছে সেই ইতিহাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যাক।

প্রায় চোদ্দ শ' বছর আগে বোধিধর্ম নামে একজন বৌদ্ধসন্ত পশ্চিম ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান চীন দেশে। যে পথ ধরে তিনি চীন দেশে রওনা হয়েছিলেন সেই স্থপথ এত দুর্গম যে ভ্রমণকারীর পক্ষে ভীষণ মানসিক এবং শারীরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। মন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সে পথে চলা একেবারেই দুঃসাধ্য। তিনি শাওলিনের দিকে এগোলেন। এই দুর্গম পথ পরিক্রমার কালে মন ও শরীরকে উপযুক্ত রাখতে বোধিধর্ম একটি পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন। ওই পদ্ধতি 'এক্কিন সূত্রে' বর্ণিত আছে। এই বিশেষ পদ্ধতিটির নাম 'শোরিণ জি কেম্পো' এবং ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি পৌঁছে গেল র‍্যুক্যু আইল্যাণ্ডে। সেখানে শোরিণ জি কেম্পো'র উন্নতি হয়। নাম হয় ওকিনাওয়া–টে। ক্যারাটের জনক এই ওকিনাওয়া–টে কে আবার টোটেও বলা হয়। প্রায় একশ বছর ধরে ওকিনাওয়ায় এর বিকাশ ঘটে। প্রাচীন মতানুসারে ১৪২৯ সালে ওকিনাওয়া চূজানের রাজা সোহাসির অধীনে ছিল। কিন্তু রাজা সোহাসির পর ওকিনাওয়াতে মার্শাল আর্ট–এর অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। শোনা যায় কাগোসিমার রাজা সাতসানার আদেশ বলে ১৬০৯ সালে ওকিনাওয়ায় অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ওকিনাওয়া তখন সাতসানার দখলে। ঠিক এইসময় আত্মরক্ষার ধারক হিসেবে ক্যারাটে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

সালটা ১৮৬৭। আধুনিক ক্যারাটের জনক

মাস্টার ঘিচিন ফুনাকোশির জন্ম হয়। তিনি প্রথম মার্শাল আর্টই শিখতেন। সেই মার্শাল আর্টের নাম ছিল টো–টো অথবা ওকিনাওয়ানটে। এই সব ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য ক্যারাটের আদি ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। ফুনাকোশি ক্যারাটের বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে নিজেকে প্রশিক্ষক হিসাবে তৈরি করেন। একসময় তিনি মার্শাল আর্টস এসোসিয়েশন–এর শোবুকাই-এর চেয়ারম্যান হন। জাপানের সর্বত্র তখন ফুনাকোশির নাম। সেই সময় জাপানের তৎকালীন রাজার সামনে তাকে অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ বিষয়ে একটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে জুডোর উদ্ভাবক মাস্টার জিগোরো কানো ফুনাকোশিকে এই শিল্পের শিক্ষা নানা রকম পদ্ধতিতে দিয়েছিলেন। ফুনাকোশি ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। এবং তিনি এই শিল্পের নাম রাখলেন 'ক্যারাটে'। 'ক্যারা' অর্থাৎ শূন্য বা খালি এবং 'টে'র অর্থ হাত। মিলিয়ে দাঁড়াল খালিহাত। ১৯৬৬ সালে মাস্টার ফুনাকোশি জাপানের দোজিগায়াতে প্রথম ক্যারাটের ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষানবিশদের বলা হত দোজো–শোতোকান-শোতো। এটাই পরবর্তি সময়ে ক্যারাটের এক ঘরানা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এবং এটাই পৃথিবীর প্রথম স্বীকৃত ক্যারাটে ঘরানা।

শোতোকান দোজোর প্রতিষ্ঠার পর ফুনাকোশি ক্যারাটেকে জাপানের এক জাতীয় অঙ্গ হিসাবে দেখতে চাইলেন। পুরনো শোবু–কাই ১৯৫০ সালের ২০ মার্চ পরিণত হল জাপান ক্যারাটে এ্যাসোসিয়েশনে। এই এ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৮ সালের ২০ এপ্রিল জাপানের শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটা কর্পোরেশন তৈরি করে। ১৯৫৭ সালে জাপানে বিশ্বের প্রথম ক্যারাটে টুর্নামেন্ট হয়। টুর্নামেন্টের নাম অল জাপান গ্র্যাণ্ড ক্যারাটে টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট বর্তমানে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকেও প্রতিযোগীরা এখানে যোগদান করেন। সারা পৃথিবীতে ক্যারাটের দুটি ধারা বর্তমানে চালু আছে। প্রথমটি ফুল বা হাফ কনট্যাক্ট অর্থাৎ সরাসরি আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। পাঞ্চ, ব্লক এই স্টাইলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এবং রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে এতে। দ্বিতীয়টি নন কনট্যাক্ট অর্থাৎ দমাদ্দম মারামারি বা রক্তারক্তি নয়। মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয় পাঞ্চ, ব্লক, পুশ ব্যাক–এর উপর। এর সব কিছুর মধ্যেই একটা ছন্দ থাকে। ফিজিক্যাল ট্রেনিংগুলো এখানে প্রাধান্য পায় খুব বেশি। ফলে অনুশীলনে কোনরকম আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কলকাতা তথা ভারতবর্ষের কয়েকজন খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠিত ক্যারাটে প্রশিক্ষকের পাশাপাশি সম্ভবনাময় প্রশিক্ষক এবং তাঁদের সংস্থার হালহকিকৎ সহ ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলন সম্পর্কে মতামত, প্রশিক্ষণ নেওয়ার উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

ক্যারাটে মহড়ায় তরুণীদ্বয়

ভারতবর্ষের প্রথম সারির প্রশিক্ষক ও কলকাতায় ক্যারাটের অন্যতম জনক শিহান দাদি বালসারা। তাঁর ক্যারাটের জীবন বেশ রোমাঞ্চকর আবার আকর্ষণীয়ও বটে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মাত্র সতের–আঠার বছর বয়স থেকে তালিম নেওয়া শুরু করেন। তখন বালসারা সাহেব ছিলেন ছাত্র। সালটা ১৯৫৮। সেই সময় মার্চেন্ট নেভি অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছেন তিনি। শৈশব কেটেছে বোম্বেতে। কলকাতায় প্রথম পদার্পণ ১৯৬৩ সালে ডক পাইলট হিসাবে। ক্যারাটেতে আত্মমগ্নতা তাঁকে এনে দেয় প্রথম ব্ল্যাক বেল্ট ১৯৭৬ সালে। তারপর তিনি ফোর্থ ব্ল্যাক বেল্ট পর্যন্ত লাভ করেন। একটা ব্ল্যাক বেল্ট বা ডান পেতে সময় লাগে তিন থেকে দশ বছর। দাদি

স্বনামধন্য দাদি বালসারা

বালসারার শিক্ষাগুরু ছিলেন কানচো মাসোয়ানা। আশিতারা কায়–কান জাপান থেকে ১৯৮৩ সালে পেয়েছেন অন্যতম একটি উপাধি। নন কনট্যাক্ট ফুল কনট্যাক্ট এর মধ্যে থেকে ফুল কনট্যাক্টকে কেন বেছে নিলেন জানতে চাইলে বললেন, ক্যারাটের মঞ্চে শুধু পাঞ্চ, ব্লক, ব্যাক পুশ থাকবে এটাকে তেমন চ্যালেঞ্জ মনে হয় না। তাই সরাসরি আক্রমণ ও প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার পিছনে রয়েছে বাড়তি আনন্দ। সেখানে একটু রিস্ক তো নিতেই হয়। '৭৬–এ ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া থেকে বর্তমানে কোচ হিসাবে নিযুক্ত আছেন নিজের হাতে গড়া পার্ক সার্কাসের ক্লাবে। কথা বলার ফাঁকে এসে উপস্থিত হলেন বছর কুড়ি পঁচিশের এক শিক্ষার্থিনী। নাম গীতা দাস। ল্যান্স ডাউনের বাড়ি থেকে সপ্তাহে তিন দিন এখানে তালিম নিতে আসেন। বছর খানেকের মধ্যে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার প্রত্যাশা রাখেন গীতা। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে একটা ছোটখাটো চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি ক্যারাটে শেখেন মনের আনন্দে। সেইসঙ্গে মেয়েদের ও বাচ্চাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিখিয়ে আসেন। ১০০–১৫০ টাকা বেতন নেন এই বাবদ। কিন্তু পয়সা না পেলেও শেখানোর মানসিকতা আছে গীতা দাসের। শ্রীমতী লাহিড়ীও এখানকার অন্যতম ছাত্রী। সপ্তাহে তিন দিন শিখতে আসেন এখানে। সোম, বুধ, শুক্র তে সন্ধের সমস্ত কাজ ফেলে এসে হাজির হন এই অনুশীলন প্রাঙ্গণে। শুধু কলকাতার ছাত্রছাত্রীরাই নন, সুদূর নাগপুর থেকেও ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতে আসে বলে জানালেন বালসারা সাহেব। স্বল্প দৈর্ঘ্যের সুঠামদেহী মধ্যবয়স্ক শান্ত স্বভাবের এই মানুষটির ক্যারাটে জগতে ভারতজোড়া নাম। তাঁর খ্যাতির মূলধন নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা। হিন্দি ফিল্মের সুপার স্টার অমিতাভ, শশিকাপুর, রাজেশ খান্না, বিনোদ খান্না প্রমুখেরাও দাদি বালসারার কাছে ক্যারাটে তালিম নিয়েছেন

বলে জানালেন । এই কথাগুলো বলবার সময় তাঁর চোখেমুখে এক শিশু সুলভ হাসি খেলা করছিল। সেই রেশ ধরেই জানালেন, কলকাতার বহু কৃতী ছাত্র তাঁর হাতে তৈরি। এদের অন্যতম হলেন শিবাজী গাঙ্গুলী । একাধারে চাকরি অন্যদিকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যা এই বয়সেও তাঁর মনকে তরতাজা করে রেখেছে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে তিনি শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারেন। প্রমাণ দিলেন এই প্রতিবেদকের কাছে । হঠাৎ দুটো আঙুল দিয়ে হাতের তালুকে চেপে ধরলেন । মনে হল লোহার কোন যন্ত্র দিয়ে চেপে ধরেছেন । অসহ্য ব্যথা । ব্যথা লেগেছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসাজও করে দিলেন। আসলে যত না শক্তির প্রয়োগ ঘটালেন তার থেকে বেশি কৌশল । আর এই কৌশলের উপরেই ক্যারাটে দাঁড়িয়ে আছে।

কলকাতা ক্যারাটে জগতের অন্যতম দক্ষ প্রশিক্ষক হিসাবে যিনি অচিরেই সুনাম অর্জন করবেন তিনি হলেন শিবাজী গাঙ্গুলী ।

১৯৭৫ সালে ক্যারাটের হাতে খড়ি । শিক্ষাগুরু দাদি বালসারা। যিনি আগেই শিবাজীবাবুকে তাঁর কৃতী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্ল্যাক বেল্ট লাভ করার পর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। একের পর এক প্রাপ্তি ও খেতাব। ১৯৮২ সালে সিঙ্গাপুরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান এবং জাকার্তায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৫ তে হাওয়াই-এর হনলুলুতে এশিয়ান স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অর্জন করেন পঞ্চম স্থান । জাতীয়স্তরে ১৯৭৮ সালে চতুর্থ, '৮২-তে প্রথম এবং সেই সঙ্গে সারা ভারত নির্বাচনে প্রথম স্থান দখল করেন। এছাড়াও বিশ্ব ক্যারাটে আসরে তাঁর সাফল্যের তালিকাটি নজিরবিহীন । '৮৪ সালে প্রথম, '৮৫তে দ্বিতীয়, '৮৬-তে তৃতীয় স্থান অধিকারের সম্মানে তাঁকে এখনও যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে হল। এছাড়াও ১৯৮৪ সালে তাঁর আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়স্তরের ক্যারাটের মুখ্য কোচ হওয়ার সুযোগ ঘটে । ১৯৮৭, '৮৮ ও '৮৯-এ কমনওয়েলথ গেমে এবং '৮৬ ও '৯০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত স্পেশাল ব্রাঞ্চ কোচ ক্যাম্পে তিনি যোগদান করেন। সেই সময় নিজেকে তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যান । বহুবার বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশ হল জাপান, আমেরিকা, হাওয়াই, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া । ক্যারাটেকে অবলম্বন করে এ পর্যন্ত অনেক প্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। কিন্তু এখনও তৃপ্ত নন তিনি। কারণ বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, যুবকদের মধ্যে শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহনশীলতার অভাব তাঁকে পীড়া দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে যাঁরা ক্যারাটেকে অবলম্বন করতে চান তাঁদের ঘোর বিরোধী শিবাজীবাবু। বরঞ্চ মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ভাবে সচেতন করা তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই বর্তমানে কলকাতায় কায়োকু কায় কান-এর মত পাঁচটি ক্যারাটে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন। যাঁর দুটির দায়িত্বে আছেন স্বয়ং শিবাজী গাঙ্গুলী। দুটিতে ৩০০-এর মত ছাত্র ছাত্রী এবং বাকি তিনটিতে ২০০ জন। এছাড়া ব্যাংক অব মাদুরাতে একটি উল্লেখযোগ্য চাকরিও করেন তিনি। ফুল বা হাফ কনট্যাক্ট নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তাঁর শুধু বিশ্বাস করেন 'অধ্যাবসায় হল একমাত্র পথ' ।

ভারতবর্ষের ক্যারাটে দুনিয়ার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অনিল সিন্‌হা । একজিকিউটিভ চেহারার ধোপ দুরস্ত এই মানুষটিকে দেখে মনে মনে সমীহ জাগবে। জীবিকা ও নানা ব্যস্ততার মাঝেও ক্যারাটেতে নিবেদিত প্রাণ অনিল সিন্‌হা ইতিমধ্যেই তিন তিনটি ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন । এছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত। যার মধ্যে জে কে এ আই-এর টেক্‌নিক্যাল ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ ক্যারাটে ডো এসোসিয়েশনের সভাপতি। সহ সভাপতি এবং টেক্‌নিক্যাল-ডিরেক্টর অল ইণ্ডিয়া ক্যারাটে ডো ফেডারেশন-এর। বিভিন্ন সময় ঘুরে বেড়ান দেশ বিদেশে। এর মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে তেমনি আছে ক্যারাটে প্রয়োজনও। তিনি এ পর্যন্ত যে খ্যাতি অর্জন করেছেন সবটাই তাঁর আত্মমগ্নতার ফল। যদিও অনিলবাবু এসব নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করতে নারাজ। দায়িত্ব কর্তব্য ও কাজ পাগল মানুষটির জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে বহু আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর ঘটনা ।
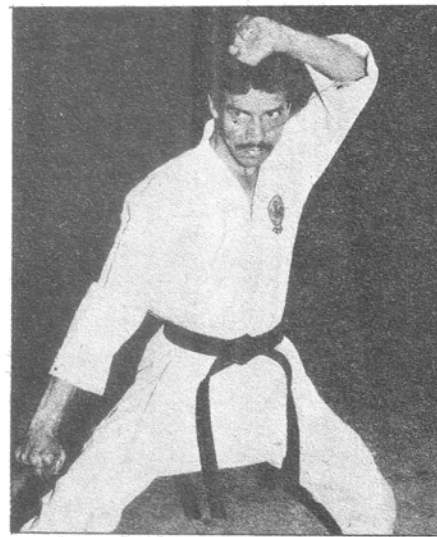
ক্যারাটে কোচ গোকুল দত্ত

ওয়াই এম সি-এ ওয়েলিংটন শাখার প্রশিক্ষক গোকুল দত্ত। বারো বছর ধরে ক্যারাটে চর্চা করছেন। কিন্তু সাত বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৮৬ তে কোচ হলেন এই ওয়াই এম সি এ-তে। শিক্ষাগুরু অনিল সিন্‌হা। সতোকান স্টাইলে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। সতো হল আধুনিক জাপানি ক্যারাটের জনক-জানালেন গোকুল দত্ত। পঞ্চাশ জন ছাত্রকে তালিম দেওয়া হয় সপ্তাহে তিন দিন একঘন্টা করে । এখানে প্রায় দশ জন ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত শিক্ষার্থী রয়েছেন । এই ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার আগে ধাপে ধাপে পরীক্ষা দিয়ে যেভাবে এগোতে হয় তার রীতিটিও বেশ সুন্দর। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের জন্যে সাদা বেল্ট এরপর পর্যায়ক্রমে উচ্চ সাদা, হলুদ, সবুজ, বেগুনী, বেগুনী ও সাদা, মেরুন ১, ২, ৩ এরপর কালো (১-১০) বেল্ট প্রাপ্তি ঘটে। এত গেল টেকনিক্যাল নিয়ম । আসলে এগুলো ঠিকঠাক ভাবে অর্জন করতে হলে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে তালিম নিতে হয়। ৪ থেকে ৭/৮ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় একটি ব্ল্যাক বেল্ট পেতে । গোকুলবাবু জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ছ'বার । এর মধ্যে দু'বার রানার্স হয়েছেন '৮৮-'৮৯ সালে । '৮৮তে হয়েছিলেন বাংলা ক্যারাটে দলের ক্যাপ্টেন। আশাবাদী গোকুলবাবু আগামী বছর উচ্চশিক্ষা ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য জাপান যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ।
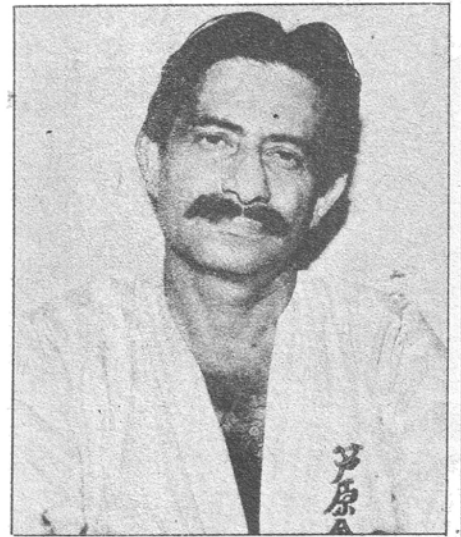
ব্যক্তি দাদি বালসারা

এই পরিবর্তিত সময়ে ক্যারাটে কতটা প্রয়োজনীয় এবং যুব সম্প্রদায়কে কিভাবে প্রভাবিত করছে-এই বিষয়ে গজুকাই ক্যারাটে ক্লাবের ডিরেক্টর ও চীফ কোচ ললিত কুমার সাউ-এর মতামত পরিষ্কার । 'আসলে এখানে ক্যারাটে শেখার ধৈর্য্য, সহ্যক্ষমতা বেশির ভাগের মধ্যে নেই বললেই চলে। অনেকে ইংরাজি বা হিন্দি ছবি দেখে উৎসাহ বশে এসে ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু দুদিন প্র্যাকটিসের পরেই পালায়। অথচ... ।' এরপর সেই অথচের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ললিত কুমার জানালেন ধৈর্য ধরে শিখতে পারলে গজুকাই ক্যারাটেতে দুটো লাভ। এক, আত্মরক্ষার প্রায় যাবতীয় কায়দাগুলো জানা এবং শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছে যাওয়া। দুই, পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরী পাওয়ার সুবিধে ।

ক্যারাটের অনুমোদিত নানা স্টাইলের মধ্যে ভারতবর্ষে সতোকান, গজুকাই, ওয়াডেরিও ও সৌরেনডিও বেশি জনপ্রিয়। ললিতকুমার অবশ্য অন্য মন্তব্য পোষণ করেন। তাঁর মতে গজুকাই স্টাইলটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এদেশে। সবচেয়ে কাজেরও বটে। নন কনট্যাক্ট বলে অনুশীলনে যেমন আঘাত পাওয়ার সম্ভবনা থাকে না, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে দেখাতেও দারুণ আকর্ষক হয়ে ওঠে। বাংলার একমাত্র গজুকাই ব্ল্যাক বেল্ট ললিতকুমার বললেন, কলকাতায় গজুকাই ক্যারাটে ক্লাবের শুরু ছিয়াশিতে। শ্যামপুকুরে মাত্র পঁয়ত্রিশ–চল্লিশজন ছাত্র নিয়ে ওঁরই উদ্যোগে ক্লাবের সূচনা। এই মুহূর্তে কলকাতায় আরও তিনটি এবং

শিবাজী গাঙ্গুলী : লক্ষ্যের পথে

শিলিগুড়িতে একটি সব মিলিয়ে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্রের ছেলেমেয়ের সংখ্যা পাঁচশর মত। তবে পাঁচশ সংখ্যাটি কাগজে কলমে আসলে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। একটু বেশি ধৈর্য আর সময় ছাড়া গজুকাই ক্যারাটেতে কঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নেই। খরচও নাম মাত্র। খাওয়া দাওয়ার ঝামেলাও তেমন নেই। ঝাল মশলা কম করে, সবজি বেশি করে এবং রোজকার খাবারের সঙ্গে এক কাপ দুধ ও মরশুমি যে কোনও একটা ফল খেলেই যথেষ্ট। তবে একজন ওস্তাদ ক্যারাটেকা হতে গেলে কয়েক বছর এই লাইনে ঘাম ঝরাতে হবে। সপ্রতিভ ললিত কুমার নিজের দীর্ঘকায় সুঠাম দেহের প্রতি একবার চোখ রাখলেন। তিরিশের কোঠায় পা রেখেছেন সবে। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার সৎ সাহস আছে যথেষ্ট।

গজুকাই ক্যারাটের প্রধান নির্দেশক ভেসপি কাপাডিয়া বোম্বাইয়ে প্রায় এক যুগ আগে ওঁর স্কুল চালু করেছিলেন। ভারতে গজুকাই ক্যারাটের সার্টিফিকেট দেয় ইন্ডিয়ান ক্যারাটে ডো-ফেডারেশন। বছরে দু'বার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসতে হয়। এবং যারা সফল হয় তারা একে একে পায় ইয়েলো, অরেঞ্জ, গ্রিন ১, গ্রিন২, ব্লু, ব্রাউন১, ব্রাউন২, গোল্ডেন ব্রাউন বেল্ট। তারপর পাওয়া যায় ব্ল্যাক বেল্ট। এবং সব শেষে ডান। এই রকম দুটো ডান পেয়েছেন ললিত কুমার। প্রথমটি ১৯৮৫ এবং দ্বিতীয়টি '৮৯–তে। তিনি আরও একটি তথ্য তুলে ধরলেন যে ভারতে গজুকাই ক্যারাটের সবচেয়ে বেশি সার্টিফিকেট আছে ভেসপি কাপাডিয়ার। আজ থেকে বাইশ বছর আগে যিনি ব্ল্যাক বেল্ট হয়েছিলেন। এখন তিনি সিক্স ডান। এক সময় কাপাডিয়া দারুণ ব্যাডমিন্টন খেলতেন, যিনি বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে ৯০০০/১০,০০০ ছাত্রছাত্রীর ক্যারাটে শিক্ষা দান করে থাকেন।

সফল কোচ ললিত কুমার সাউ

গজুকাই ক্যারাটে ডো (কলকাতা ক্যারাটে ক্লাব) পশ্চিমবঙ্গ শাখার মূল অফিসে বসে আক্ষেপ করে ললিত কুমার জানালেন পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের থেকে বম্বের শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি পরিশ্রমী। সেই জন্যই কৃতকার্যের আনুপাতিক হার বোম্বেতেই অনেক বেশি।

প্রশিক্ষকদের মতামত এবং অভিজ্ঞতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়া কেমন জানতে চাইলে বিবেকানন্দ চ্যাটার্জি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললেন, ক্যারাটে মানেই মারামারি, কিক বা পাঞ্চ নয়। ওঁর মতে শরীর চর্চার সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম হল ক্যারাটে। সাধারণ ডাল ভাত পেট পুরে খেলেই হল। ভবিষ্যতও আছে এতে। ডিফেন্স লাইনে ক্যারাটের কদর খুব বেশি। আবার যদি কেউ মনে করেন ফুল কোর্স করে নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন তাও দিতে পারেন। অর্থাৎ টিউশানির মত প্রফেশন হিসাবে নিতে পারেন। কিয়োকুশিন কাইকান ঘরানায় শেখেন বিবেকানন্দ চ্যাটার্জি। স্টাইলটা বডি কনট্যাকট–এর। এতে রিস্ক আছে। তাই বণ্ড দিয়ে প্রশিক্ষণে ঢুকতে হয়। কেন বেছে নিলেন জানতে চাইলে সপ্রতিভ ভাবে বললেন, বেঁচে থাকায় যখন বিপদ আছে তখন এটাতে আর এমন কি।

ব্যারাকপুরের ছাত্র সুপ্রিয় দাস–এর এ বিষয়ে উপলব্ধি অন্যরকম। 'কারাটে আমাকে সংযমী হতে শিখিয়েছে। ব্ল্যাক বেল্ট করে এটাকেই প্রফেশন হিসাবে নিতে চাই।' একমুখ হেসে নিজের প্রতি আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে এনে সুপ্রিয়র দ্বিতীয় মন্তব্য, 'ক্যারাটে শেখার পর আমি সাহসী হয়েছি।' তরুণ এই যুবকের উক্তিতে বোঝা যায় ক্যারাটের প্রতি তার অগাধ আস্থা।

ওয়াই এম সি এ (কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চ) এবং ইনস্টিটিউট অব মার্শাল আর্টস, লিনটন স্ট্রিট, কলকাতা১৪-এর প্রশিক্ষক অভিজিৎ মিত্র। মিষ্টভাষী সুদর্শন এই যুবক ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক বেল্ট খেতাব পেয়েছেন নিজস্ব যোগ্যতায়। অভিজিৎ মিত্র দুটি ক্লাব ছাড়াও কলকাতার কয়েকটি নামী স্কুলে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। স্কুলের বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত অন্যতম প্রতিষ্ঠান ডন বসকো (পার্ক সার্কাস)র ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং লরেটো (শিয়ালদহ শাখা)র ওয়ান থেকে টুয়েলভ–এর ছাত্রীরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে ক্যারাটে শিখে যাচ্ছে। অভিজিৎবাবু এটিকে শুভলক্ষণ বলে মন্তব্য করলেন। ১৯৮০–র গোড়ার দিকে সোনা ঘোষের কাছে তাঁর ক্যারাটের হাতেখড়ি। যিনি সেকেণ্ড ডান ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেছেন। তাঁর মতে, 'ফিজিক্যাল ফিটনেস, সেল্ফ ডিফেন্স এবং মেন্টাল কন্ট্রোল–এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যারাটে। আজকের দিনে ক্যারাটেকে তির্যক ভাবে দেখা উচিত নয় কারণ ক্যারাটের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। অনেকেই একে প্রফেশন বা সেমি প্রফেশন হিসাবে নিচ্ছেন।' পশ্চিমবাংলার দুই শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষক দাদি বালসারা এবং অনিল সিন্হা অভিজিৎবাবুর কাছে আদর্শ শিক্ষক। ছাব্বিশ বছরের টগবগে এই যুবকটি খুবই আত্মপ্রত্যয়ী এবং আশাবাদী। তাই ক্যারাটেকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন। নিজেকে আরও বেশি তৈরি করে ক্যারাটের জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন তিনি।

বহু প্রাচীন যুগ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লড়াই–এর প্রচলন ছিল। প্রতি জায়গার ঘরানা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। জাপানও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তখন জাপানের লড়াইটা ছিল সাধারণ পদ্ধতির লড়াই। পরে উন্নত হয়ে বিশেষ স্টাইল জুজুৎসুতে পরিণত হয়। ইউরোপে লড়াইটা ছিল বকসিং।

১৮শত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই খালি হাতের লড়াই আত্মরক্ষার শিল্প মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। সেটাকেই বলা হয় জুজুৎসু। এবং এই খেলার মূল অঙ্গ ছিল থ্রোইং, স্ট্যানিং, কিকিং, লকিং, হোল্ডিং, বেন্ডিং, ও টুইসটিং দ্য জয়েন্টস্–এই ধারাগুলি দীর্ঘসময় ধরে চলে এসেছে। কিন্তু

বর্তমানে এই পদ্ধতি অনেক আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত হয়েছে। এই ধারার আধুনিক নামকরণ হল কোদকান জুডো। ১৯৮২-তে লেট প্রফেসার কানো মাত্র ১৮ বছর বয়সে জুজুৎসু সম্পর্কে শিক্ষা নিতে শুরু করেন। জুজুৎসুর আধুনিক রূপ হল জুডো।

১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনেও জুডোর প্রভাব এসে পড়ে। জিন্নোসুকে সানোর জুজুৎসু কলাকৌশল দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।-সানো একাধারে যেমন ছিলেন চিত্রশিল্পী তেমনি ছিলেন জুজুৎসুতে সুদক্ষ। রবীন্দ্রনাথ জাপানে জুজুৎসু এবং জুডোর মহড়া দেখে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষত
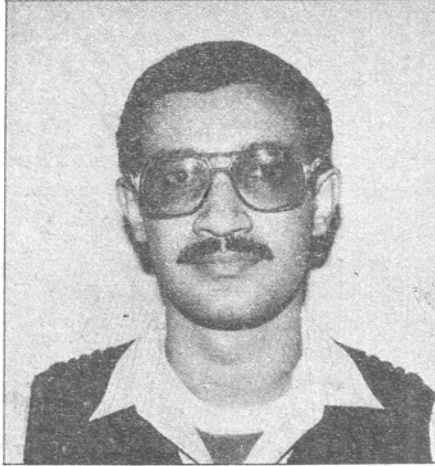
ক্যারাটে প্রশিক্ষক অভিজিৎ মিত্র

মেয়েদের এই শিল্পে দক্ষ করার জন্যে জুজুৎসু বিশেষজ্ঞ তাকাগাকিসানকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মার্শাল আর্ট মেয়েদের আত্মরক্ষার কাজে সহায়তা করবে। তাকাগাকিসান দু'বছর শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দেবার জন্যে ছিলেন। রবীঠাকুর নিজে এই ট্রেনিং-এর দেখভাল করতেন। ১৯৩১ সালের ১৬ মার্চ সন্ধে ছ'টায় কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা জুজুৎসু ডেমনেস্ট্রেশন করেন।

ভারতে জুডো জন্মকথার ইতিহাস দীর্ঘ। উৎসুক পাঠকদেরকে একটা আবছা ধারণা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজোউ জুডো ক্লাব স্থাপিত হয় কলকাতায়। মাত্র দশ জন সদস্য নিয়ে। পরে তিনজন জাপানী এক্সপার্টদের সহযোগিতায় কলকাতার জুডো আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে এক জুডো ডেমনেস্ট্রশন হয়। ১৯৭১ এর অকটোবরে আর এক নবজাতক এই কলকাতার মুখ দেখল। ক্যালকাটা জুডো ক্লাব। এরপর নানা সংযোজন বিভিন্ন সময়ে। ১৯৭৬-এ পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস-এ জাপানী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় জুডো প্রশিক্ষণের কোর্স-খোলা হয়। সমসাময়িক কালে আমাদের দেশে জুডো আন্দোলন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাজ্য পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জুডো এ্যাসোসিয়েশন এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে আছে জুডো ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া। দুই পর্যায়ে চালু হয়েছে প্রতিযোগিতা। ফলে যুবক যুবতীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে।

তপন বক্সী। স্বাধীন উত্তর ভারতের মাটিতে আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে প্রথম পৃথিবীর মুখ দেখেন। তামাটে রঙের সুঠামদেহী তপনবাবু এখন কলকাতা জুডো জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তপন বক্সী ছাত্র হিসেবেও মেধাবী ছিলেন। যাদব-

ভারতে জুডো জন্মকথার ইতিহাস দীর্ঘ। উৎসুক পাঠকদেরকে একটা আবছা ধারণা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজোউ জুডো ক্লাব স্থাপিত হয় কলকাতায়। মাত্র দশ জন সদস্য নিয়ে। পরে তিনজন জাপানী এক্সপার্টদের সহযোগিতায় কলকাতার জুডো আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে এক জুডো ডেমনে-স্ট্রশন হয়। ১৯৭১ এর অক্টোবরে আর এক নবজাতক এই কলকাতার মুখ দেখল। ক্যালকাটা জুডো ক্লাব।

পুর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং প্রাপ্ত। এছাড়াও তিনি 'অর্জুন শ্রী' অব ইণ্ডিয়া, মিঃ বেঙ্গল, মিঃ ল কলেজ অব দ্যা ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা, ভারতীয় বডি বিল্ডিং ফেডারেশন জাতীয় বিচারকের সম্মানে সম্মানিত। ১৯৭৬ সাল থেকে ক্যালকাটা জুডো ক্লাব-এর সঙ্গে যুক্ত এবং ১৯৮৬ সালে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তপনবাবু। পশ্চিমবঙ্গ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানে সম্মানিত হন দুবার ১৯৭৬-৭৭ সালে। তিনি ১৯৮৩ তে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করেন। জুডোর সবচেয়ে জনপ্রিয় স্টাইল কোদোকান। অধিকাংশ শিক্ষানবিশ এই স্টাইলকে অনুসরণ করেন। তপন বক্সীও ১৯৮২ সালে টোকিও থেকে এই স্টাইলেই ব্ল্যাক বেল্ট লাভ করেন। জেমস চেন ছিলেন তাঁর জুডোর শিক্ষাগুরু। মিঃ সুগানামির কাছেও তিনি একবছর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে সানফ্রানসিস্কোয় মিঃ কাইন-এর কাছ থেকে সেকেণ্ড ডান সার্টিফিকেট লাভ করেন। কৃতী তপনবাবু জানালেন '১৯৬৪ থেকে জুডোকে অলিম্পিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছেলে-মেয়েরা একে স্পোর্টস হিসাবে নিতে পারে, আবার চাকরির ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধে আছে। পুলিশ, বি এস এফ, সি আই এস এফ, সি আর এফ, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ছাড়াও ব্যাংকে চাকরি পাওয়ার সুবিধে আছে। ইস্টার্ন রেলওয়েতে জুডো টিম আছে। একবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে চাকরির পথটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাছাড়া ফিজিক্যাল ফিটনেস ও নানা আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করার জন্য জুডোর তুলনা হয় না।'

'লেস স্ট্রেন্থ মোর টেকনিক' এই হল জুডোর
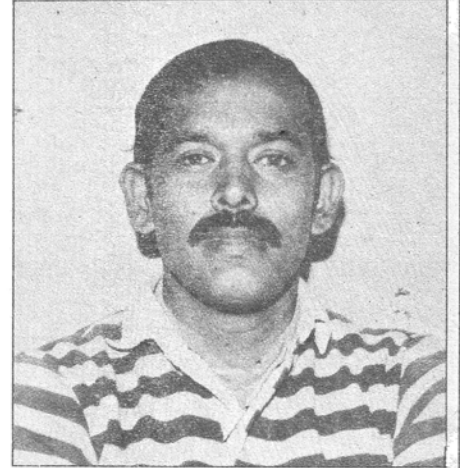
জুডো প্রশিক্ষক তপন বক্সী

মূল কথা। 'জু' জেন্টল 'ডো' ওয়ে অর্থাৎ জেন্টাল ওয়ে। ডঃ জিগার কানু ১৯৮২ সালে জাপানে প্রথম জুডোর কোদোকান নামে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা শিখতে আসে। জুডোর থ্রোয়িং, চকিং, লকিং-এর পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসায় সময় দিতে হয় তপনবাবুকে। কৃতি প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে সুযোগমত পাড়ি জমিয়েছেন জাপান, হংকং, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর। এছাড়াও লন টেনিস ও যোগ ব্যায়ামের মূল্যবান চার্ট তৈরি এবং 'দ্য গেম অফ জুডো' নামে ইংরাজি ভাষায় জুডো বিষয়ক মূল্যবান বইটির রচয়িতাও তপন বক্সী। অগাধ প্রত্যয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে জুডোর সার্বিক উন্নতিসাধনে সচেষ্ট তপনবাবু একজন দক্ষ সংগঠকও। ১৯৮৪ তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অন্যতম দক্ষ সংগঠক হিসাবে সাফল্য দেখিয়েছেন তিনি। জুডোয় নিবেদিত প্রাণ তপনবাবু মৃদু হেসে জানালেন, 'অতীতে জুডোকে যেভাবে ভালবেসেছি আগামী দিনে একই ভাবে নিজেকে নিবেদন করতে চাই।'

আবদুল কাইউম

ছবি : তাপস কুমার দেব

কাশ্মীরে অপহৃত দূরেস্বামী
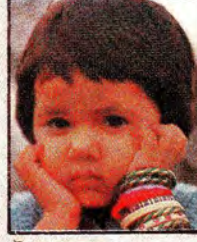
উত্তরপ্রদেশে অপহৃতা কিট্টু

আই·এ·এস· তিওয়ারী: অসমে অপহৃত

দিল্লীতে রাদু

অপহৃত রামসেবক সিংহ (বিহার)

অপহরণের অন্তরালে রাজনৈতিক জুয়া

অসম, কাশ্মীর, পঞ্জাব, বিহার, দিল্লি জুড়ে অপহৃত পণবন্দীদের নিয়ে চলছে সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক জুয়া। এসময় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিক নীতিগ্রহণে ব্যর্থ। তাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে জনজীবন। কেন এই অপহরণ? পণবন্দী সমস্যাকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা? এর সমাধানই বা কোন পথে? ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে আলোকপাত।

৯ই অক্টোবর ১৯৯১ সকাল আটটা বেজে দশ মিনিট নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে দূতাবাসের পথে যাচ্ছিলেন রোমানিয়ার দিল্লি স্থিত দূতাবাসের চার্জ-দ্য অ্যাফেয়ার্স লিভিয়ু রাদু। প্রতিদিনই তিনি তার জোরবাগের বাড়ি থেকে দূতাবাসের গাড়ি চালিয়ে বসন্ত বিহারে অফিসে যেতেন। ওই দিন কিন্তু তাঁর আর অফিসে পৌঁছানো হয় নি। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী তার রোমানিয়ায় তৈরি কালো গাড়িটির পিছনে পিছনে আসছিল একটি সাদা মারুতি। অরবিন্দ মার্গ ও লোধী রোড ক্রশিং-এর কাছে এসে তিনি গাড়ির গতি কমাতেই সাদা মারুতিটি অতিক্রম করে যায় তাঁর গাড়ি। তারপর ওই মারুতি থেকে নেমে আসেন দুই যুবক। এ কে ৪৭ দেখিয়ে তাঁরা উঠে পড়েন মসিয়েঁ রাদুর গাড়িতে। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ৫৩ বছর বয়সী রাজদূত লিভিয়ু রাদুর।

ঠিক তার তিনদিন বাদেই ১২ অক্টোবর বিকেলবেলা দিল্লির ইউ এন আই সদর দপ্তরের ডাকবাক্সে পাওয়া যায় একটি বাদামী খাম। খামের ভেতরে পোলারয়েড় ক্যামেরায় তোলা এক রঙিন ছবি। কার্পেট মোড়া মেঝেয় বসে আছেন রোমানিয়ার রাজদূত লিভিয়ু রাদু। চোখে বিপন্ন দৃষ্টি। দুহাত ভাঁজ করে বুকের উপর রাখা। দুপাশে হাতে এ কে ৪৭ নিয়ে বসে দুই মুখোশ পরা জঙ্গী। ছবির সঙ্গে গুরুমুখী ভাষায় লেখা দুপাতার এক চিঠি, চিঠিতে লেখা জেনারেল বৈদ্য হত্যা মামলায় ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়া না হলে 'টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে অপহৃত রাদুকে।' ওই চিঠিতে সরকারকে আরও হুশিয়ার করে দেওয়া

ছাড়া পাবার পর মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের কষ্টের কথা শোনাচ্ছেন এম·এন· বর্মা

এখনও আতঙ্ক: মা বাবার সঙ্গে কিট্টু

হয়—'রাদুর অবস্থার অবনতি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই কারণ তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।' চিঠির শেষ লাইন এই রকম 'আমাদের হেফাজতে থাকাকালীন যদি রাদুর মৃত্যু হয় তো তার যাবতীয় দায়িত্ব বর্তাবে ভারত সরকারের উপর।' অন্যদিকে রোমানিয়া সরকার নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ ব্যাপারে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার হাত আছে জেনে কূটনৈতিক স্তরে পাক সরকারকে তৎক্ষণাৎ আবেদন জানায় রাদু উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে। এভাবেই অপহরণ ও পণবন্দি কে কেন্দ্র করে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেল। ওই একই দিনে সন্ধ্যার সময় শ্রীনগরে মুনির মঞ্জিল এলাকায় পি টি আই-এর দপ্তরে সৃষ্টি হয় আতঙ্কের এক ভয়াবহ পরিবেশের। একটি ঘড়ির বাক্স কে বা কারা ছুঁড়ে দেয় সংবাদ সংস্থার অফিসে। হৈ চৈ আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে আসে পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয় করার স্কোয়াড। বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় কাপড়ে জড়ানো একটি কাটা বুড়ো আঙুল। এই ঘটনার কিছু পরেই কাশ্মিরী উগ্রপন্থীদের এক সংস্থা আল উমর মুজাহিদিনের এক মুখপাত্র দাবি করে ওই আঙুল কেন্দ্রিয় মন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতা গুলাম নবী আজাদের শ্যালক তাসাদুক হুসেনের। সরকার তাদের দাবি না মেটানোয় তাসাদুকের আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে। মুখপাত্রটি হুমকি দেয় 'আমাদের

দলের ২০জনকে মুক্তি না দিলে তাসাদুক হুসেন দেবের দেহটিকেও এইভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে।' ২০ জনের দলের মধ্যে ওই সংস্থার কমাণ্ডার ইন চীফ মুশতাক আল হকত রয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষা। সরকার ও উগ্রপন্থীদের দরকষাকষির মাঝে বলির পাঁঠা হয়ে প্রতীক্ষা করা অন্তিম প্রহরের।

ভারতের রাজনৈতিক দিন-পঞ্জীর এই একটি দিনের পাতা ওল্টালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে অপহৃত পণ বন্দীদের কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্রটি। অপহরণ এখন আর কোন বিচ্ছিন্ন একক সন্ত্রাসবাদ স্বীকৃত জঙ্গী দাবি আদায়ের এক প্রকৃষ্ট মাধ্যম নয় । পৃথিবীর তাবৎ দেশের সরকারকে জনরোষের সামনে দাঁড় করিয়ে ফায়দা লোটার অভিনব পন্থা। এই অমানবিক পদ্ধতির কাছে বিপন্ন আজ সাধারণ অরাজনৈতিক মানুষের অস্তিত্ব। সন্ত্রাসবাদীদের নবতম কৌশলের জাল এখন জড়িয়ে ফেলছে পঞ্জাব থেকে অসমের অশান্ত ভারতবর্ষকে।

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অপহরণকারীদের কাজের পেছনে অন্য অনেক চিন্তাও কাজ করে। কখন শুধুই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি, কখনও অর্থের প্রয়োজনে, কখনও বা দলগত বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপহৃত হন নিরীহ, নির্বিবাদ মানুষ।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর বুকে যে চারজন হীরা ব্যবসায়ী অপহৃত হন তাঁদের অপহরণ হয়ত শুধু অর্থের প্রয়োজনেই। কিন্তু প্রায় ৬/৭ মাস ধরে উলফাদের হাতে আটক তরুণ চিকিৎসক ডাঃ সপ্তর্ষি দত্তকে অপহরণ করার পেছনে সম্ভবত কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেনি। তাঁর অপহরণের ঘটনা চাপা পড়েই থাকত, যদি না অপহৃত হওয়ার পাঁচ মাস পরে তিনি এক বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি সব কথা না জানাতেন। তাঁর চিঠির বয়ান ছিল এইরকম। 'আমাকে কারা অপহরণ করে, কোথায় আটক রেখেছে তা জানি না, তবে এদের কথাবার্তা থেকে মনে হয় জায়গাটি কোকড়াঝাড় অঞ্চলের কাছাকাছি। আমাকে কবে মুক্তি দেওয়া হবে তাও জানি না। উগ্রবাদীদের তরফ থেকে বলা হয়েছে আহতদের চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা শেষ হলেই ছেড়ে দেওয়া হবে।' অপহরণের উদ্দেশ্য অভিনব সন্দেহ নেই।

অপহরণের উদ্দেশ্য যাই হোক অপহৃতদের তালিকা কিন্তু বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলেছে এ কে ৪৭ বা কালাশনিকভের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে পণবন্দীদের ব্যবহার করার আন্তর্জাতিক উগ্রপন্থা-স্বীকৃত কুপন্থার প্রয়োগ। ফলত দেশ ও দশ বিপন্ন হচ্ছে কি অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে, কি পররাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্কে।

কাশ্মীরে ইণ্ডিয়ান অয়েল সংস্থার এক্‌সি-কিউটিভ দোরাইস্বামীকে পণবন্দী হিসেবে ব্যবহার করে কুখ্যাত ইখওয়ান-উল-মুসলমান নেতা সহ আরও ন জন ধৃত উগ্রপন্থীকে মুক্ত করে কাশ্মিরী উগ্রপন্থীরা।তার কিছুদিন আগেই মুসলিম জানবাজ ফোর্সের হাতে অপহৃত ধৃত দুই সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ার প্রায় ৯২ দিন বন্দী থাকার পর প্রায় ৩ কোটি টাকার বিনিময়ে মুক্তি পান। সরকারের তরফে অবশ্য সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারেরা উগ্রপন্থী ডেরা থেকে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন বলে দাবি করা হয়।

এই অপহরণ নাটকের শুরু কিন্তু অনেক আগেই, ১৯৮৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়া

গুজব ৩৫ কোটিতে মুক্তি : দিল্লীতে অপহৃত হীরে ব্যবসায়ীদের পরিজনরা

সঙ্গীদের অপহরণ দিয়ে। সরকার জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের ধৃত পাঁচ বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে উদ্ধার করেন মুফতি-তনয়া রুবাইয়াকে।

একই নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় ১৯৯১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। যখন নাহিদা সোজ, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদ সইফুদ্দিন সোজের কন্যা অপহৃত হন। কুখ্যাত উগ্রপন্থী মুস্তাক আহমেদের মুক্তির বিনিময়ে মুক্ত করা হয় নাহিদা সোজকে।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মুশীর-উল-হক বা এইচ এম-টির শ্রীনগর কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার এইচ এল খের কিন্তু অতটা ভাগ্যবান ছিলেন না। উগ্রপন্থীদের দাবির কাছে সরকার মাথা নত না করায় প্রাণ হারাতে হয় তাঁদেরকে।

সরকারের দু-মুখো নীতির ফলে এই অসহায় পরিণতির শিকার হন আরো অনেকেই। ও এন জি সি র ইঞ্জিনিয়ার টি·এস· রাজুকে উলফা জঙ্গীরা যে দিন মেরে ফেলে সেদিনই ছিল তাঁর মেয়ে মামুনের জন্মদিন। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'আলফা কাকাকে' পাঠানো মামুনের কাতর আবেদন উপেক্ষা করে আলফা জঙ্গীরা হত্যা করে তাঁর বাবাকে। তারপর সরকারের উদ্যোগে তাঁর বাবার মৃতদেহ পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁর কাছে।

তারও কিছুদিন আগেই ১ জুলাই আলফা জঙ্গীদের হাতে অপহৃত রুশ ইঞ্জিনিয়ার সের্গেই গ্রিশেঙ্কো খুন হন। যদিও উলফা উগ্রপন্থী খুনের দায়িত্ব স্বীকার করেনি। শুধু বলেছে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছেন তিনি,তবুও গ্রিশেঙ্কোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আশান্বিত বোধহয় তাঁর বিধবা পত্নী নেলী গ্রিশেঙ্কো ছাড়া আর কেউই নন। এই রুশ ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করে আন্তর্জাতিক আসরে সর্বপ্রথম নিজেদের অস্তিত্ব প্রবলভাবে জাহির করে উলফা।

এই তালিকার বোধহয় শেষ নেই। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিন উলফা উগ্রপন্থী ও·এন· জি·সির সুপারিনটেণ্ডে ইঞ্জিনিয়ার শ্রী বি·পি· শ্রীবাস্তবকে বাড়ি থেকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। তিনি যেতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বাড়িতেই তাঁকে হত্যা করা হয়। কে যেন বলেছিলেন সংবাদ মাধ্যমই হল সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। একটি সন্ত্রাসবাদী কাজের এমনিতে কোন গুরুত্বই নেই, এর প্রচার পাওয়াই হল সবচেয়ে বড় কথা। এই প্রচারই তাদের দেয় তাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এই সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করার কৌশলই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে পণবন্দী হিসেবে অপহৃতদের আটক রাখার মধ্য দিয়ে। ভিনদেশের নাগরিকদের অপহরণ করে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক জনমত আদায় বা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঘটনা ঘটে চলেছে সারা বিশ্ব জুড়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যখন কুখ্যাত কার্লেসে দ্য

১ জুলাই আলফা জঙ্গীর হাতে অপহৃত রুশ ইঞ্জিনিয়ার সের্গেই গ্রিশেঙ্কো খুন হন। যদিও উলফা উগ্রপন্থী খুনের দায়িত্ব স্বীকার করেনি। শুধু বলেছে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছেন তিনি। তবুও গ্রিশেঙ্কোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আশান্বিত বোধহয় তাঁর বিধবা পত্নী নেলী গ্রিশেঙ্কো ছাড়া আর কেউই নন।

অপহরণকারীরা অ-ধরাই থাকে। বিহারে অনুসন্ধানরত পুলিশ দল।

অপহরণ-সন্ত্রাস: রক্ষী পরিবেষ্টিত পশ্চিম চম্পারণের এক ধনী কৃষক।

সাক্ষাৎকার

গণ প্রতিরোধ ও গণচেতনাই অপহরণ কুচক্রকে রোধ করতে পারে

হিতেশ্বর শইকিয়া, অসমের মুখ্যমন্ত্রী

প্রশ্ন: পণবন্দী সমস্যা আপনার সরকারকে কতখানি বিব্রত করেছে?

উত্তর: পণবন্দী সমস্যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সকলের মত আমরাও চাই জঙ্গীরা তাদেরকে মুক্তি দিক। কিন্তু এই স্পর্শকাতর বিষয় কাঁধে নিয়েও আমরা এসব চক্রের গোড়া কেটে দিতে চাই। সেকাজেই তৎপর সেনাবাহিনী 'অপারেশন রাইনো'র মধ্য দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা কোন চমকদার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিইনি। তাতে হয়তো সাময়িক লাভ করা যেত। কিন্তু ক্ষতিকর দিকটি হল তাতে জঙ্গীরা প্রশ্রয় পেয়ে যেত। বাড়ত ব্ল্যাকমেইলিং টেন্ডেনসি। জঙ্গীদের চাপের কাছে মাথা নত না করে মেরুদণ্ড সোজা করে আমরা সরকারের যথার্থ দায়িত্ব পালন করছি।

প্র: কিন্তু যেভাবে এতদিনে পণবন্দীদের মুক্ত করা গেল না তাতে জনমানস ক্রমশই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে না কি?

উ: দেখুন, এই বিষয়টি শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে বিচার করলে হবে না। আমরা জানতে পেরেছি পণবন্দীদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা তাড়াহুড়ো করতে পারছি না। আমাকে শুধু কয়েকজন মানুষ নয় অসমের কয়েক কোটি মানুষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন আমি অসমের বিভিন্ন মানুষ, জননেতা, বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেছি। শুনছি তাদের পরামর্শ। সেভাবে এগোচ্ছি। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এভাবে এগোলেই সফল হব। অসমকে মুক্ত করব সন্ত্রাসের বিভীষিকা থেকে।

প্র: ইদানিং ভারতের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ ও পণবন্দী কৌশল প্রয়োগ করছে ব্যাপকহারে এর কারণ কি? কোন পন্থা অবলম্বন করলে এসব দূর করা যাবে বা সন্ত্রাসবাদকে রোখা যাবে?

উ: অপহরণ এখন জাতীয় সমস্যা। নিরাপত্তা কর্মী, অফিসার থেকে শুরু করে বিদেশি রাষ্ট্রদূত বা বিশেষজ্ঞদেরকেও অপহরণ করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা ভাবছে এর মাধ্যমে রাষ্ট্র বা প্রশাসনকে তারা ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে। জনগণকে বিরূপ করতে পারবে অপহরণকে দীর্ঘমেয়াদী করতে পারলে।—এসব তারা করতে পারছে কোন কোন রাজ্য কখনো কখনো পণবন্দী বিষয়ে বাধ্য হয়েছে নত হতে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের পিছনে বিদেশি মদত তাদেরকে মদত এবং রসদ যোগাচ্ছে। তার ফলেই বিভিন্ন গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে তাদের সাহস এবং ক্ষমতা বাড়ছে। একে রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার গণচেতনা ও গণপ্রতিরোধ। জনতাকে পাশে নিয়ে প্রশাসনকে কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে মন্ত্রীদের। তবে এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সংঘবদ্ধ হতে হবে জাতীয় সংহতির চেতনায়। আর কেউ যদি একে স্বার্থসিদ্ধির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তবে তা হবে ধ্বংসাত্মক। এরকম সমস্যায় ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে দেশের স্বার্থকে। যা ইদানিং কিছু রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না।

প্র: অসম, বিহার, অন্ধ্র, কাশ্মীর, দিল্লি, পঞ্জাব—সর্বত্রই তো অপহরণ সমস্যা আছে। এইসব রাজ্যের কি যৌথ উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ নয়?

উ: একক উদ্যোগে কাজ হবে না। যৌথ উদ্যোগ চাই। উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতা আছে। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রিয় সরকার এ বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবছে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে একটি জাতীয় নীতি সরকার ঘোষণা করবে। তবে আপনি বোধহয় জানেন যে, আমরা উত্তরপূর্ব ভারতের মুখ্যমন্ত্রীরা মিলিত হয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনে একসঙ্গে এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি জনগণকে এই উদ্যোগে সামিল করার। একা মিলিটারি, একা পুলিশবাহিনী বা একা সরকার এই সমস্যার সমাধান বা প্রতিরোধ করতে পারবে না। মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে সকলকে।

প্র: সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের প্রশাসনিক প্রচেষ্টার সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে না?

উ: ক্ষেত্র বিশেষে ওরকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যেন অধিকাংশ মানুষের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে নেওয়া হয়। আমার আত্মীয় স্বজনকে একের পর এক হত্যা করেছে।—তবু আমি প্রতিশোধপরায়ণ হইনি। আমি প্রথমে ওদেরকে আলোচনার টেবিলে বসতে বলেছিলাম। ওরা রাজি না হওয়ায় প্রতিরোধের পথে আমাদেরকে যেতে হল।

প্র: সন্ত্রাসবাদের হাত ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদ যেভাবে একের পর এক ঘাঁটি বাড়াচ্ছে তাতে কি একদিন ভারতই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে?

উ: 'ভারত' শুধু নাম বা জায়গা নয়—তা একটা বিশ্বাস একটি পবিত্র বোধ। তাই তাকে বিচ্ছিন্ন করার শক্তি কারুর নেই।

জ্যাকালের নেতৃত্বে ওপেক মন্ত্রীদের ভিয়েনা সম্মেলন থেকে তাদের অপহরণ করে সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা হয়। পণবন্দীদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর আফ্রিকার এক প্রত্যন্ত প্রান্তে। যেখানে এক অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয় তাদের। তার আগে বা পরে সারা বিশ্ব জুড়ে এই ঘটনা একেবারেই বিরল নয়। মধ্যপ্রাচ্যের পি এল ও এবং লেবাননের মত দেশগুলি এই নবীন শিল্পকে সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহার করে চলছে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এইরূপ আমাদের ভারতীয় জীবনকে প্রথম স্পর্শ করে ১৯৮৪ সালে। যখন লণ্ডনের বার্মিংহামে ভারতীয় কূটনীতিক রবীন মাত্রেকে অপহরণ করে কাশ্মীর লিবারেশন আর্মি। অপহরণকারীরা মাত্রের বিনিময়ে দাবি করে ভারতীয় জেলে আটক কুখ্যাত পাক সন্ত্রাসবাদী নেতা মকবুল ভাটের নিঃশর্ত মুক্তি। সরকার রাজি না হওয়ায় নিহত হন রবীন্দ্র মাত্রে। সরকার ফাঁসি দেয় মকবুল ভাটকে। তারপর থেকে এ খেলার আর শেষ নেই। সোভিয়েত, ইজরায়েলি, রোমানিয়ান ও সুইডিশ নাগরিকদের অপহরণ করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ ও বৈদেশিক চাপের মুখে সরকারকে ঠেলে দেওয়ার বিপজ্জনক পদ্ধতিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বৈদেশিক মদতে এখন উগ্রপন্থার মারফৎ বিস্তৃত হয়েই চলেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস·বি· চহ্বান অক্টোবর মাসে ঘোষণা করেছেন যে, সরকার অপহরণ সমস্যা নিয়ে এক নতুন কেন্দ্রিয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন। বর্তমানে কিন্তু পণবন্দীদের ব্যাপারে সরকারের নীতি

একেবারেই দু-মুখো। সরকারি মতে অপহৃতের ও অপহরণের গুরুত্ব বিচার করে একেক ক্ষেত্রে একেক রকমের নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যাকে অপহরণ করার সময় থেকে যে পথ সরকার নিয়ে চলেছেন তাতে একের পর এক উগ্রপন্থীদের দাবির কাছে সরকারকে মাথা নোয়াতে হচ্ছে এবং যেহেতু কাশ্মিরী জঙ্গীরা অপহরণের ব্যাপারে সঈদ কন্যা বা গুলাম নবী আজাদের আত্মীয়দের মত সরকারের চোখে ভি·আই·পি·দের অপহরণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে চলেছে সেহেতু কাশ্মীরী জঙ্গীরা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও

অপহরণকারীদের মাঝখানে রোমানিয়ার রাজদূত

নিজেদের পুনরায় মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে বেশিদিন সংশয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আর সেনাবাহিনী সরকারের পণবন্দীদের বিনিময়ে ধৃত জঙ্গীদের ছেড়ে দেওয়ার নীতির মাঝে পড়ে হারিয়ে ফেলছে তাদের লড়াইয়ের মনোবল।

অসমে কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম। কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের তরফে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে অনীহা এবং এক পণবন্দীর মৃত্যুও সরকারের টনক নড়াতে সক্ষম হয় নি। এরফলে সেখানে উগ্রপন্থাকে ঝাড়েমূলে নির্মূল করার অভিযান 'অপারেশন রাইনো' দিনদিন সফল হচ্ছে। সেখানে ধরা পড়েছে ১৫০০ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আলফা জঙ্গী, সমস্ত 'জেলা কমাণ্ডার'। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ৫০ টিরও বেশি উগ্রবাদী ক্যাম্প। অন্যদিকে পঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য আবার একটু ভিন্ন। খালিস্তানী জঙ্গীরা অপহরণের লক্ষ্য হিসেবে সাধারণত বেছে নেয় নিরাপত্তা কর্মীদের আত্মীয় স্বজনকে। এ ব্যাপারে কোন স্বীকৃত নীতি রাজ্য প্রশাসনের না থাকায় এদের উদ্ধারের দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপর। তারা যে কোন সন্ত্রাসবাদী নেতা বা কর্মীর পরিবারের লোকেদের পাল্টা অপহরণ করার আইন বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করে ধৃত উগ্রপন্থী পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভীতি প্রদর্শনে অনেক সময় বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হয়।

কিন্তু এর মধ্যে কোন পন্থা সরকার গ্রহণ করবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। সরকার সমর্থিত পুলিশি সন্ত্রাস কখনও কোন দেশের সন্ত্রাসবাদ দমনের স্বীকৃত পন্থা হতে পারে না। আলোচনার পথ একেবারে বন্ধ করে শুধু প্রশাসনিক পেশী শক্তির উপর ভরসা করা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করা যায় না।

আবার উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অপহরণ সমস্যার সমাধানও যথেষ্ট সমস্যা-সঙ্কুল। অপহরণকারীদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসা মানে তাদের বর্বর অমানবিক কৌশলকে পরোক্ষে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান। যা অপহরণকারীদের মনোবল বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। যদি এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধানে এই ক্ষতি স্বীকার করেও নেওয়া যায় তবুও প্রশ্ন থেকে যায়।

সরকার কোন নীতির দোহাই দিয়ে বোঝাবেন মুফতি মহম্মদ সঈদ তনয়া রুবাইয়া সঈদের জীবন এইচ·এম·টি· জেনারেল ম্যানেজার

রাজ্যে রাজ্যে অপহরণের দৌরাত্ম্য

কাশ্মীর: এরাজ্যে প্রতিদিন কিডন্যাপার, সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তারা দাবী করছে যে বন্দী উগ্রপন্থীদের ছেড়ে দিতে হবে। এমনকি তারা ভয় দেখিয়ে, জোর করে সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। অনেক পরে সরকার উগ্রপন্থীদের সাথে একটা সমঝোতায় আসে কিন্তু সম্প্রতি আবার এস·বি· চবন বলেছেন যে এই চুক্তি এখন কার্যকর হচ্ছে না।

অসম: উগ্রপন্থী কার্যকলাপের মধ্যে অপহরণের ব্যাপারটি অনেক বেশি উদ্বেগজনক। আলফা নানানরকম বিধ্বংসী কার্যকলাপ এবং গুপ্ত হত্যা ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে সাথেই আবার তারা পণবন্দীদের অপহরণ করছে, তাদের নিজেদের জেলে বন্দী সাথীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। রাজ্য সরকারের ধারণা কোন রকম কথাবার্তার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

পঞ্জাব: এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য পুলিশ কর্মচারীদের পরিবারের উপর। পুলিশ ও তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এর প্রতিশোধ তুলছে, তাঁদের প্রতি সংঘর্ষের আঘাত এসে পড়ছে উগ্রপন্থীদের পরিবারের উপর। যার জন্যে এখন এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান নেই।

বিহার: এই বছরে প্রায় ১০৩৪ জন মানুষকে এই রাজ্যে অপহরণ করা হয়। পরে অবশ্য অনেকে মুক্তি পায়। আগস্ট মাসে একদল নেপালী শিল্পপতি জি·সি· ডগ্গারকে অপহরণ করা হয়। পরে কূটনৈতিক পদ্ধতিতে মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব তাকে পাঁচ লাখ টাকা না দিয়েই উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ: মার্কসবাদীদের দ্বারা অপহরণ চলছে এই রাজ্যে। বিগত পাঁচবছর ধরে নকশাল পন্থীরা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের কিডন্যাপ করে, এবং এর বিনিময়ে তাদের জেলে আটক অন্যান্য কমরেডদের মুক্তি দাবী করে। ১৯৮৭ সালে রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কে অপহরণ করা হয়।

দিল্লি: পুলিশ কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে শঙ্কিত যে কিছু আন্তর্জাতিক উগ্রপন্থী দল এখন রাজধানীতেই ঘোরাঘুরি করছে। মাঝে মধ্যেই রাজধানীতে বিভিন্ন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ঘটেছে। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লিতে চারজন হীরা ব্যবসায়িকে অপহরণ করা হয়। এর ফলেই প্রমাণিত হয় যে এখন দিল্লিতে সমাজবিরোধীদের শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

অসমে কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম। কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের তরফে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে অনীহা এবং এক পণবন্দীর মৃত্যুও সরকারের টনক নড়াতে সক্ষম হয়নি। এরফলে সেখানে উগ্রপন্থাকে ঝাড়েমূলে নির্মূল করার অভিযান 'অপারেশন রাইনো' দিনদিন সফল হচ্ছে।

অপহরণের সুযোগ সন্ধানে যুবকেরা : ধরা পড়েছে উত্তর প্রদেশে

এইচ·এল· খেরার জীবনের চেয়ে মূল্যবান? কোন দাড়িপাল্লায় মাপা হবে ইন্ডিয়ান ওয়েলের এক্সিকিউটিভ দোরাইস্বামীর মুক্তি আর সোভিয়েত খনি বিশেষজ্ঞ সের্গেই গ্রিশেঙ্কোর সরকারি ঔদাসীন্যের শিকার হওয়াকে? অপহরণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করা নীতি শাঁখের করাতের চেয়ে বিপজ্জনক হবে বলে বিশ্বাস করা শক্ত। উগ্রপন্থীদের দাবির কাছে মাথা নত করে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি প্রদানের যে কলঙ্কিত উদাহরণ রয়ে গেছে তা অন্য যে কোন নতুন কেন্দ্রিয় নীতির সামনে জ্বলন্ত প্রশ্নচিহ্নের মত দাঁড়িয়েই থাকবে। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অপহৃত একটি পণবন্দীর মৃত্যু সাধারণ ভারতবাসীর ক্ষোভ বাড়িয়েই চলবে। আবার অতীতে পণবন্দীদের বিষয়ে জঙ্গীদের সাথে আলোচনার একটি ফলই লক্ষ্য করা গেছে তা হল আটক সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় ক্রমশ লোপ পাবে।

উপদ্রুত এলাকাগুলি তুলে দেওয়া উচিত সেনাদের হাতে। ভারতের গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় এবং রাজনীতিক আবহাওয়ায় তা হয়তো নিন্দিত হয়ে ওঠবে। তথাপি স্বার্থ ত্যাগ না করলে আজ আর দেশকে বাঁচানোর কোন পথ খোলা নেই।

তাই অতীত কলংক হাতড়ে নিজেদের সুবিধাবাদ আড়াল করার ধারাবাহিক প্রচেস্টার এখনই ইতি টানা উচিত। অবশ্যই আবেগের প্রশ্ন আসে। দেশের স্বার্থে বিগত ভুলগুলির মাশুল তো কিছু শুধতেই হবে। তথাপি 'দিস ইজ দ্য আওয়ার টু স্ট্রাইক'। মুফতি মহম্মদ সঈদের মুখে হাসি ফোটাতে ভি পি সিং যে দেশ নয় ব্যক্তি অর্ঘ্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন ভারতীয় রাজনীতির ময়দানে, সন্ত্রাসবাদীরা আজ সেই পথ ধরে নিজেদের স্বার্থ কায়েমের নতুন নতুন জাল বুনে চলেছে।

সুতরাং তার ছেদ পড়া দরকার। এখনই দরকার, যেমন করেই হোক এই রীতিকে আর স্থায়ী হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কি ভাবে? যাঁরা দিল্লির মসনদ অলংকৃত করে আছেন, থাকার জন্য প্রতি নিয়ত 'টাগ অব ওয়ার' করছেন তাঁরা কি এতই নির্বোধ, এতই অজ্ঞ—কখনওই স্বীকার করা যায় না। তবুও বলা দরকার এহেন সন্ত্রাসবাদীদের-যাদের প্রধান দাবী বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত যাদের-তাদের কাছে কোন মহিমা দেখাবার সময় এটি নয়।

প্রথমত উপদ্রুত এলাকাগুলি তুলে দেওয়া উচিত সেনাদের হাতে। ভারতের গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় এবং রাজনীতিক আবহাওয়ায় তা হয়তো নিন্দিত হয়ে ওঠবে। তথাপি স্বার্থ ত্যাগ না করলে আজ আর দেশকে বাঁচানোর কোন পথ খোলা নেই। তাই রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যাদের কান্না আজ এ দেশের মাটিতে তীব্র হয়ে উঠছে তাদের সেই কান্নার স্রোত যেন আর না বাড়ে।

অসমে অপারেশন রাইনো হয়তো তারই সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। এই মুহূর্তে তা মাইলস্টোন মনে করার সময় আসেনি। তবু যা কাজ হচ্ছে তাতে বলাবাহুল্য একটা প্রকৃত ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই যদি পঞ্জাবে, কাশ্মীরে—এ মাঝেমধ্যে মিলিটারি অপারেশন চালানো যায়, তা হলে ভবিষ্যতে এ হেন সংকটের হাত থেকে নিষ্ক্রমণের পথ প্রশস্ত হবে।

তার আগে অবশ্যই জাতীয় প্রশাসনের মধ্য থেকে 'ঘরশত্রু বিভীষণ' হটানো দরকার। পুলিশ প্রশাসনকেও সক্রিয় হতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থের মধ্য দিয়ে কখনওই চিরাচরিত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। আর যায় না বলেই উগ্রপন্থার কবলে আজ এ দেশ সংকটাপন্ন।

শুধু সেনা আর পুলিশ দিয়েও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ এবং জন-মাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃত কাজের পথ প্রশস্ত হতে পারে না।

বিশেষ প্রতিনিধি

ছবি : রাজেন্দ্র কুমার, সঞ্জীব ব্যানার্জি

Authorised Dealars

M/s. Krishna Trading Co. P-II, Chitpur Spur. CALCUTTA

M/s. West Bangal Stores 185, B.B. Ghosh Road, BURDWAN

M/s. Saria Tea Co. Chowdhary Katra, Mahabirsthan, SILIGURI.

For further Trade Enquiry, please contact to :—

M/S EKTA ENGINEERING UDYOG (P) LTD.

C-42, Sector VIII, NOIDA-201301 Dist. Ghaziabad. (U.P.)

es/

জলযোগ-এর রূপকথা

যে প্রতিষ্ঠানের ‘পয়োধি’ খেয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত, বাঙালির সেই ৬০ বছরের রসনাতৃপ্তিকারী ‘জলযোগ’–এর তৈরি ও বিস্তারের কর্মময় কাহিনী।

ফেয়ারওয়েল পয়োধি’–হেডিং দিয়ে কলকাতার একটি ইংরাজি দৈনিক ১৯৮৫–র ১ জুলাই স্মৃতিতর্পণ করল পয়োধির। তার আগে অবশ্য ১৯৮৪–র জুলাই মাসে অন্য দু’টি বাংলা দৈনিক পয়োদির অকাল বিয়োগে শোকাহত হয়ে তাঁদের প্রাণের শ্রদ্ধা ভালবাসা জানিয়েছেন খবরটির চারাদিকে কালো বর্ডার লাইন টেনে। কিন্তু কে এই পয়োধি ? না, ইনি বিখ্যাত কোন খেলোয়াড় নন, নন কোন আন্তর্জাতিক বা দেশীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতা, রূপালী পর্দার কোন নায়ক বা মোহময়ী নায়িকা। কিন্তু পয়োধি এদের চেয়ে কিসে কম ? বাঙালির ভালবাসার, অতি আদরের আপনজন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাতে মুগ্ধ , মোহিত। এবং এর নামকরণ তাঁরই করা। এবং যে প্রতিষ্ঠান এটি তৈরি করেন তাঁদের আন্তরিকতা, গুণগত নৈপুণ্যের তারিফ করেন প্রশংসাপত্র দিয়েও। ভোজন রসিক বাঙালি, ধনী গরীব নির্বিশেষে বাঙালির ঘরের কোণে সব অনুষ্ঠানেই তার উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ পয়োধির প্রস্তুতকারীদের যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল: জলযোগের মিষ্টান্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহার সঙ্গে যে পয়োধি সেবন করিলাম তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য পয়োধির, দুর্ভাগ্য বাঙালির, জীবিত থাকলে লজ্জিত হতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি দেখতেন কি করে বামপন্থী ইউনিয়নবাজির চাপে- বাঙলার গর্ব, বাঙলির গর্ব টিমটিম করা নামকরা বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ‘জলযোগ’ এর বিদায় ঘন্টা বাজল –১৯৮৪ সালে। অকালে ।১৯৮৩–৮৪র ঘটনা এখানে টানা নিরর্থক । তবুও অনতি–অতীতের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঙালি প্রতিষ্ঠান জলযোগ সুইটস ১৯৮৩র ১৮ এপ্রিল

উদ্যোগী পুরুষ গোপাল চন্দ্র সিংহ রায়

জলযোগ–এর সম্মুখভাগ : গাড়ি ভরা হচ্ছে যোগানের জন্যে

জলযোগের খাবার দাবার

থেকে বন্ধ থাকার কারণ—একজন সিটু ইউনিয়ন নেতাকে গড়িয়াহাট শাখা থেকে কয়েকশ গজ দূরে লেক মার্কেট শাখায় বদলি করা। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেনঃ ইউনিয়নের জুলুম আর গুণ্ডামিতে আমরা আক্রান্ত এবং রক্তাক্ত। যতদিন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি শিল্প মালিকদের এই অসহায় অবস্থা চলবে ততদিনে জলযোগের দরজা খুলবে না, সিটু সমর্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল শপস্ অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোশিয়েসনের সদস্যদের জঙ্গী আচরণে বিপন্ন হয়ে জলযোগ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাঁচটি মিষ্টির দোকান ও কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা করেছেন। তৎকালীন সহকারী শ্রম কমিশনার ১৬.২.৮৪ তারিখে স্বয়ং বলেছেন, এই প্রতিষ্ঠানে কোন শিল্প বিরোধ নেই। কর্তৃপক্ষের মতে এর অর্থ মালিক পক্ষের ক্লোজার ঘোষণা আইনত বৈধ। জলযোগ কর্তৃপক্ষ বললেন—সহকারী শ্রম কমিশনারের এই চিঠির পর জলযোগ সুইটসের ইউনিয়ন নেতারা আরও জঙ্গী হয়ে উঠলেন। যখন তাঁরা বুঝলেন কর্তৃপক্ষের ওপর আর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না—তখন তাঁদের লক্ষ্য হল 'জলযোগ ফুড প্রোডাক্টস'। ১৯৮৪—র ১১ এপ্রিল ফুড প্রোডাক্টসের চারটি শো রুমের মধ্যে তিনটি তাঁরা জোর করে বন্ধ করে দিলেন। চেষ্টা হয়েছিল কারখানা বন্ধ করে দেবার। কিন্তু কারখানার কর্মচারীরা সেই চেষ্টা প্রতিহত করেন। 'জলযোগ' কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ মাত্র একজন ইউনিয়ন নেতার জন্য তাঁদের এতদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হল। সত্যিই এই ঘটনা শুধু দুঃখের নয়, লজ্জারও। আমাদের প্রত্যেকের। অসম প্রতিযোগিতা থেকে যখন বাঙালি প্রতিষ্ঠান ক্রমে হটে যাচ্ছে সেই সময় টিকে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্বাসরোধ করে হত্যা—কলংকই শুধু নয়, একধরনের অপরাধও।

এই সেই 'জলযোগ' প্রতিষ্ঠান—যার প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্ম—সমাজের বিশিষ্ট সদস্য ব্রহ্মানন্দ দাস। তৎকালীন কলকাতার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে ১৯৩২ সালেও জলযোগের নাম। অবশ্য তখন জলযোগের ওয়ানম্যান শো। ১৯৪১ সালে জলযোগ—এ যোগ দিলেন গোপাল চন্দ্র সিংহ রায়। করিৎকর্মা পুরুষ। ঢাকার সোনারগাঁর বাসিন্দা। জীবনে কৃতী। দূরদর্শী এবং বাঙালি হিসেবে তাঁর নিজের জাতিটির জন্য কিঞ্চিৎ দুর্বলতা, মমত্ববোধ অবশ্যই ছিল। অবশ্য তিনি জানতেন না ভবিষ্যত প্রজন্ম কি বলবে তাঁর এই স্বাজাত্যাভিমানকে? উনি চেয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে। বাঙলার অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে। কারিগর এনেছিলেন ঢাকা থেকে। আর গোপাল চন্দ্রের যোগদানের পর এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি প্রমাণ করে তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং দূরদর্শিতা। সেই সময় ভীমনাগের সন্দেশ, কে.সি. দাসের রসগোল্লা ও জলযোগের দই—একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত নাম। তিনটিই 'অতি অবশ্য' যে কোন অনুষ্ঠানে। গোপাল চন্দ্র সিংহ জলযোগের অংশীদার ছিলেন ১৯৬২ পর্যন্ত। ১৯৬৩ তে তিনি এর একক মালিক। ১৯৬৯ পর্যন্ত আমৃত্যু। '৭০ থেকে '৮৩ পর্যন্ত তাঁর ছেলেরা জলযোগ সুইটসের কর্ণধার। আর '৮৪ এ তে তো এর কফিনের শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে গেছে।

১৯৫২ জলযোগের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। বেকারি বিভাগ। জলযোগ বেকারি প্রাইভেট লিমিটেড। গোপাল চন্দ্র সিংহ রায় এবং তাঁর ভাই ফণীন্দ্রনাথ সিংহ রায়—এর যৌথ তত্ত্বাবধানে—বেকারি বিভাগটি চালু হল। তখন মূলত তৈরি হত রুটি ও কেক। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ছিল কারখানা। ১৯৬২ তে বেহালার এস.এন. রায় রোডে নিজস্ব ফ্যাকটরি শেডে বেকারির প্রোডাকশন বিভাগ স্থানান্তরিত হয়। এর পর প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা প্রাইভেট লিমিটেড থেকে পার্টনারশিপে চলে যায়। গোপালচন্দ্রের ছয় ছেলে যোগদান করেছেন এই ব্যবসায়ে।

১৯৬২ পর্যন্ত জলযোগ ফুড প্রোডাক্টস জোর দিত রুটি তৈরির ওপর—যদিও কেক বানানো হত কিন্তু প্রাধান্য পেত পাউরুটি। গোপালচন্দ্রের ছেলেদের সময় থেকে কিন্তু জোর দেওয়া হল কেকের ওপর। শুধু তাই নয় নোনতা বিভাগ খোলা হল। তৈরি হতে লাগল নানান রকম ঘ্রিয়ে ভাজা চানাচুর। চিকেন, মাটন ভেজিটেবল, প্যাটিস, মোগলাই পরোটা, কাটলেট ফিস ফ্রাই ইত্যাদি।

১৯৭৫ থেকেই জলযোগ ফুড প্রোডাক্টদের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। শুরু থেকেই ওঁদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। বাইরের এজেন্ট মাধ্যম কম ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ থেকে এজেন্টদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। গোপালচন্দ্রের পাঁচ ছেলে (বড় ছেলে আশীষ কুমার সিংহ রায় ১৯৭৫—এ অবসর গ্রহণ করেছেন) চাইলেন এজেন্ট এবং ডিলার নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে জলযোগের কেক, রুটি প্যাটিস ইত্যাদি দূর দূরান্তের লোকের কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁরা চাইলেন নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্রেতাকে তাঁদের টার্গেট করতে। অল্প দামে ভাল খাদ্য সামগ্রী যদি এঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে তার ফল হবে সুদূর প্রসারী। এলিট সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদের ফুড প্রোডাক্ট আছে কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য হল আপামর জনসাধারণ এর মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে কারখানার শ্রমিক, গ্রামের চাষী, মেহনতি মানুষদের হাতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে কলকাতার সাহেব পাড়ার নামী কোম্পানীর সমতুল্য (এবং তার চেয়ে অনেক ভালও) কেক ও খাবার জিনিস তুলে দিয়ে মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটানো যায়। সাহেব পাড়া থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে, দৈনিক খাদ্য তালিকায় কেকের স্থান করে নিতে রায় পরিবারের ছেলেরা ব্রতী হলেন।

মিষ্টির কারখানা ক্লোজার এরপর তাঁদের বিক্রয় নীতি আমূল পরিবর্তন করলেন। এজেন্ট-ডিলার মারফৎ চাইলেন প্রত্যেকটা 'পকেটে'

পৌঁছাতে। এতে ফল হল---স্বাভাবিক ভাবেই। এখন বড় আছেন ডিস্ট্রিবিউটার ৭ জন, এজেন্ট ৮ জন। যদিও পার্ক সার্কাসে নিজস্ব দোকান আছে--কিন্তু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যে শিক্ষা নিয়েছেন তার ফলে নিজেরা নতুন করে দোকান খুলতে আগ্রহী হলেন না আদৌ। বরং এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউশন নীতির মাধ্যমে কিছু বেকার বাঙালি ছেলের কর্মসংস্থানের সুযোগ আনলেন---বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঁরাও চাইলেন কিছু বাঙালি তরুণকে ব্যবসামনস্ক করে তুলতে। এর জন্য ওঁরা এজেন্টদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেন---এবং ওদেরই কথায় 'এজেন্টরা প্রায় মূলধন ছাড়াই ব্যবসা করছেন।' জলযোগ ফুড প্রোডাক্টসের মালিকদের এটা অবশ্যই একটা অ্যাচিভমেন্ট। শুধু তাই নয়, এজেন্সি দিতে গিয়ে ওঁরা দেখেছেন একটা পুরো পরিবারকে টেনে আনা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ওঁদের তরফে কল্যাণ রায় জানালেন-যেখানে বাবা, ছেলেরা,

ভিয়েন চলছে

ছেলের বৌরা দোকানে বসছেন। এবং সফলভাবে ব্যবসা চালাচ্ছেন। এই যে মোটিভেশন একটা পরিবারকে একই সঙ্গে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা বর্তমান ভঙ্গুর যৌথ বাঙালি পরিবারের পটভূমিকায় অবশ্যই অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত।

কত রকম কেক বানান এঁরা? প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রকমের। বিভিন্ন নাম---স্বাদ এবং দাম। তবে কোয়ালিটির ব্যাপারে ওঁরা সুতীক্ষ্ণ। মালের গুণগত নৈপুণ্যের সঙ্গে কোন রকম কম্প্রোমাইজ নয়। আগে নিজের বাচ্চাকে খাওয়ান---পরে সেই জিনিস অন্যের বাচ্চাকে খাওয়ান। বাজারে মাল ছাড়ার আগে এই ওঁদের নীতি। স্পেশাল চকোলেট রোল, সুইস রোল, সুপার পেস্ট্রি, বিস্কুট চকোলেট স্লাইস, বিস্কুট পাইন এ্যাপল স্লাইস, ফ্রুট কেক, বাটার চেরি, বাটার কেক, টু-ইন-ওয়ান, ক্রীম রোল, ক্রীম পাফ, চকোলেট বিস্কুট প্যাস্ট্রি, পাম কেক ইত্যাদি। এছাড়া আছে সুলতানা, ওয়াইন কেক ও বিয়ার কেক। এতে অবশ্যই মদ বা বিয়ার দেওয়া হয়। এবং এই সব কেক সাধারণত কোন সিজন্যাল অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হয়। কেক তৈরি সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে হয়। ময়দা মেশানো সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতে এবং মেশিনে হয়। এরপর এর সঙ্গে এক নম্বর মাখন, চিনি, দুধ, ডিম, জল, শুকনো ফল মেশানো হয়। এরপর হয় ছাঁচে ফেলা। তারপর বেকিং ওভেনে পাঠানো। দু' রকমের উনুন আছে-বৈদ্যুতিক এবং কাঠের। তবে লোডশেডিং এর দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঁরা কাঠের উনুনের ব্যবস্থা রেখেছেন স্ট্যাণ্ডবাই হিসেবে। কেননা ডিজেল চালিত উনুনে লোড বেশি পড়ায় মেশিনের যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা সব সময় থাকে। একটি ডিপার্টমেন্টের মাথায় থাকেন একজন হেড মিস্ত্রি। এই রকম ১৫টি ডিপার্টমেন্ট আছে। আর প্রত্যেকটির ওপরে দেখভাল করার জন্য আছেন একজন সুপার ভাইজার। একজন শ্রমিকের সবচেয়ে কম মাসিক বেতন ৬৫০ টাকা। একস্ট্রা নিয়ে প্রায় ২০০০ হাজার টাকা পান এমন কর্মচারী অনেক আছেন এঁদের ফ্যাকটরিতে। এদের ফ্যাকটরিতে প্রত্যেক দিন তৈরি করা কেক প্যাটিসের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ হাজার। দিনে ৮ ঘন্টা ডিউটি। ফ্যাকটরি রোববার বন্ধ।

এঁদের প্লাস পয়েন্ট এঁদের জিনিসের দাম কম এবং কোয়ালিটি ভাল। তাই দিনকে দিন কেক, প্যাস্ট্রির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কোয়ালিটি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার রণজিৎ রায় বলেন যে সম্পূর্ণ মেকানাইজড পদ্ধতিতে তাঁদের উৎপাদন হয় আর বাজারের এক নম্বর ক্রিম, মাখন, চিনি দুধ, ডিম তাঁরা ব্যবহার করেন। সাহেবপাড়ার তথাকথিত নামী কোম্পানির কেক এবং তাঁদের তৈরি কেক যদি কাউকে না বলে খেতে দিয়ে মতামত চাওয়া যায় তবে ভোট তাঁদের পক্ষেই যাবে। এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত। তাঁরা তাঁদের বাবার মন্ত্রে বিশ্বাসী---অল্প পয়সায় ভালো জিনিস খাওয়ানো। খাওয়ার জিনিসের সঙ্গে কোন রকম আপস নয়-কোন রকম লোভের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা নয়। রণজিৎ রায় নিজে শিল্পী-কেকের নিত্য নতুন ডিজাইন তৈরিতে সিদ্ধহস্ত।

তাঁদের এই মনোভাবের জন্য সরকারি পরিচালনাধীন বা অন্যান্য নামী প্রতিষ্ঠানের কেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আদৌ শংকিত নন। ওঁরা কাউকেই প্রতিযোগী মনে করেন না। নিজেদের নীতি অনুসারে ব্যবসা চালান। সবচেয়ে কম দামে ভালো জিনিস করব এই ওঁদের নীতি। ওঁদের কোয়ালিটির দিক দিয়ে অন্য প্রতিযোগী মারবে সে ভয় একেবারেই করেন না। 'নিজেদের দাম নিজেরাই ঠিক করি-নিজস্ব নীতিতে আমরা চলি।' ওঁদের পাঁচ ভাই এর একই কথা। অবশ্য বিভিন্ন কেক-এর বিভিন্ন রকম আয়ু বলে এবং সেই আয়ু বেশি দীর্ঘ নয় বলে ওঁরা অনেক দূরের গ্রাহকের কাছে যেতে পারছেন না। তাই নতুন ধরনের কেক-প্রিজারভেটিভ কেক পুজোর পরই বাজারে ছাড়ছেন-যা একমাস খাওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভয়ে। খারাপ হবে না বিন্দুমাত্র। তবে ক্রমাগত জিনিসের বিশেষত খাদ্য সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁরা শংকিত। ময়দা, মাখন, দুধ, বনস্পতির দাম বেড়ে যাচ্ছে। এক এক সময় পাওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত ওঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে ভবিষ্যতে কি হবে এই মুহূর্তে ওঁরা তা একেবারেই জানেন না।

১৯৮৪ তে মিস্টির দোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর এঁরা চালু করেছেন জলযোগ আইসক্রিম। সম্পূর্ণ এয়ার কণ্ডিশণ্ড এবং অটোমেটিক প্লান্টে আইসক্রিম তৈরি হচ্ছে। নামও সব বিচিত্র এবং রসালো। স্পঞ্জ কেক উইথ আইসক্রিম, মাউন্ট ক্যারামেল, চকোলেট ক্যাস্‌ল, রক-এণ্ড-রোল, মেগাস্টার-এই রকমের প্রায় চল্লিশ রকমের আইসক্রিম। এবং বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানটির তৈরি আইসক্রিম যে কোন নামী এবং অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি আইসক্রিমের চেয়ে খারাপ তো নয়ই, বরং ভালো-এ বিষয়ে তাঁরা স্থির নিশ্চিত। কেননা আইসক্রিম বিক্রির ক্রমাগত উর্ধহারের গতি রেখাচিত্রই তার প্রমাণ।

গোপালচন্দ্র সিংহ রায় উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁর হাতের তৈরি ইন্দিরা সিনেমা, পিয়াসী সিনেমা এবং অনেক বসত বাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত তাঁর জীবন শুধু অর্থ নয় অন্য অর্থের সন্ধান করেছিল। করেছেন তিনটে স্কুলের প্রতিষ্ঠা, অনেক মিশন এবং সংঘকে আর্থিক অনুদান। তিনি ছিলেন শিল্পের পূজারী। তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর ছেলেরা আশিস কুমার সিংহ রায়, দীপক সিংহ রায়, অপূর্ব সিংহ রায়, রণজিত সিংহ রায়, কল্যাণ সিংহ রায়, রুদ্রকমল সিংহ রায়-এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব জগত আছে। ব্যবসার বাইরে সেখানে কেউ বেহালা, বাঁশি, ম্যাণ্ডোলিন বাজান। কেউ বাংলার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কেউ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী। প্রত্যেকেই নিজের জগতে পূর্ণ। কিন্তু যখন এঁরা ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলেন তখন পাঁচ ভাই (বড় ভাই আশিস কুমার অবসর নেওয়াতে) মাসে দু'বার করে মিটিং করেন। কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে প্রত্যেকে মত দেন। ঝগড়া হয়। কিন্তু সাময়িক। পরক্ষণেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হাসি মুখে। একেবারে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। একটা টিম স্পিরিট ওঁদের মধ্যে আছে। তাই ওঁরা পেরেছেন জলযোগের টার্নওভারকে ১ কোটি টাকার ওপর নিয়ে যেতে। যখন আমাদের মধ্যে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে তখনও কি সুন্দর ভাবে সিংহ রায় পরিবারের ভায়েরা একসঙ্গে আছেন। শুধু আছেন নয়, থাকবেনও কেননা-জলযোগের মুখ চেয়ে আছে কয়েক হাজার পরিবার। সেই মুখে সব সময় হাসি ফুটিয়ে রাখতে তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ। নিজেদের কাছে। স্বর্গীয় পিতার স্মৃতির কাছে।

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জনপ্রসাদ: স্থাপত্য, সংগীত ও সাহিত্যের পান্থ

স্থাপত্য, সঙ্গীত ও সাহিত্য—এই তিনটি বিষয়েরই একটির থেকে অন্যটির দূরত্ব যথেষ্টই। কিন্তু এই দূরত্বকে নিকটস্থ করেছেন রঞ্জনপ্রসাদ। তিনি অনায়াসেই কর্ণিক থেকে গীটার কিংবা গীটার থেকে কলমে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। একাধারে রাজ্য সরকারের একজন সুনামী স্থাপত্যবিদ্ তিনি। অন্যদিকে একজন খ্যাতিমান গীতিকার, সুরকার ও গায়ক এবং ছোটদের লেখক হিসেবেও যথেষ্ট পরিচিত।

সম্প্রতি এই গুণী মানুষটির সরাসরি সান্নিধ্যে এলাম এই সেদিন। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরে রেওয়াজ করতে বসেছেন ১২ বসন্ত বসু রোডের আটতলা বাড়িটির সর্বোচ্চতলায়। এটিই তাঁর সাধনাক্ষেত্র। চারপাশে ছড়ানো হারমোনিয়াম, তবলা, স্বদেশি বিদেশি নানা রকমের গীটার এবং প্রচুর ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট। ঋষিপ্রতীম মগ্নতায় এই শহরে যুবা গেয়ে চলেছেন একটির পর একটি স্বদেশি সঙ্গীত। যাতে বাংলার লোকগীতি ও বিদেশি লোক গানের সুর মিলেমিশে তৈরি করেছে এক স্বতন্ত্র ঘরাণার গান। যাকে তিনি বলছেন, নগর জীবনের লোকগীতি।

হ্যাঁ, তাঁর গানের এরকম নামকরণের যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা ইতিমধ্যে প্রেম, পূজা, প্রকৃতি নানা পর্যায়ের গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু পৌরুষ? সত্যি কথা বলতে কি লক্ষ্য করিনি। একমাত্র রঞ্জনপ্রসাদের নগর জীবনের লোকগীতিতেই তিনি তা ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। এই কারণেই তাঁর গান আমার মতো আরও অনেকের কাছেই প্রিয়।

ষাটের দশকের শেষার্ধে তাঁর গানের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। প্রধানত রেডিওতে ও মঞ্চেই শুনেছি সেসব গান। পরে হিজ মাস্টার ভয়েজ থেকে প্রকাশিত একটি ডিস্কও আমাদের হাতে আসে। আর সেই ডিস্ক তখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বহু মানুষের কণ্ঠে ফিরতে থাকে, চল মিনি আসাম যাবো। দেশে বড়ো দুঃখ রে কিংবা দুরন্ত জীপের চাকায়। হাইওয়ে যেন গান গাই। বহুদূরে দেখা যায় আর্মি ট্রাকের কনভয়...ইত্যাদি গানগুলি। রঞ্জনবাবুর কথাতেই জানা গেল, এই গানগুলি যখন জনপ্রিয় হয়ে সারা শহর মাত করছে, তখনও তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। মঞ্চেও গাইতে শুরু করেছেন সে সময়ই। গুরু হিসেবে পেয়েছেন প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে। তাঁর অনূদিত বহু গানেই সুর দিয়েছেন হেমাঙ্গবাবু। মৃত্যুর আগে হেমাঙ্গবাবু লিখিতভাবে স্বীকারও করে গেছেন রঞ্জনপ্রসাদের কাছে বিশেষ সহযোগিতার কথা। আসলে, বহু ইংরেজি লোকগীতিকে বাংলায় রূপান্তর করেছেন এই শিল্পী। পরে সেগুলিকে সুর দিয়েছেন নিজের মতো করে। সেই কারণে তাঁকে অনেকেই ফোক সিঙ্গার বলেই জানেন।

তিনি যখন মঞ্চে ওঠেন, সঙ্গে কোনও অ্যাকোমপেনিস্ট থাকে না। নিজেই তখন ওয়ান ম্যান ব্যান্ড। মুখে বলুজ হারমোনিয়াম, গলায় ঝোলানো স্প্যানিস গীটার আর হাতে গোয়ালপাড়ার দোতারা। এই কান্ট্রি মিউজিশিয়ান সবই বাজাতে পারেন। কারও সাহায্যের দরকার পড়ে না এই কারণেই। রঞ্জনপ্রসাদের এই নিজস্বতায় যে শ্রোতারাও খুশি হন—এটা জানা যায় তাঁর কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেই।

সেদিন তাঁর চর্চা স্থলে গান শুনতে শুনতে যখন অভিভূত হয়ে পড়েছি—তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্র এই শিল্পীটিকে প্রশ্ন করে ফেলেছি—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি এই কলাবিদ্যাটিকে মেলালেন কি ভাবে? হাসতে হাসতেই জানালেন, নিষ্ঠা ও একাগ্রতাই এর মিলন সেতু। আর সেটা মনে রেখেই গান গাই, গান লিখি, সুর দিই, ছড়া বা গল্প লিখি, আবার বাড়ি ও রাস্তাঘাট বানাই। সবই ইচ্ছে থেকে। আসলে ইচ্ছের বীজ বপন করে জল ঢালতে হয়। যোগান দিতে হয় সার ও মাটির। সেটাকেই আমি নিষ্ঠা বা একাগ্রতা বলেছি।

সত্যিই এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জোরেই রঞ্জনপ্রসাদ আজ আলোচিত নাম। এতক্ষণ তো গানের কথা বললাম। এবার শুনুন তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা। সেখানেও তিনি সাড়া ফেলেছেন যথেষ্ট। অবশ্যই ছোটদের লেখক হিসেবে। প্রধানত ছড়া লেখেন কয়েকটি নামী দৈনিকের পাতায়, সেই সঙ্গে ছোটদের উপযোগী গল্প। সেইসবই তাঁর গানের মতোই অন্য স্বাদের—অন্য রকমের। একবার সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'মুদ্রারাক্ষস' নামে একটি উপন্যাস লিখে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। পাঠকদের বিচারে সেই উপন্যাসটি অনেক নামী লেখককে পিছনে ফেলে তৃতীয়স্থান পেয়েছিল।

এসব নিয়ে অবশ্য ওই মানুষটির কোনও গর্ব নেই। বললেন, ভালবাসার টানেই এসব নিয়ে ডুবে থাকতে ভালবাসি। নিজে আনন্দ পাই। আর সে আনন্দে অন্যেও অংশীদার হলে ভালো লাগে।

– স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরসভা

এক যাত্রায়

ছবি : গোপাল দেবনাথ

তীব্র আর্থিক সংকটের জন্য ১৯৭৭ সালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভেঙে কর্মীদের বেতন দেবার দায়ে কংগ্রেস পরিচালিত বর্ধমান পুরসভাকে বাতিল করা হয়। বর্তমানে একই কাণ্ড ঘটছে বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরসভায়। এজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থশংকর রায়ের প্রশ্ন এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? এর জবাব কি তথ্য শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক দেবেন?

স্বরাষ্ট্রদপ্তর

কাগজ—কলমে

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ, বামফ্রন্টের ১৪ বছরের শাসনে পুলিশের গুলিতে ১৭২ জন নিহত হয়েছেন। এদের একটা বড় অংশই বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অথচ মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু বারে বারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গণ আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। কথায় ও কাজে কেন এই ফারাক?

ছবি : উত্তম রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাঁধা, চুলবাঁধা

লোক সঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ আব্বাস উদ্দীন আমেদের নাতনী সয়ীদা কামাল যে তাঁর দাদুর ঐতিহ্য বহন করবেন, এতে আশ্চর্য কি? তবে পেশাগত ভাবে শ্রীমতী কামাল ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপিকা। সঙ্গীত ও সংখ্যাতত্ত্বের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। এই দুই মেরুর মেলবন্ধন কি করে অটুট আছে এ প্রসঙ্গে আব্বাস-উদ্দীন স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে যোগ দিতে আসা সয়ীদা কামালের জবাব, 'চেষ্টা করলে রাঁধার সঙ্গে চুলও বাঁধা যায়।'

ছবি : চন্দন নিয়োগী

ঝাড়খণ্ড পার্টি

সংজ্ঞা চাই

ছবি : তাপস কুমার দেব
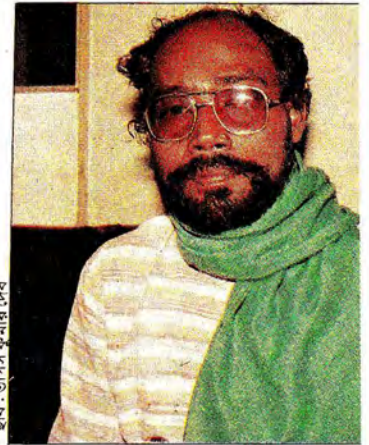
ঝাড়খণ্ড পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও বিধায়ক নরেন হাঁসদা অভিযোগ তুলেছেন, সি.পি.এমের কোন

কোন নেতা ঝাড়খণ্ড বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বলে চিৎকার করছেন। অথচ মুখ্য-মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্যান্য বিচ্ছিন্ন-তাবাদী দলের কথা থাকলেও, ঝাড়খণ্ড পার্টির নাম নেই। আগে ওঁরা ঠিক করুন ঝাড়খণ্ডীরা বাঙালি, ওড়িয়া না হিন্দুস্থানী! ঝাড়খণ্ডী শব্দের আড়ালে শোষণ কতদিন চলবে?

মহাকরণ

দলবাজির ত্রাণে

ছবি: তাপস কুমার দেব

ফ্রন্টের ইতিহাসে এই প্রথম এক মহিলা মন্ত্রী ছায়া ঘোষ মহাকরণে চার দেয়ালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছেন। রাজ-নীতির আগুনে লড়াকু মেয়ে ছায়াদির অবস্থা ত্রাণকার্যে নেমে অনেকটা কংগ্রেস (ই)র মমতা ব্যানার্জির মত। একদিকে সি পি এম অন্যদিকে কংগ্রেস—সকলের সমালোচনার পাত্রী তিনি। ছায়া ঘোষের ক্ষোভ, 'ত্রাণ দপ্তরে কাজের স্কোপ খুব কম, বরাদ্দও—নাম মাত্র, তাও সময়ে পাওয়া যায় না। তবু আমি যতটা পারব দলবাজির গড্ডালিকা প্রবাহ বন্ধ করব।'

রাজভবন

কবিতা থেকে মিছিলে

মুখ্যমন্ত্রীজায়া কমল বসুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কবিতা লেখার মত আপনি রাজ-নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও আগ্রহী কি না? তাঁর জবাব, কেন নয়, একজন ডাক্তারের বাড়ির রাঁধুনী পর্যন্ত ওষুধ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে আর আমা-দের বাড়ি তো রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। কোন ব্যাপারেই নিস্পৃহ থাকাটা বাহা-দুরি নয়। এ কথাতেই আসল বক্তব্যটি মুখ্যমন্ত্রী জায়ার সুন্দর উপমা কবিতার ভাষায় বুঝিয়ে দিল।

ছবি: তাপস কুমার দেব

ছবি: গোপাল দেবনাথ

আয়করদপ্তর

প্রতিরোধিনী

নেতাজী নগরে ৪৫ টি দুস্থ পরিবারকে গৃহহারা করে জমির দখল নিতে আসা আয়কর অফিসার কেন্দ্রিয়মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিরোধের সামনে পড়ে পালালেন। কিন্তু পালাবার পরে রটালেন মমতা নাকি তাঁকে কলার ধরে মেরে-ছেন। সুযোগ বুঝে বামমার্গী প্রচার-বাহিনী কুৎসা ছড়াতে নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে—সাথ দিয়েছে বিভাগের বামকর্মীরা। তাতে কি তারা প্রতিরোধের প্রাচীর উপড়ে কন্ট্রাকটরের সুবিধে করাতে পারবে!

দূরদর্শন

কৃষ্ণ—বিপত্তি

দূরদর্শনে বছরখানেক ধরে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' দেখাবার ফল রাজনীতিতে কি হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কংগ্রেস (ই)। এই অবস্থায় রামানন্দ সাগর অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও তাঁর 'কৃষ্ণ' সিরিয়াল দূরদর্শনে ঢোকাতে পার-ছেন না। তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী গিরিজা ব্যাস তো সরাসরি না করেই দিয়েছেন। পূর্ণমন্ত্রী অজিত পাঁজার মন্তব্য 'কৃষ্ণ' হয়তো ভাল ধারাবাহিক, তবে টি ভি দেশের সকলের সম্পত্তি; তাই ধর্মমূলক ধারাবাহিক দিয়েই তা ভরিয়ে ফেলা কি উচিৎ হবে? বরং ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এসব ব্যাপারগুলিও থাক না।

চন্দন নিয়োগী

হিল কাউন্সিল

বাংলা বাদ

গোর্খা পার্বত্য উন্নয়ন পর্ষদের সুভাষ ঘিসিং এর বিরুদ্ধে দার্জিলিং জেলা সি.পি.এম সম্পাদক ও সাংসদ আনন্দ পাঠক অভিযোগ তুলেছেন, শ্রী ঘিসিং জেলার প্রতিটি স্কুলে সার্কুলার পাঠিয়ে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা বিধি' অগ্রাহ্য করে বাংলাকে নয়, নেপালী ভাষাকে আবশ্যিক করতে হবে। শ্রী পাঠকের বক্তব্য, এই দাবি শ্রী ঘিসিং এর——বৃহত্তর নেপালের বায়-নার একটি অঙ্গ।

ছবি: সুব্রত কাঁটি

এভারেস্টের বেসক্যাম্পে

নির্মম পাহাড়ী পথ। একদিকে মৃত্যুর হাতছানি
অন্যদিকে তার অপূর্ব সৌন্দর্য। ফুল, রঙ-বেরঙের গাছপালা আর আতঙ্কের এ হেন পথ ধরে এভারেস্ট আরোহণের রোমহর্ষক অভিযান।

হঠাৎ নতুন করে ডাক শুনতে পেলাম। গাছে গাছে নব পল্লবের শিহরণ। ফুল ডালে ডালে। কালো ভ্রমরের গুঞ্জন। ডাক শুনতে পেলাম দূর নীল আকাশ থেকে, উতলা সমুদ্রের সুনীল ফেনিল জলরাশি থেকে।

চোখ বুজতে কেমন সব গোলমাল ঠেকে। মুহূর্তে সব হারিয়ে যায়। চেনা অচেনার এত দিনের সব হিসেব নিকেশ উবে গিয়ে পরিবর্তে যাকে পাই, সে বুঝি আমার জন্ম জন্মান্তরের সাথে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

মুহূর্তে সব ভুলে যাই। মাথা নত হয়ে আসে। মনে মনে বলি,যাচ্ছি তোমারই কাছে, ধ্যানাসনের সন্ধানে।

এবারের আমন্ত্রণ নেপাল হিমালয়ের। উদ্দেশ্য কালাপাত্থর পর্বত এবং এভারেস্ট বেসক্যাম্প। সে সাথে হিমালয়ে শেরপা গ্রামে থাকবার এবং ওদের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। নেপাল হিমালয়ের পুরোনো তিব্বতি মঠ এবং লামাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এবং পরিশেষে এভারেস্টের নীচে খুম্বু হিমবাহে রাত কাটাবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

হিমালয়ের এমন হাতছানিতে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের যাত্রা হল শুরু মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থেকে। দিনটি ছিল ২ মে ১৯৮৮। শিলিগুড়ি, পানিটেংকি, কাঁকড়াভিটা হয়ে কাঠমাণ্ডু পৌঁছলাম ৪ঠা মে সকালে। উঠলাম শহিদ স্তম্ভের কাছে একটি গেস্ট হাউসে। কাঠমাণ্ডু থামেল বাজার থেকে কয়েকজন সদস্যের জন্যে রুকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হল।

কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম ৬ মে সকালবেলা। ২১জন বসার মত ছোট প্লেন ছাড়ল সকাল ৭·১৫ মিনিটে। ৪৫ মিনিটের আকাশপথে আমরা পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের ঢালে এক সুন্দর উপনগরী লুকলায় (৯১০০ ফুট)। বিমানবন্দরটি ছোট। পাহাড় বলে রানওয়েটি বেশ ঢালু।

লুকলায় নিকটবর্তী একটি দোকানে চা আর নুডলস খেলাম। এখানে পরিচয় হল এক শেরপা ছেলের সাথে। নাম ছাম্বা। বয়স সতের আঠার। আমাদের সাথে যেতে ও রাজী হল। গাইড কাম কুলি হিসেবে। দৈনিক নেপালী ৬০ টাকা হারে (ভারতীয় টাকায় ৩৬ টাকার মতো)। খাওয়া দাওয়া অতিরিক্ত।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে লুকলা থেকে যাত্রা করলাম পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। ক্রমশ গিয়েছে নদীর ধারে। পাহাড়ের ঢালে রঙ বেরঙয়ের বাড়ি। মাঝে মাঝে চাষের ক্ষেত। চিরাচরিত পাহাড়ী সৌন্দর্য। হঠাৎ দেখতে পেলাম পর্বত শিখর কুসুম্মকাংরী (৬৩৬৯ মিটার)। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে আমরা পৌঁছলাম পাহাড়ী লোকালয় ফাকদিংয়ে (৮৭০০ ফুট)। প্রথম দিনের অবস্থান এক শেরপা লজে।

পরদিন যাত্রা শুরু করলাম খুব ভোরে। কাঠের সেতু পেরিয়ে পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়েছে। পাশে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী দুধ কোশী। দুধের মতোই জলের রং। আস্তে আস্তে সূর্য উঠল তার সোনাঝরা রঙ নিয়ে। পাহাড়ী অপরূপ রূপের ভাণ্ডার এসে হাজির হতে লাগল আমাদের সামনে। এক মিষ্টি শীতলতা।ওপাশে হঠাৎ দেখতে পেলাম শুভ্র বরফে মোড়া পর্বত শৃঙ্গ ট্রামসারকু (৬৬০৮ মিটার)। এমনি করে পাহাড়ী সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছলাম চুমোয়া গ্রামে। জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সবজি ক্ষেত এবং হোটেল রয়েছে এখানে। তারপর মঞ্জের গ্রাম। এখানে এক শেরপা দোকানে চা আর আলু সেদ্ধ খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলাম। পথ কখনো উতরাই, কখনো চড়াই। এমনি করে আরো খানিকক্ষণ হাঁটলাম। এলো জোরসারে। এরপর থেকে শুরু সাগরমাথা জাতীয় উদ্যান। আমাদের যেতে হবে জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে। সেকারণে প্রবেশপত্র হিসেবে জনপ্রতি দিতে হল নেপালী ৬০ টাকা। জোরসারে অতিক্রম করার পর শুরু হল ঘন বন। দুধ কোশী নদীর গা ঘেঁষে বেশ খানিকটা যাবার পর আরেকটা সেতু পেরিয়ে চড়াই আরম্ভ হল। রাস্তা ক্রমশ যেন আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। পথেরও যেন শেষ নেই। মাঝে এক পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখলাম পর্বতশিখর লোৎসে এবং মাউন্ট এভারেস্ট রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ঘন্টা চারেক ধরে চড়াই ভেঙে অবশেষে পৌঁছলাম নামচে বাজারে (১১,৪০০ ফুট)।

পরদিন আট তারিখ। বিশ্রামের দিন। সকালবেলা বেরোলাম স্থানীয় গুম্ফা দেখতে পাহাড়ের উপরে। ওখান থেকে পর্বতশিখর চৌ ইউ (৮১৫৩মি) সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম। এরপর আমরা গেলাম সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের হেডকোয়ার্টার এবং মিউজিয়ামে। তারপর ওখান থেকে গেলাম সিয়াংবোচে রানওয়েতে।

ক্রমশ বরফের ঘনত্ব বাড়ে। বাড়ে শুভ্রতার প্রকোপ

৯ মে, যথারীতি নতুন করে যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ গিয়েছে এগিয়ে। অচিরে পেলাম রডোডেনড্রনের বাগান। লাল, সাদা, হলুদ, নীল, বেগুনি, ভিন্ন রংয়ের ফুল ফুটে আছে সমস্ত বন জুড়ে। মাঝে মাঝে পাইন, উইলো আর জুনিপারের মেলা। পেলাম হিমালয়ের কয়েক-জাতের পাখীর দর্শন, নীল রবিন, গ্রাণ্ডালা এবং গোল্ড ক্রেস্ট। ভারী চমৎকার, অপরূপ। এমনি করে একসময় এলো ফুংকি টেংকা। তিব্বতীদের দুতিনটে ঘর। চা পানের বিরতি শেষে পুনরায় পথ চলা। শুরু হল ভয়ানক চড়াই। ক্রমশ উঠে গিয়েছে পাহাড়ের মাথায়, থিয়াংবোচে (১২,৭০০ ফুট)।

থিয়াংবোচেতে রয়েছে বৌদ্ধ মঠ। মঠকে ঘিরে গোটাকয়েক বাড়ি। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় থিয়াংবোচেকে মনে হচ্ছিল রঙ আর রূপের রাণী।

লামা উপাসকদের সাথে কথাবার্তা হল। অদূরে লামা বাচ্চাদের পড়বার জন্যে ছোট বিদ্যালয়। ফেরার পথে মঠে ওঁদের উপাসনা কক্ষে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখেছিলাম উপাসনা ঘরের গুরুগম্ভীর পরিবেশে লামা উপাসক এবং লামা ছাত্রদের সংস্কৃত মন্ত্রোচারণ। গৃহের চারদিকের দেওয়ালে সুদৃশ্য চিত্র ভিন্ন রঙে ভিন্ন অবয়বে। থিয়াংবোচেতে দেখা হল আংলাকপা শেরপার সাথে। চীন, জাপান এবং নেপাল ত্রিদেশীয় এভারেস্ট অভিযানের বিজয়ী অভিযাত্রীদের একজন। আংলাকপা তিব্বতের দিক দিয়ে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেছেন এবং নেমেছেন নেপালে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরের অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। একপাশে কুসুমকাংরি, খুমবিলা, সামনে ট্রামসারকু আর তারপরে লোৎসে, এভারেস্ট আর ন্যুৎস-এর অপরূপ সৌন্দর্য।
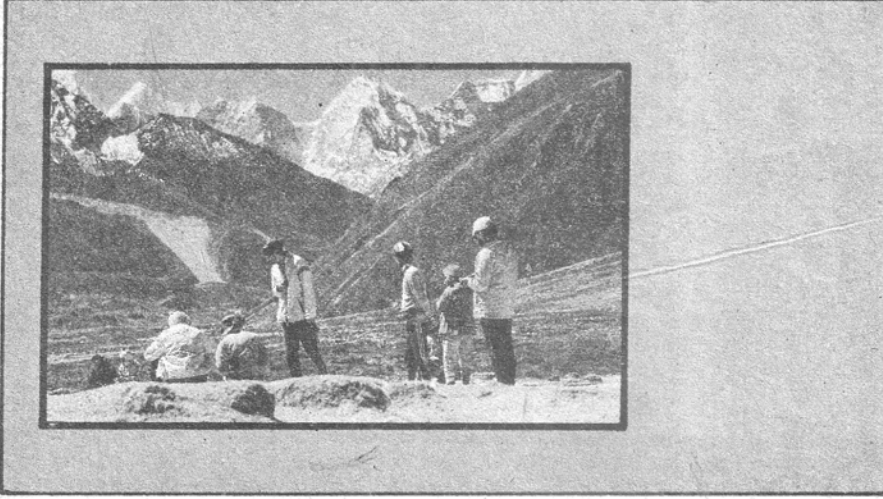
যথারীতি পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু হয় সকালবেলা। সেই ঘন বনের বুক চিরে। খানিকটা নেমে পাহাড়ী নদী ইমজা খোলা। ওটা পেরিয়ে চড়াই। আসে লোকালয় পাংকাচে (১৩,১০০ ফুট)। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চলি। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। গাছপালা অচিরে শেষ হয়ে যায়। এক নতুন জগতে প্রবেশ করি। খানিক পরে রাস্তা দুভাগ হয়ে যায়। ডানে ইমজা খোলা নদীর ধার ঘেঁষে পথ চলে গেছে ডিংবোচেতে। আমরা বাঁদিকের পথ ধরে ছোট পাহাড়ের মাথায় উঠে যাই। তারপর ক্রমশ চড়াই ভেঙে,পৌঁছে যাই ফেরিচেতে (১৩,৯০০ ফুট) সুন্দর পাহাড়ের অববাহিকায়। চারদিকে ঘিরে রয়েছে পাহাড়। সামনে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ী নদী।

ফেরিচেতে জাপান সরকারের সৌজন্যে একটি ক্লিনিক ল্যাবোরেটারি রয়েছে। ওটা বন্ধ ছিল। খুলবে পয়লা অক্টোবর। বিকেলে দূরের পাহাড়ী গ্রাম থেকে দুজন শেরপা মহিলা এলেন ঔষধের জন্যে। আমাদের গাইড শেরপা ছাম্বা এবং দলের সহনেতার উদ্যোগে ওদের ঔষধ দেওয়া হল আমাদের ঔষধের বাক্স থেকে। ওদের মুখে ফুটে উঠেছিল কৃতজ্ঞতার ছায়া। এখানে দেখা হল এভারেস্ট দলের সদস্য আং লাকপা দোরজীর সাথে। দোরজী এভারেস্টের ছয় নং ক্যাম্প পর্যন্ত উঠেছিলেন। পায়ে টান ধরায় আর উঠতে পারেননি। ফেরিচেতে একদিন বিশ্রাম নিলাম।

ফেরিচে থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু হল ১২মে। চারদিকে তুষারশৃঙ্গ। মাঝে পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগোতে লাগালাম। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। তবু ঠাণ্ডা লাগছিল। মাঝে মাঝে হাওয়া আসছিল। পথ চলছিলাম সাবধানে। সরু পথের পাশে মাঝে মাঝে গভীর খাদ। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে চড়াই শুরু হল। এমনি করে দুর্গম পথে ঘন্টা খানেক চলবার পর আমরা পৌঁছলাম টুকলায়। পুনরায় চা খেয়ে পথ চলতে থাকি। চড়াই পথ চলতে ক্লান্তি আসে। সেই সঙ্গে পাহাড়ের উচ্চতার জন্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কয়েকজনের। তবু পথ চলার বিরাম নেই। শেষপর্যন্ত পৌঁছাই লবুচেতে (১৬,২০০ ফুট)।

বিকেলে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। সন্ধের পর তুষারপাত হতে থাকে। ঠাণ্ডা বাড়ে। রাতে ঘরের মধ্যেও বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। ঘুম হয় না ঠিকমত। পরদিন আকাশের অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। পথ চলা যথারীতি শুরু হয়। মিনিট কয়েক-এর মধ্যে প্রবেশ করি বরফের হিমবাহে। খুম্বু হিমবাহ, এগোতে থাকি খুব সাবধানে। বাঁদিকে ধূসর পাহাড়ের উপর লবুচে পর্বতমালা। ডানে প্রথম লোৎসে, তারপর এভারেস্ট। হিমবাহ ক্রমশ উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। পথ চলার ক্লান্তি থেকে শরীরের অবসন্নতা যেন সকলকে পেয়ে বসে। আস্তে আস্তে পৌঁছে যাই গোরকশেপে (১৬,৯০০ ফুট) বরফের হিমবাহের উপর গোরকশেপ। এখানে রয়েছে দুটো শেরপা হাট। তার একটিতে থাকার ব্যবস্থা হয়।

অচিরেই আকাশের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলে, শুরু হয় তুষারপাত। অদূরে পর্বত শিখর কালাপাথর (১৮,২০০ ফুট)। দুপুরের খানিক পরে দেখা পাই এভারেস্টের বরপুত্র সুনদারে শেরপার। সুনদারে এবার নিয়ে পাঁচবার এভারেস্ট জয় করে বিশ্বে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। রাতে পরিচয় হয় কানাডার এক ভদ্রলোক আর্মণ্ড বেনিসভির সাথে।

পরদিন ১৪ মে। ভোর থেকে আকাশ মেঘলা। আমরা যাত্রা করি সকাল ছ'টায়। খানিকটা এগোবার পর ধূসর খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে এগোতে থাকি। সাবধানে। আবহাওয়া খানিকটা পরিষ্কার হতে থাকে। বেশ খানিকটা এগোতে শুরু হয় পথ চলার ক্লান্তি। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। তবু এগিয়ে চলতে থাকি। যেন পথের তাগিদে পথ চলা। এমনি করে শেষলগ্নে বেশ কয়েকবার ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। অবশেষে পৌঁছলাম কালাপাথর শীর্ষে। ঘড়িতে সকাল প্রায় আটটা। আমরা সকলে, মোট দশজন সদস্য, শেরপা ছাম্বা এবং কানাডিয়ান বেনিসভি। কিন্তু যার জন্যে আসা সেই পর্বত সম্রাট এভারেস্টের চুড়ো দেখতে পেলাম না। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। ঘন্টা খানেক পরে নেমে এলাম গোরকশেপে।

কফি পানের মাধ্যমে কালাপাথর শীর্ষে আরোহনের আনন্দ উপভোগ করি। তারপর আস্তে আস্তে প্রস্তুত হই এভারেস্ট বেসক্যাম্পে যাবার জন্যে। সকাল ১১টা ১০ মিনিট। মেঘলা আবহাওয়ায় নতুন করে পথ চলা শুরু হয়। এবার ছ'জন। বেশ খানিকক্ষণ পরে একটি ছোট পাহাড়ের টিলা অতিক্রম করতেই যেন নতুন জগতে প্রবেশ করি। শুরু হয় বরফের রাজ্য। বরফ আর তুষার জমে আছে চারিদিকে, ভিন্ন অবয়বে, ভিন্ন ভঙ্গিমায়, বরফের লেক, বরফের সিরাক, বরফের পিলরা, বরফ আর তুষার ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে।

ক্রমশ বরফের ঘনত্ব বাড়ে। বাড়ে শুভ্রতার প্রকোপ। সঙ্গে বাড়ে অজানা নির্জন পাহাড়ী পথের দুর্গমতা। একদিকে আনন্দ হয় হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে, অন্যদিকে অনুভব করি পথ চলার কষ্ট। তবু এগোতে থাকি। যার জন্যে ছুটে আসা সেই রাজকীয় সৌন্দর্যের আশায়। পেছন থেকে বন্ধুদের গলা ভেসে আসে, আর কতদূর?

কতদূর নিজেও জানি না। তবু যেতে হবে যতক্ষণে ওখানে পৌঁছে না যাই।

অবশেষে দেখা পেলাম সেই স্বপ্ন সৌধের। দুপুর একটা পাঁচ। সামনে যেন বরফের নীল প্রাচীর। দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকৃতি নিয়ে। এভারেস্ট বেসক্যাম্প (১৮,০০০ ফুট)। দুচোখ মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে যাই। হিমালয়ের এ কোন উদ্যানে এসে পৌঁছেছি। বিশ্বাস করতে পারছি না, এ স্বপ্ন না সত্যি।····আস্তে আস্তে মাথা নত করি।

রসিক পাল
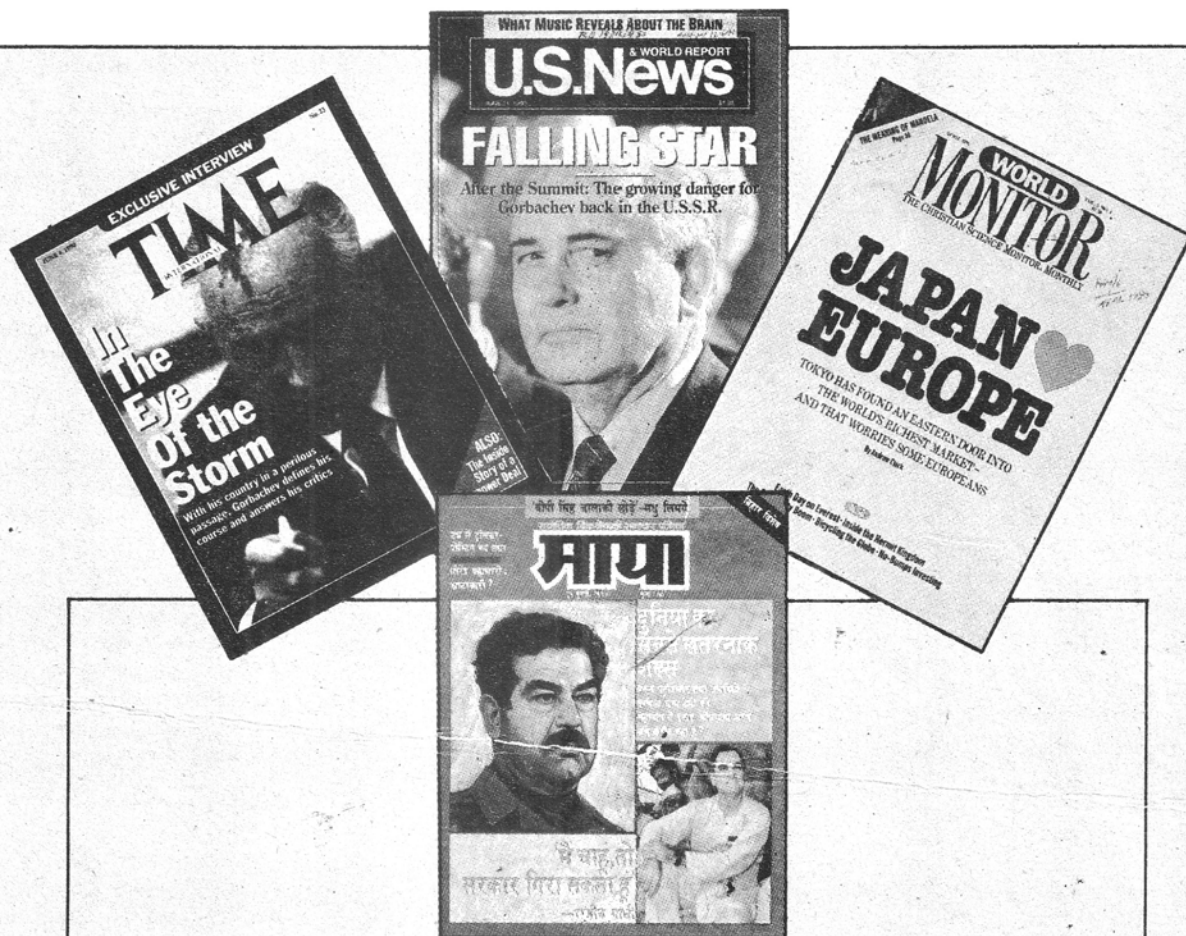
MAYA, the No. 1 Hindi Magazine Introduces
now onwards
A Glossy International Section
Through special arrangement with
TIME, U.S. NEWS & WORLD REPORT AND WORLD MONITOR
for exclusive coverage in Indian subcontinent,
backed up by photographic coverages
of **SYGMA, SIPA, BLACK STAR, GAMMA**
and other reputed international photographic agencies.

MAYA again takes the lead
among the news magazines in India.

NOW ON SALE

MAYA, a leader in national news-coverage,
now leads in international coverage

বঙ্গারা

প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম

অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলার যে গ্রামটির দিকে এখন প্রতিটি ভারতবাসীর চোখ তার নাম বঙ্গারা। কেমন আছেন প্রধানমন্ত্রীর গ্রামের লোকজনেরা? খোদ প্রধানমন্ত্রীরই গ্রামের উপর নকশালদের প্রভাব–প্রতিপত্তি এত বেশি কেন? তারই তথ্যানুসন্ধান।
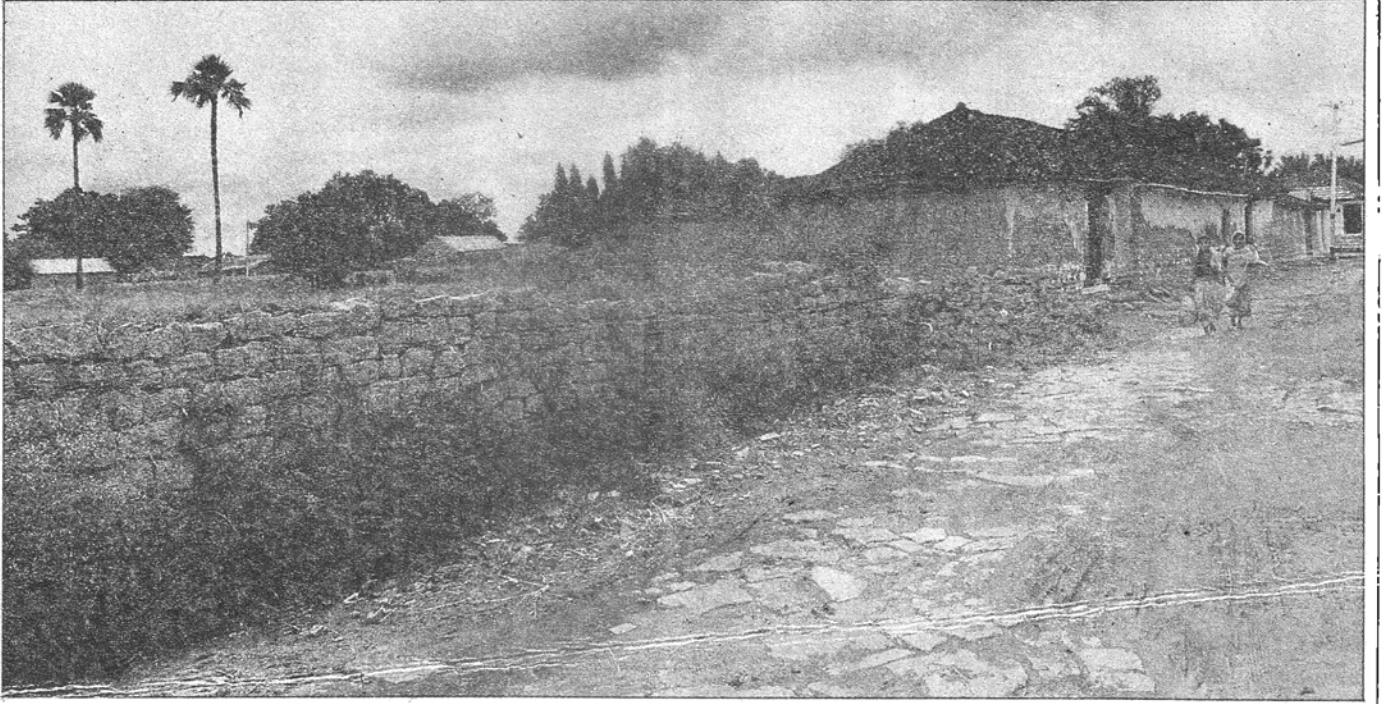
অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম বঙ্গারা। ইদানিং ভীষণভাবে নকশাল আন্দোলনের শিকার। সম্প্রতি নকশালরা প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের লোকেদের ক্ষেতে কাজকর্মও চালাতে দিচ্ছে না।

দীর্ঘদিন ধরে একটি সমৃদ্ধিময় গ্রাম হিসেবে বঙ্গারার পরিচয়। অন্ধ্রপ্রদেশের বেশিরভাগ গ্রাম যেখানে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সেখানে বঙ্গারা অনেকবেশি গতিশীল। ৬০০০ একর আবাদী জমি বিশিষ্ট বঙ্গারা একটি উন্নত গ্রাম। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, হাসপাতাল সবরকমের সুযোগ সুবিধা এখানে আছে। এমন কি পশু চিকিৎসার জন্য এখানে একটি পশু–হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি তিরুমালা তিরুপতি মন্দিরে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি কল্যাণ মণ্ডপ তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই বঙ্গারা যে এখন একটি ভি আই পি গ্রাম তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? আর হবে নাই বা কেন? পনের বছর আগে এই গ্রামের ছেলেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল। দেশের এক চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন যে মানুষটি সেই পি ভি নরসিমা রাওয়ের জন্ম এই গ্রামেই। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গারা গ্রামে জন্মেছেন বলে গ্রামবাসীরা যে দারুণ গর্বিত তা কিন্তু নয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলায় পিপলস্ ওয়ার গ্রুপের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। বঙ্গারা গ্রামটি করিমনগর জেলাতেই। কাজেই এখানেও নকশালদের আধিপত্য কিছু কম নয়। প্রথম প্রথম নকশালদের এই ঝুট ঝামেলা খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই নকশালদের গতিবিধি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন। বঙ্গারা গ্রামে পুলিশ ও নকশালদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ প্রায় লেগেই আছে। নকশালদের ভয়ে গ্রামবাসীরা ক্ষেতে ফসল বুনতে যেতে পারে না, পারে না সময়ের ফসল সময়ে তুলতে। ফলে নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেতের ফসল। নকশাল হাঙ্গামায় বঙ্গারা এখন হতশ্রী প্রায়। নকশাল আন্দোলন গ্রামের সমৃদ্ধিকে একেবারে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের গ্রাম হলে কি হবে গত দশ বছরে কয়েক মুহূর্তের জন্যও তিনি গ্রামে আসেন নি। নরসিমা রাও–এর ছোট ভাই পি ভি মনোহর রাও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে ক্ষেত–খামারের কাজেই লেগে আছেন। কিন্তু বঙ্গারা গ্রামের অবস্থা ইদানিং এমনই হয়ে উঠেছে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরিবার পরিজনকেও নাজেহাল হতে হচ্ছে। প্রায় দশ বছর হল এই সমস্যা শুরু হয়েছে। এখন অবস্থা এমনই সংকটে যে গত ২১ জুন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বঙ্গারা গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর দোতলা বাড়িটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রীর পৈতৃক বাসভূমি সুরক্ষিত থাকবে এটাই নিয়ম। সেদিক থেকে ওই বাড়ির চারপাশে পুলিশ বসানো কিছু অযৌক্তিক হয়নি। পিপলস্ ওয়ার গ্রুপের ধারণা আজ নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়াতেই বঙ্গারাতে এত পুলিশের ছড়াছড়ি। তারা হুঁশিয়ারি জারি করেছে যে অবিলম্বে সরকার যেন পুলিশ তুলে নেয়। অবশ্য এতে কোন কাজের কাজ হয়নি। পুলিশ উঠিয়ে নিতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার

বঙ্গারায় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের বাড়ি

কোন ব্যবস্থাই নেন নি। এদিকে নকশালরা গ্রামবাসীদের হুমকি দিল—যে, এই গ্রামের কোন একজন বাসিন্দাও যদি নরসিমা রাওদের পরিবারের কিংবা ওঁদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন কোন ব্যক্তির ক্ষেতে কাজ করে তাহলে তার পরিণতি হবে শোচনীয়। কঠোর শাস্তি পেতে হবে তাকে। নকশালদের অভিযোগ যে, নরসিমা বেনামে প্রায় ১২০০ একর জমির মালিক হয়েছেন। যতদিন না পর্যন্ত তিনি এই জমি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত রাও পরিবারের ক্ষেতে কোন লোক কাজ করবে না। নকশালদের এই সাবধানবাণীর সঙ্গে এটাও রটেছে যে নকশালরা রাওদের দোতলা বাড়িটি উড়িয়ে দেওয়ারও একটি পরিকল্পনা করেছে। অবশ্য নকশালরা তাদের কথা খণ্ডন করে বলেছে—তারা নরসিমার বাড়ি মোটেই উড়িয়ে দিতে চায় না। বরঞ্চ তারা হরিজন বাচ্চাদের জন্য সেখানে একটি ছাত্রাবাস খুলতে চায়। কারণ গ্রামে যে ছাত্রাবাসটি আছে তার এমনই বেহাল অবস্থা হয়েছে যে যে কোন দিন সেটি ভেঙে পড়তে পারে। যাই হোক, এ হেন দুরবস্থা গ্রামের লোক নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল। এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার করিমনগর গ্রামের পুলিশকে বঙ্গারা গ্রামের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে বলেছে। ফলে, বঙ্গারা গ্রামের পুলিশ এখন খুবই সক্রিয়। পুলিশের লোকেরা গ্রামের মজুরদের আশ্বাস দিয়েছে যে গ্রামের সাধারণ মানুষ যেন নকশালদের ভয় না করে। রাও ও তার আত্মীয়—স্বজনের ক্ষেতের কাজ তারা যেন করে। পুলিশের কথায় কিছু লোক ক্ষেতের কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু এর ফল তারা খুব কম দিনের মধ্যেই হাতে হাতে পেয়ে যায়। ২০ জুলাই পিপ্‌লস ওয়ার গ্রুপের একদল সশস্ত্র লোক গ্রামবাসীদের রীতিমত ভয় দেখায়। ওই গ্রামেরই তিরুপতি রেড্ডিকে পি ডব্লু ডি—র লোকেরা বেধড়ক পেটায়। তিরুপতির অপরাধ—দশ বছর ধরে পি ভি মনোহর রাওয়ের জমিতে সে কাজ করছে। নকশালদের প্রহারে তিরুপতির ডান পা ভেঙে গেছে। সারা শরীরে চোট। পুলিশ এ ব্যাপারে সাতজনকে আটক করেছে। ধৃত সাতজনের মধ্যে পাঁচজনই বঙ্গারার ছেলে। বাকি দু'জন পাশের গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের লোকেরা এই গ্রেপ্তারের খবরে এতটুকু খুশি হয় নি। বালা সংপথের বাবা রায় মল্লু কথায় কথায় বললেন—তাঁর ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল; পুলিশ কিন্তু তাঁর এই নির্দোষ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। রাজাম্মার ছেলেরও ওই একই অবস্থা। বারংগল—এর এম.জি.এম হাসপাতালে চিকিৎসা করার সময়ে তিরুপতি বারবার জানিয়েছে তার এই দুর্ঘটনার সঙ্গে বঙ্গারার কোন লোক জড়িয়ে নেই। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র রাজেশ্বর রাও স্বয়ং গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জানিয়ে দিয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত নকশালদের কথামত জমি সংক্রান্ত বিতর্ক ঠিকঠাক মিটছে না ততদিন যেন তারা ক্ষেতের কাজ না করে। এই সমস্ত কারণে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়—স্বজনদের নিরাপত্তা জরুরি হয়ে পড়েছে। বঙ্গারা থেকে কিছুটা দূরেই গুণ্‌গিলা গ্রাম। এখানেই প্রধানমন্ত্রীর জামাই বেঙ্কট কিষাণ রাও থাকেন। তাই এই গ্রামেও এখন পুলিশে পুলিশে দাপাদাপি। বঙ্গারাতে প্রতিদিন পুলিশের উপস্থিতি এখন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে কেউ না থাকলেও এখানে সব সময়ের জন্য পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। আলোকপাতের এই টিম বঙ্গারা গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর পৈতৃক নিবাসে এসে পৌঁছলে একজন পুলিশ মারফৎ সেই খবর বাড়ির ভেতরে না পৌঁছনো পর্যন্ত পুলিশ কোনরকম ছবি প্রতিবেদককে তুলতে দেয়নি। এমন কি বাড়ির সামনে জনতার জমায়েতের ছবিও পুলিশ তুলতে দেয়নি। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বিশেষ পুলিশদল পাঠানো হয় বঙ্গারায়। প্রধানমন্ত্রীর এক আত্মীয় এই প্রতিবেদককে জানায় যে, ৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী রাজকীয় মর্যাদায় যখন হায়দ্রাবাদে আসেন তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী সমেত বিশিষ্ট পুলিশ অফিসারদের আদেশ করেন যে, তাঁরা যেন অযথা বঙ্গারা প্রসঙ্গ না তোলেন এবং অহেতুকভাবে পুলিশের সংখ্যা যেন সেখানে না বাড়ান। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এ ব্যাপারে এতটুকু শৈথিল্য দেখান নি। হুজুরাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বঙ্গারা গ্রামটি পড়ে। এই বিধানসভার নির্দল সদস্য কে.এস রেড্ডির মতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েনের ফলে গ্রামের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ চলে গেলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। করিমনগরে পুলিশের অধিকর্তা রথন রেড্ডি বললেন—বঙ্গারার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা

বলতে ইচ্ছুক। বঙ্গারার দুরবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রীর বাল্যবন্ধু গংতলা ভেঙ্কট রাজন এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন–স্বয়ং নরসিমা হস্তক্ষেপ করলেও বঙ্গারা এ হেন অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে না। তাই তিনি দিল্লি যেতে চান। সেখানে বন্ধুকে নিজে খোলাখুলিভাবে সবকিছু জানাতে পারবেন। কিন্তু পয়সা কোথায়? বেঙ্কট রাজন যে বড় গরিব। দিল্লি যাবেন কিভাবে? কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন– আমরা দু'জনেই একসঙ্গে পড়তাম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমি পড়া ছেড়ে দিলেও আমাদের বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা এতটুকু কমেনি। প্রায় দশ বছর হল নরসিমা রাও গ্রাম ছেড়েছে। সেই ১৯৮৫ সালে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। হনমকোণ্ডা সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য সে এসেছিল। অবশ্য ওই নির্বাচনে সে জেতে নি। করিমনগর কিংবা বারংগলে কোন না কোন কাজে এলে সমস্ত কাজ ফেলে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু দিল্লি যাই কি করে? এদিকে বঙ্গারার অবস্থা অশান্ত। এভাবে চলতে থাকলে যে ভাবেই হোক দিল্লি গিয়ে বন্ধুকে বলব তোমার গ্রামের কি অবস্থা হয়েছে একবার দেখবে চল। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গারার অবস্থা পরিবর্তনের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই কারণ করিমনগর জেলায় পিপলস্ ওয়ার গ্রুপের গতিবিধি ইদানিং আরও বেড়ে গেছে। করিমনগর জেলার এক বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার এই প্রতিবেদককে জানালেন নকশাল আন্দোলনের ফলে এই জেলা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গারা গ্রামের কথা আলাদা; কারণ বঙ্গারা প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম বলে কথা। করিমনগর পুলিশের হরিরাম দাস বললেন–গ্রামে কে নকশাল আর কে নকশাল নয়, তা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। স্থানীয় লোকেদের মতে পিপলস ওয়ার গ্রুপের মূল তিনটি ঘাঁটি আছে যার মধ্যে দু'টি করিমনগরে; অন্যটি বারংগল জেলার হুজুরাবাদে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথানুযায়ী–কোহর্জুজা ওরফে ভূপতি, অনুপরম কোমুরয়্যা ওরফে সুধাকররারা হুজুরাবাদের নকশাল। বারংগল জেলার কদারি রামুল বঙ্গারাও এর আশেপাশে নকশালী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গারার মজুর বেমুলা চিন্না বললেন– আমি জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতাম বলে নকশালরা আমাকে মেরেছিল। এদিকে জমিদারের ক্ষেতে কাজ না করলে আবার পুলিশ মারবে। গত কয়েক বছর ধরে বেমুলা চিন্না প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেতে কাজ করছে। বঙ্গারার এক বৃদ্ধ চাষী আগা রেড্ডি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানালেন– এখানকার চাষীদের নানা সমস্যা আছে। ক্ষেতে জলসেচের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু হাল আমলে যে সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে তা হল নকশাল সমস্যা; নকশাল আক্রমণের চিন্তা মানুষকে অন্য সব চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাতে নকশালরা এসে গ্রামবাসীদের এক একটি ক্ষেতে তাদের ঝাণ্ডা পোঁতার জন্য শাসিয়েছে

বি.রমন্যা

গংতলা ভেঙ্কট রাজন

ডঃ পুষ্পা

সেচের সমস্যা : জনৈক কৃষক

আবার দিনের বেলায় পুলিশ এসে ওই সমস্ত ঝাণ্ডা উঠিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে। ভয়ে গ্রামবাসী পুলিশের আজ্ঞামত কাজ করে। রাও পরিবারের জমিতে গ্রামের হাসপাতালে কাজ করছেন ডঃ পাণ্ডুরঙ্গ ও তার স্ত্রী ডঃ পুষ্পা। গ্রামে নকশাল আতঙ্ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন–নকশাল আন্দোলনে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেকেই রাত বিরেতে চিকিৎসার জন্য এখানে এসেছেন। ডাক্তার দেখিয়ে আবার চুপচাপ চলেও গেছেন। কিন্তু পুলিশ এদেরকে পছন্দ করে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রধানমন্ত্রীর কিছু আত্মীয় স্বজন আলোকপাতের এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে এসে জানালেন–দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গারা গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের জমিজমা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তাই নকশালরা এখন চাইছে না যে ওই জমিতে পুনরায় রাও পরিবার তাদের নিয়ন্ত্রণ জারি করুন। যাই হোক পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ শেষ পর্যন্ত রাও পরিবারের বিরুদ্ধে ভূমি–সংস্কার উঠিয়ে নিয়েছিল। তাদের মতে, বেনামীতে প্রায় ১২০০ একর জমি আছে রাও পরিবারের। কিন্তু প্রমাণ করার মত কোনরকম প্রমাণপত্র নকশালদের কাছে নেই। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ছোটভাই পি.ভি. মনোহর রাও নকশালদের পক্ষে জমি–সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের মদত দিয়েছে। মনোহর গ্রাম ছাড়তে চায় না। তার বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর ভাই হয়ে সে কি অপরাধ করেছে? প্রধানমন্ত্রীর বড় ছেলে পি.ভি. বঙ্গারাও এখন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি আলোকপাতকে জানালেন, 'আমি এ সম্পর্কে কিছু জানাব না।' রাও পরিবারের একান্ত–হিতৈষী বি.রমন্যা এই প্রতিবেদককে জানালেন–নরসিমা রাও পরিবারে মোট জমির পরিমাণ–১২৬.৬৮ একর। এর মধ্যে ১৬.২২ একর স্বয়ং নরসিমা রাও–এর নামে; ৩৩ একর বড় ছেলে পি.ভি. বঙ্গারাও, ৪৩.৩৭ একর রাও পরিবারের ছোট ছেলের নামে ও ৩৪.০৯ জমি, তৃতীয় পুত্র পি.ভি. রাজেশ্বর রাওয়ের নামে।

১৯৫৭ সালের আগে রাও পরিবারের মোট জমি ছিল ১১৬৯.২২ একর। ভূমি–সংস্কার আইনের দরুন ৯৪১.২২ একর জমি সরকারকে দিয়ে দিতে হয়। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জনার্দন রেড্ডি সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, নরসিমা রাও অনেক আগে ৯৪১ একর জমি সরকারকে দিয়েছেন। তার মধ্যে ৫২ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু পিপলস ওয়ার গ্রুপের বক্তব্য–রাও মুশকিলে পড়ে মাত্র ১৫ একর জমি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাওয়ের হিতাকাঙ্ক্ষীরা জানালেন ১৯৭৪ সালে নরসিমা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। ওই সময়ে তিনি স্বয়ং ভূমি–সংস্কারকে মদত দিয়েছিলেন। কাজেই তিনি নিজে কেন তাতে গুরুত্ব দেবেন না? কিন্তু নরসিমা রাওয়ের কাছের সকলেই বলেন যে এখনও রাওয়ের এক্তিয়ারে প্রচুর জমিজমা থাকলেও সম্পত্তির সঙ্গে তিনি কখনোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন নি। আচার্য বিনোবা ভাবের ভূ–দান আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে তিনি যে ৪৪ একর জমি দান করেছিলেন সেই জমির ৪.৩২ একরের ওপর আজ গ্রামের হরিজন কলোনী দাঁড়িয়ে আছে। বাকি জমির ওপরে একটি হাসপাতাল করা হয়েছে। কিছুদিন পরে আবার হরিজনদের জন্য ৪.৩৩ একর জমি রাও পরিবার দান করে। যাইহোক, ওই জমির ওপরে এখন কোন নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। রাও পরিবারের প্রায় ৪৫ একর জমি গ্রামবাসী নিজেদের এক্তিয়ারে রেখে দিয়েছে! নরসিমা রাও এই যে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন আর সেজন্য তাঁর পরিবার পরিজনেরা জমিজমা সম্পত্তির ব্যাপারে আরও সতর্ক হয়ে উঠলেন তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বঙ্গারা গ্রামের উপরে একটু বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছেন। উত্তপ্ত বঙ্গারা যে কবে আবার শান্ত হবে তা কেউ বলতে পারে না। এক গ্রামবাসী তো তিতিবিরক্ত হয়ে বলল–ভি আই পি এদিকে দিল্লিতে আছেন আর যত দুর্ভোগ আমাদের পোহাতে হচ্ছে।

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি : সঞ্জীব ব্যানার্জি

আচার্য পরিবার : গৌড়বঙ্গের শেষ রাজবংশ

রাজা শশিকান্ত আচার্য

রাজা শশিকান্তের স্ত্রী লীলাদেবী

গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজার নস্টালজিয়া এখনও কি নবীন প্রজন্মের দিনতামামিতে প্রোজ্জ্বল ? যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ যাঁদের দানে তৈরি তাঁদের উত্তরপুরুষরা কে কোথায় কি করছেন ? দুই বাংলার সর্বজনমান্য রাজ পরিবারের সেকাল—একালের কথাকাহিনী।

অবিকৃত না থাকার নাম ইতিহাস। আর তার ভাঙা, খণ্ড বিখণ্ড, ছিটকে পড়া স্মৃতিগুলি আজও সেই স্মরণাতীত যুগের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই তো কালের গতি। তখন ছিল আলো হাসির দেদার ফোয়ারা। আর এখন সেই প্রাণ ফোয়ারার নাচ মহলে বিলুপ্ত ছায়া নাচ। মুকুট নেই, পাইক বরকন্দাজ নেই, গোলাপ বাগিচা নেই; মধুময় চন্দ্রস্নানের কলতানও হারিয়ে গেছে অর্ধ শতাব্দীর আগে। এখন শুধু বিয়োগান্ত দৃশ্যের দিন। তবু সেই গৌড়বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজার আচার্য পরিবার এখনও তার উত্তরপুরুষদের মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে কলকাতায়।

এই রাজ ঘরানায় পরবর্তী যুগে বাংলার লোকমানসে বোধহয় শেষ কৌতূহল ছিলেন পশ্চিমবাংলার প্রথম বামপন্থী অ্যাডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। একদিকে মেজাজী, গল্প রসিক—অন্যদিকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের শরীক, একদিকে আইন আদালত জমিদারী—অন্যদিকে নিতান্ত বালখিল্যতা।—অদ্ভুত চারিত্রিক সংমিশ্রন ছিল তাঁর।

এমনি এক মজার গল্প শুনিয়েছিলেন স্নেহাংশুকান্তের দিদি কোহিনুর দেবী, পুঁঠিয়ার রাজরানী, বছর ৮২ বয়স। তথাপি রয়েল ব্লাড, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। সেবার স্নেহাংশুকান্ত সবেই বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরেছেন কলকাতায়। কোহিনুরদেবীরা তখন থাকতেন মহারানী হেমন্ত কুমারী স্ট্রিটের বাড়িতে। ছেলে নিরঞ্জনের বয়স তখন অল্প। দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসে বাড়ির প্রধান ফটকে পা দিতেই ভাগ্নে নিরঞ্জনের হাতে

ছররা বন্দুকটি দেখতে পেলেন স্নেহাংশুকান্ত। ব্যস, ওমনি মেতে উঠলেন তাতে। প্রথম শিকার একটি টিকটিকি। তারপর আর তাঁকে রোখার সাধ্যি কার! কথাবার্তা দূরের কথা, ঘুম নেই খাওয়া নেই—সারা রাত সেই ছররা বন্দুক নিয়ে প্রকাণ্ড অট্টালিকার দেওয়ালে দেওয়ালে টিকটিকি শিকার করে বেড়ালেন তিনি।

এখন স্নেহাংশুকান্তের পরবর্তী প্রজন্মের যুগ। চল্লিশ প্রজন্মের কাছাকাছি এই পরিবারের সিংহাসনহীন সহস্রাংশু–শত্রুঘ্ন–শুভ্রাংশু–সৌরাংশুরা ছড়িয়ে পড়েছেন জীবিকার সন্ধানে। তথাপি একদিন, হয়তো কলকাতার জন্মলগ্নেরও আগে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা পা দিয়েছিলেন এখানে। এই ভাবে সুলতান আমলে বাংলার একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশের উত্তর প্রজন্ম তাঁদের শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গৌড় থেকে ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ থেকে কলকাতা।

তখন ছিল রাজারাজড়ার দিন। রাজকীয় ঠাটঠমক। সেই খেয়ালেই হয়তো একদিন আচার্যদের অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বউবাজার স্ট্রিটে। বাগানবাড়িতে বসত জলসার আসর। সাহেব সুবোরা আসতেন। তারকাশিল্পীদের মজলিসে ভরে উঠত সাবেক কলকাতার দিনরাত্রি। পরে সেই বাগানবাড়িতে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্নেহাংশুকান্তের দাদু মহারাজ সূর্যকান্ত। পরে সেটাই আজকের যাদবপুর ইউনিভারসিটি।

সেই সব রঙিন দিনগুলির প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে আছে আচার্যদের দেয়ালে, অ্যালবামে। যুগের হাওয়ায় সেসব ধূলিধূসর হয়ে উঠলেও তার বিবরণ সহসা টেনে নেয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। গৌড়ের মসনদে তখন বল্লাল সেন। সময় ১১৫৮–১১৭৯। তখনকার বাঙলায় কনৌজ থেকে আগত ব্রাহ্মণ স্বর্ণদেব মিশ্রকে বল্লাল সেন ভাদুড়ীয়া গ্রামের জমিদারী দিলেন। মিশ্ররা হলেন ভাদুড়ী। বাঙালার মানচিত্রে ওই ভাদুড়ীয়া গ্রামের অবস্থান তখন—পশ্চিমে মহানন্দা ও পূনর্ভবা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া আর উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াকাটা। অবশ্য এই স্বর্ণদেবের পূর্বসূরী বীতরাগ মিশ্র কনৌজ থেকে বাঙলায় এসেছিলেন প্রথম। একাদশ শতাব্দীতে। আদিশূর সময়। স্বর্ণদেব এই বীতরাগেরই নবম প্রজন্ম।

একদিকে জমিদারী, অন্যদিকে বল্লাল সেনের রাজসভায় প্রভাবশালী মন্ত্রী হিসেবে স্বর্ণদেব বাঙলায় নতুন শেকড় প্রবেশ করালেন। সেই শেকড় বাঙলায় মধ্যযুগে ক্ষমতার গভীরে বাড়তে বাড়তে তাঁর নাতি গণেশের সময় মহীরূহ—র আকার নিল। আর ছিন্নমূল মিশ্ররা মাথা তুলে দাঁড়াল বাঙলার রাজশক্তিতে। ১৪১৫ সালে। তখন বাঙলায় চলছে হত্যার রাজনীতি। ক্ষমতা দখলে পারঙ্গম মোঘল সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে গণেশ গিয়াসুদ্দীনের পরবর্তী সুলতানের বিরুদ্ধে সুসংহত সামরিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামলেন। সুলতানকে হটিয়ে জয় করলেন বাঙলার মসনদ।

কিন্তু মুসলমান দরবেশদের বিরাগের পাত্র হয়ে সুলতান আমলে রাজ্য চালানো ছিল অসম্ভব। গণেশও পারলেন না। ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত গণেশ সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। আর মুসলিম দরবেশদের চাপে বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে যদুনারায়ণ ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলালউদ্দীন নামে রাজ সিংহাসনে বসলেন। শুরু হল পিতা পুত্রের রাজনৈতিক বিবাদ। ইব্রাহিম শার্কি মারা যাওয়ার পর জালালউদ্দিনকে সরিয়ে পুনরায় মসনদে ফিরে এলেন গণেশ। তারপর, গণেশের ছোট ছেলে মহেন্দ্র, মহেন্দ্রর পর জালালউদ্দীনের ছেলে শামসউদ্দীন,—১৪৩৬ সাল পর্যন্ত মোট ২১ বছর বাঙলাকে শাসন করলেন স্বর্ণদেবের বংশধররা। কালক্রমে তাঁদের উত্তর প্রজন্মই আজকের আচার্য পরিবার।

যদুনারায়ণের ছিল হিন্দু ও মুসলিম—দুই স্ত্রী। হিন্দুপক্ষের ১৮তম প্রজন্মের উজ্জ্বল বংশধর উদয়ন হলেন সেদিনের ভাদুড়ী আর আজকের আচার্য-

আচার্য রাজবংশের তিন প্রজন্ম : রাজা শশিকান্তর সঙ্গে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, জামাই, নাতি নাতনিরা
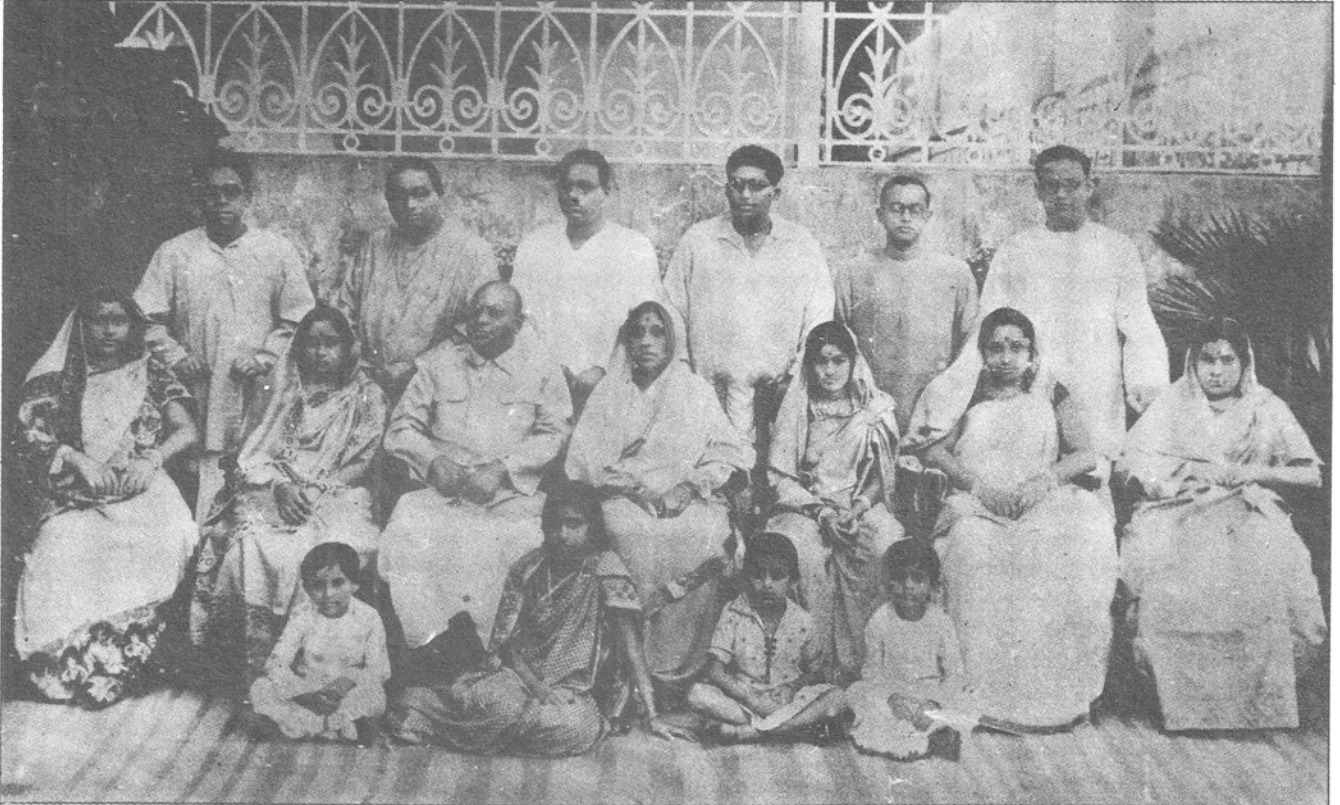
দের একটি মাইল স্টোন। পঞ্চদশ–ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর ভারত ও বাঙলায় কোন সার্বভৌম রাজ্য ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট জমিদার ও সামন্তরাজারা কোন রকমে শাসন করতেন। এই রকম রাজনৈতিক বাতাবরণে তখন ভাদুড়ীয়া জমিদার ভাদুড়ী বংশের প্রভাবও কমে যায়। এই বংশের তৎকালীন ধারক ইতিহাস-খ্যাত উদয়নও রাজনীতির চেয়ে শাস্ত্র পাঠ ও আধ্যাত্মিক জগতে অধিক মনোনিয়োগ করেন। এনসাইক্লোপেডিয়ায় উদয়ন আচার্য ও তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত আলোচনাও আছে। এই দীর্ঘ আলোচনার শেষে, "...দ্য প্রেজেন্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যান এফেক্ট দ্যাট ক্যান নট বি এক্সপ্লেন্ড বাই অ্যাকটিভিটি অব অ্যাটম অ্যালন। আ সুপ্রীম বিং হ্যাড টু কেস দ্য এফেক্ট অ্যান্ড রেগুলেটেড দ্য অ্যাকটিভিটিজ অব দ্য অ্যাটম: হেয়ার অ্যাকর্ডিং টু উদয়ন আচার্য গড একজিস্ট।"

উদয়ন আচার্যর সময়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক দুনিয়ায় এক স্বর্ণযুগের শুরু হল। বৈষ্ণব ভাবরসে নবদ্বীপ তখন উত্তাল। একদিকে চৈতন্যদেব, অন্য দিকে উদয়ন আচার্য ও কৃষ্ণানন্দ আকমবাগিশ। এঁরা দু'জনেই চৈতন্যদেবের শাস্ত্রগুরু ছিলেন বলেও শোনা যায়। তবে আচার্য বংশের সঙ্গে চৈতন্যদেবের পারিবারিক সম্পর্ক না থাকলেও এই বংশের নবীন প্রজন্ম শত্রুঘ্নকান্তর মাতুলালয় পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের কন্যা শ্বেতগঙ্গা ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্যা। পুরীতে এই শ্বেতগঙ্গা–র স্মরণে গঙ্গামাতা মঠ, যেটি সে সময় ছিল সার্বভৌমের বাড়ি, এখনও রয়েছে তাঁর স্মৃতি বহন করে।

উদয়নের ছিল দুই স্ত্রী, আর ছয় পুত্র সন্তান। প্রথম পক্ষের তিন ছেলে–ভূপতী, ভবানীপতি ও পশুপতি। এই তিন ছেলে ও স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দিতে চাইলে উদয়ন তাঁদের তাড়িয়ে দেন। তাই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের হাতে থেকে যায় আচার্যদের পারিবারিক জমিদারী।

বিতাড়িত স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বহু টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তারপর ছেলেরা বড় হয়ে মাতুলালয়েরই জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কলকাতায় আচার্য পরিবারের স্রোতটি উদয়নের এই বিতাড়িত স্ত্রীর মধ্যম পুত্র ভবানীপতির। ভবানীপতির পরবর্তী ২৭তম প্রজন্মের শ্রীকৃষ্ণ আচার্য আচার্য বংশের নব দিগন্তের স্রষ্টা। তাঁর প্রোপিতামহ গোপাল আচার্য ছিলেন রাজশাহি জেলার গোপালপুরের জমিদার। বাবার ছোট ছেলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য পৈত্রিক সম্পত্তি পান নি। বীরভূমের শাহজাদপুর পরগণার দাতুরা দেবগ্রাম তালুকটি পেয়েছিলেন মাতুলালয় সূত্রে। তিনি ছিলেন বাঙলার তৎকালীন নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ–র প্রধানমন্ত্রী। এই মুরশিদ কুলি খাঁ আবার পরবর্তী কালে আচার্য পরিবারের মাতুলালয়ের দিক থেকে আত্মীয়। কারণ তিনি ঔরঙ্গজেবের দেওয়ান, পুঁঠিয়ার রাজা দ্বিতীয় দর্পনরায়ণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। আর এই পুঁঠিয়ার রাজকন্যা রেবাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন স্নেহাংশুকান্তর বড়দা সিতাংশুকান্ত।

সে সময় শেলবর্ষের এক মুসলিম জমিদারের দেওয়ান ছিলেন রাজপুত মান সিংহ পরিবারের রাজা কুমার সিংহ। শেলবর্ষ জমিদারের মৃত্যুর পর কুমার সিংহ জমিদারী হাতানোর চক্রান্তে নেমেছিলেন। জমিদারের বিধবা পত্নি জেবুরউন্নিশা তখন কুমার সিংহর হাত থেকে জমিদারী বাঁচানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের সাহায্য চান। সেই সাহায্যে হাত বাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য যুদ্ধে কুমার সিংহকে হারিয়ে জমিদারী রক্ষা করেন।

জেবুরউন্নিশা তখন অপরূপ সুন্দরী, যুবতী। রূপলাবণ্যে মুগ্ধ অবিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ জেবুরউন্নিশাকে নিয়ে আসেন নিজের অন্দরমহলে। ইতিহাসে তাঁদের বিয়েরও সমর্থন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য মতবিরোধও রয়েছে কিছু। কুমার সিংহ যুদ্ধে পরাজয়ের পর জেবুরউন্নিশাকে খুন করেছিলেন–এমন কথাও শোনা যায়। আবার কেউ
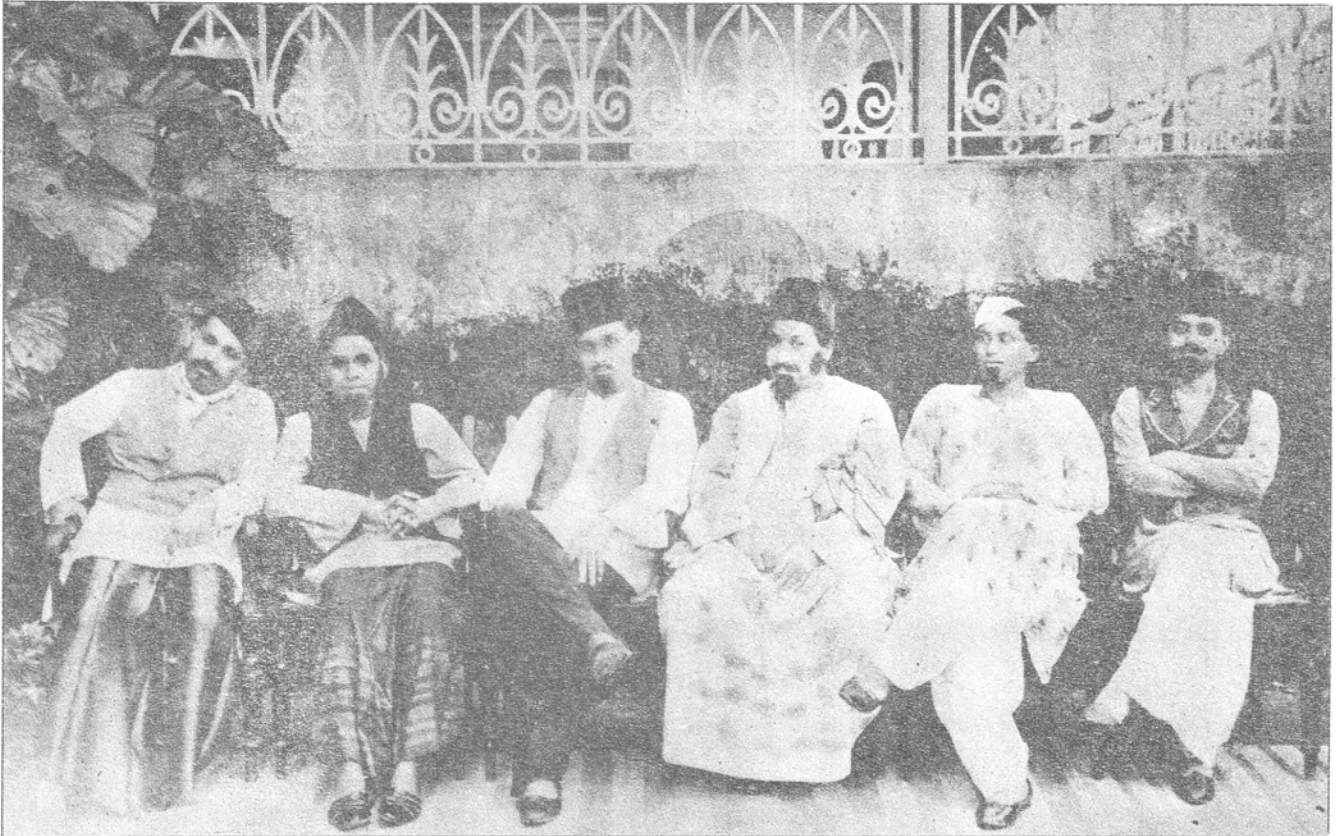
ক্যাসল–এর সামনে মুসলিম বেশে আচার্যরা

বলেন—যুদ্ধ জয়ের পর জেবুরউন্নিশাকে খুন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চক্রব্যূহ ডিঙিয়ে কুমার সিংহর পক্ষে জেবুরউন্নিশাকে খুন করা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের যে মানসিকতা, উদারতার পরিচয় মেলে তাতে তাঁকে খুনি বলে মেনে নেওয়া অসম্ভব প্রায়। বরং অল্প বয়সী, যুবতী, সুন্দরী, বিচক্ষণ জেবুরউন্নিশাকে তাঁর বিয়ে করার যুক্তি অধিক বাস্তবিক। আর তৎকালীন সামাজিক অনুশাসনে হিন্দু-মুসলিম বিবাহও যেমন নিন্দিত ছিল না, তেমনি অন্যায়ের ছিল না বিধবা বিবাহ। বিষয়টি আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে পুরী ও গয়ায় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকা দেখলে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আচার্যর স্ত্রীর সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। হয়তো ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলিম এবং বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করায় এই কুল পঞ্জিকায় নীরব পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

যাই হোক, যুদ্ধ জয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ আচার্য শেলবর্ষ অধিকার করলেন। তা ভাগ বাঁটোয়ারা হল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিন জমিদারের মধ্যে। নাটোরের রঘুনন্দন রায় পেলেন শেলবর্ষ পরগণা। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরি পেলেন কড়ুই পরগণা। আর ঝাঁকড় পরগণা পেলেন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। এই ঝাঁকড়ে ছিল কুমার সিংহের রাজবাড়ি। কুমার সিংহের সেই সময়কার প্রস্তর মূর্তি এখনও রয়েছে বহরমপুরে জীবেন্দ্রকিশোর আচার্যের বাড়িতে।

এদিকে মুরশিদকুলি খাঁ মারা গেলেন। নবাব হলেন তাঁর জামাই সুজাউদ্দীন। অল্পকালের মধ্যে সুজাউদ্দীন মারা গেলে বাঙলার মসনদ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হল কলিঙ্গর রাজা আলিবর্দি খানের সঙ্গে পূর্ণিয়ার নবাব সরফরাজ খানের। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য নিয়েছিলেন আলিবর্দি খানের পক্ষ। ঘেরিয়ার যুদ্ধে জয় হয়েছিল আলিবর্দির। আর যুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের পুরস্কার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য পেয়েছিলেন আলাপ সিংহ পরগণা। ১৭২১-এ। যদিও তা দখল নিতে দীর্ঘ ছয় বছর শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আলিবর্দি খানের জামাতা রেজা খানের বিরুদ্ধে। শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে জিতে শুধু আলাপ সিংহ পরণগা অধিকার করলেন না, রেজা খানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন বার ভূঞ্যা-র এক ভূঞ্যা ইশাখানের ২২টি পরগণার আরও ৪টি—মোমেনশাহি, শেরপুর, নেত্রকোনা ও শেরশাবাদ।

বস্তুত রাজা গণেশ ও উদয়নের পর আচার্য পরিবার শ্রীকৃষ্ণের দৌলতে আবার আলোকিত হয়ে উঠল। যুদ্ধে ইশাখানের ৫টি পরগণা অধিকার করে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য বাঙলার তৎকালীন বারো ভূঞ্যা—শ্রীপুরের চাঁদ রায়—কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়, খিজিরপুরে ইশা খান, ভূষণার মুকুন্দ রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজী, ভুলুয়া-র লক্ষ্মণ মাণিক্য, বিষ্ণুপুরের হাম্বির মালব্য, দিনাজপুরের গণেশ রায়, তাহেরপুরের কংশ নারায়ণ, পুঁঠিয়ার পীতাম্বর

সিতাংশুকান্তর সঙ্গে কোহিনুর দেবী এবং সুধাংশুকান্ত, স্নেহাংশুকান্ত

রায়, সাতইর রামকৃষ্ণ রায়ের সমসারিতে উঠে আসেন। মোঘল বাদশাহর কাছ থেকেও তিনি ১৭২৭-এ পান 'জমিদার' আখ্যা। আলিবর্দি হলেন বাঙলার সুবেদার নবাব নাজিম। আর নবাব দেওয়ান হলেন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। ক্ষমতার এই শিখরে ওঠায় শ্রীকৃষ্ণ কে তারপর দিল্লি—রাজনীতির অংশীদার হতে হল। সে সময় দিল্লিতে পালা বদলের পালা। মোঘলদের দ্রুত অবনয়ন আর মারাঠাদের উত্থান। তাই মোঘল বাদশার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আর সাড়া ফেলতে পারেন নি তারপর। এর বছর কয়েকের মধ্যে তিনি মারাও গেলেন। তাঁর অবর্তমানে বিশাল জমিদারীর হাল ধরলেন চার ছেলে—রামরাম, হররাম, বিষ্ণুরাম, শিবরাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৭৭৯-'৮০ রামরাম তখন সিরাজউদৌল্লার মন্ত্রী। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছে ভারতে। এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলও ছিল তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত —ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গল। স্বাভাবিকভাবেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ঘিরে আবার লাইম লাইটে উঠে এল ময়মনসিংহের আচার্য রাজ পরিবার। বিদ্রোহ দমনের জন্য বিষ্ণুরামের মেজ ছেলে শ্যামকিশোর সামরিক ছাউনি ফেললেন মধুপুরের পাশে বিনোদবাড়ি গ্রামে। এই বিনোদবাড়িরই পরে নাম হয় মুক্তগাছা। আচার্যদের রাজবাড়ি যেখানে। এই নাম বদলের আড়ালে একটি ছোট্ট কাহিনী শুনিয়েছিলেন স্নেহাংশুকান্তের ভাইপো শত্রুঘ্নকান্ত। বিনোদবাড়ি তখন জলাজঙ্গল গ্রাম। সামরিক ছাউনি ফেলার জন্য এসেছেন রাজা শ্যামকিশোর। রাজা এসেছেন তাই সম্মানার্থে গ্রামের মুখিয়া মুক্তারাম কর্মকার একটি কারুকাজ খচিত পিলসুজ উপহার দিলেন তাঁকে। পরে সেই মুক্তারামের 'মুক্তা' আর পিলসুজের আঞ্চলিক প্রতিশব্দ 'গাছা' যোগ হয়ে বিনোদবাড়ির নাম হল মুক্তাগাছা। আর মুক্তাগাছায় আচার্যদের রাজবাড়ি হল সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের সামরিক ছাউনির পরিবর্তিত রূপ।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিষ্ণুরামের ছেলে শ্যামকিশোরের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে সন্ন্যাস বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মজনুর ফকিরের। যুদ্ধের সময় শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকিশোরকে অপহরণ করেছিল বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা। আচার্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ফকিরদের এই ঐতিহাসিক টানাপোড়েনের বিবরণ আছে যামিনী ঘোষের 'সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকির রেডার্স ইন বেঙ্গল'-এ। কার্যত সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ঘিরে আচার্য পরিবার তখন দ্বিধা বিভক্ত। শিবরামের ছেলে রঘুনন্দন ছিলেন আধ্যাত্মিক মনস্ক, উদার ও পণ্ডিত। রাজা নয় রাজ্য বড়। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভূমিরূপী মা'র রক্ষায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে রঘুনন্দনের অপার জনসেবা ঐতিহাসিক উদার ব্যক্তিত্বের সমসারিতে বসিয়ে ছিল তাঁকে। এই রঘুনন্দনের দীক্ষা মন্ত্রের অনুকরণে 'আনন্দ মঠ' এর 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়। আজ থেকে দু'শ দশ বছরের আগে রঘুনন্দন মাতৃভূমী পূজার যে মন্ত্র নিয়েছিলেন সেই মন্ত্রের অনুসরণ করে চলেছেন তার উত্তরসূরীরা। শুধু দেশ পূজা নয়, সাহিত্য সংস্কৃতিতে তাঁর অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশও ঘটেছিল। বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রবর্তক ছিলেন তিনি। হয়তো সেই উদার চিত্ত আর আধ্যাত্মিক মনস্কতার টানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের শিবিরে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'এও ময়মনসিংহের আচার্য রাজবংশের চিত্র উঠে এসেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আনন্দমঠ-এর মহেন্দ্র চরিত্রটির নেপথ্যে রয়েছেন রঘুনন্দন আচার্য। এই রঘুনন্দনের পুত্রবধূ গৌরিকান্তের স্ত্রী বিমলাদেবী ছিলেন রানী ভবানীর বোনের মেয়ে। বিমলাদেবীও ছিলেন ধর্মপ্রাণ মহিলা। মুক্তাগাছায় আনন্দময়ী কালীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। এখনও আচার্যরা তার সেবাইত। অনেকে মনে করেন আনন্দমঠের নামকরণ এই আনন্দময়ী মন্দিরের অনুকরণে। এক সময় ময়মনসিংহের বেগুনবাড়িতে ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে স্নানের মেলা বসত, বাসন্তী পুজোয়। ১৯৪৭ পর্যন্ত তা ছিল পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের বিখ্যাত ধর্মীয় পর্ব। এই মেলাটিরও প্রবক্তা বিমলাদেবী। কালীঘাটের কালীর মুণ্ডমালাও তৈরি করেছিলেন তিনি। আর করেছিলেন অন্নছত্র, বেনারসে। বেনারসে আজও তাঁর নাম তাই বিমলাদেবী অন্নপূর্ণা। আজও তাঁর 'অন্নছত্র' সন্ন্যাসীদের পবিত্র পীঠস্থান।

সাহিত্য সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত চর্চার বিরাট অবদানের পাশাপাশি আচার্য পরিবারের

রাজনীতির বিশাল ভূমিকা বাঙলা ছাড়িয়ে দিল্লি পৌঁছেছিল। আসলে আচার্য পরিবারের শিরা ধমনীতে রাজনৈতিক প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় নি। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য তারই এক স্রোত। রাজা গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ আচার্যর মত প্রতিভাবান রাজনীতিবিদের উত্তরসূরীরা কি তাঁদের বংশগত ঐতিহ্যের স্বাভাবিক ধারাকে উপেক্ষা করতে পারেন! স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাই আচার্য পরিবারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই পরিবারেই গোপালচন্দ্র আচার্য ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

কলকাতায় আচার্যদের মধ্যে প্রথম আসেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র গোবিন্দ আচার্য। তাঁর ছেলে গোপাল আচার্য ছিলেন রাজশাহীর গোপালপুরের জমিদার। গড়িয়ার যুদ্ধে মান সিংহের বিরুদ্ধে গোবিন্দ আচার্য যোগ দিয়েছিলেন বারো ভূঞ্যার শিবিরে। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন মান সিংহ। আর পুরস্কার স্বরূপ রাজা প্রতাপাদিত্য রায় গোবিন্দ আচার্যকে 'ব্রহ্মত্র' দিয়েছিলেন।

আচার্য পরিবারের ৩১তম প্রজন্মের রাজা কাশীকান্ত আচার্য বসবাসের জন্য কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটে, এখন যেটা 'সিসিল বার,' সেই অট্টালিকা সম বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। তখন বাঙলায় ওয়েলেসলি–অকল্যাণ্ড–অ্যালেনবরো–র যুগ। বাড়ির অদূরে লালদীঘি, পাশে বৃক্ষাচ্ছাদিত সেন্ট্রাল এভিনিউ। সবুজ কলকাতার কেন্দ্রে আচার্যদের বিশাল বাড়িটি উঁকি দিত দূর থেকে। কাশীকান্ত ছিলেন অত্যন্ত ভ্রমণবিলাসী। পণ্ডিত। সঙ্গীত রসিকও। গা ভাসিয়েছিলেন বিলাসবহুল জীবনে। জমিদারীতে মন বসত না তাঁর। বেনারসেই কাটত বেশির ভাগ সময়। ওখানে ছিল আচার্যদের বাগানবাড়ি। ছিমছাম। নিও–গথিক প্যাটার্নের। রোজ সন্ধ্যায় বসত সেখানে বাঈজী নাচের আসর। খানাপিনা চলত রাতভোর। আজ যে বেনারসের বাঈজী নাচের এত ভারতজোড়া নাম তার পেছনে কাশীকান্তের অবদান কম নয়। মারা গিয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে। কাশীকান্তের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী তখন বছর দুয়েকের একমাত্র সন্তান সূর্যকান্তকে নিয়ে মুক্তাগাছার রাজবাড়িতে থাকতেন।

বড় হয়ে জমিদারীর হাল ধরলেন সূর্যকান্ত। এই সূর্যকান্তই শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের পর আচার্য পরিবারের সবচেয়ে সফল ব্যক্তি। যাঁর অধিকৃত সম্পত্তি তাঁর উত্তরসূরীরা দেড়শ' বছর ধরে সমানেই ভোগ করে চলেছেন। তৎকালীন বাঙলায় সূর্যকান্তের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে ছিলেন তৎকালীন বাঙলার জাঁদরেল ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন। যিনি স্বয়ং সূর্যকান্তের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যেতেন তাঁর ময়মনসিংহের প্যালেসে। সূর্যকান্তর প্রাসাদে অতিথি লর্ড কার্জনের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা পুলিনবিহারী দাস তাঁর আত্মকথায় লিখেছিলেন।

ময়মনসিংহে কাঠ ও লোহার তৈরি সূর্যকান্তের বিশাল লৌহ কুঠি 'ক্যাসেল'–এ সেদিন লর্ড কার্জন আসবেন। ত্রিশ বিঘার বিশাল চৌহদ্দিতে সাজ সাজ রব। গার্ড অব অনার দিতে সারিবদ্ধ হয়ে আছে পাইক বরকন্দাজরা। মূল তোরণের সামনে লর্ড–এর সম্মানে এগিয়ে গেলেন সূর্যকান্ত। সঙ্গে প্রিন্স বোরিস। রাজকীয় চাল। আদব কায়দায় সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সূর্যকান্তর গার্ড অব অনার নিয়ে লর্ড গালিচা পাতা দীর্ঘ লন ধরে পাশাপাশি এগিয়ে চললেন প্রধান ফটকের দিকে। কথায় কথায় লর্ড কার্জন তুললেন বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গ। সূর্যকান্তের সমর্থন থাকলে তিনি বাঙলাকে ভাগ করতে পারবেন। বকেয়া 'রাজ' উপাধী দেওয়ারও প্রলোভন দিলেন। কিন্তু কার্জনের সেই প্রস্তাব সূর্যকান্ত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ লর্ড কার্জন দেউড়ির মুখ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন।

স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, যৌবনে

দক্ষ শিকারীও ছিলেন সূর্যকান্ত। শোনা যায় সুন্দরবনের শেষ গণ্ডারটি তিনিই শিকার করেছিলেন। এ হেন শিকারী সূর্যকান্তের কথা স্যার স্যামুয়েল বেকারও লিখে গেছেন তাঁর আফ্রিকার ওপর লেখা গ্রন্থে। এমন কি বাঙলার 'শেষ নরবলি'ও তিনি দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর সেই শেষ বলিকাঠে প্রাণ দিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ ডি এম ফিলিপস।

সামাজিক ক্ষেত্রেও সূর্যকান্তের অবদান অনেক। কলকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, এখন যেটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তা সূর্যকান্তেরই তৈরি। এছাড়া কারমাইকেল কলেজ–এখন যেটা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ–এখন ময়মনসিংহের এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এশিয়াটিক সোসাইটি, ময়মনসিংহ ইলেকট্রিক সাপ্লাই, গৌহাটি ইলেকট্রিক সাপ্লাই, লণ্ডনে ইমপিরিয়াল ইন্সটিটিউট, ঢাকা–ময়মনসিংহ রেলওয়ে, ময়মনসিংহ ওয়াটার ওয়ার্কস, দার্জিলিং–এ লুইস জুবিলি স্যানিটোরিয়াম, ময়মনসিংহ–এর সুতীয়া ব্রীজ, কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের অর্ধাংশ প্রায়–এসব সূর্যকান্তের করা। কোথাও একক, কোথাও যৌথভাবে এসবের স্থপতি তিনি। তাঁর ছেলে শশিকান্তের শ্বশুর ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি পরে ইমপেরিয়াল ব্যাংক হয়ে আজকের স্টেট ব্যাংক।

অরবিন্দের সঙ্গে সূর্যকান্তের মধুর সম্পর্ক ছিল। অরবিন্দই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই কাউন্সিলের উদ্বোধনের দিন সূর্যকান্তর সঙ্গে উপস্থিত অরবিন্দ, রাসবিহারী বোস, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের আলোকচিত্র এখনও রয়েছে। সূর্যকান্তের সঙ্গে অনুশীলন সতিমির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আবার তৎকালীন ভাইসরয়রাও সূর্যকান্তের রাজবাড়িতে আসতেন। আসতেন প্রিন্স বোরিস, সামুয়েল বেকার, জাসটিস উডরাফট।

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ছিল সূর্যকান্তের অদ্ভুত আগ্রহ। তাই ময়মনসিংহের মত ভূমিকম্পের এলাকায়ও তিনি ন'লক্ষ টাকার কাঁচের 'ক্রস্ট্যাল প্যালেস' বানিয়ে ছিলেন। যদিও তা উদঘাটনের দিনই ভূমিকম্পে ভূপতিত হয়েছিল। সুকুমার রায়ের বোন পূণ্যলতাদেবী তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'–তে লিখেছেন, "...আমাদের বাড়ির সামনেই মহারাজ সূর্যকান্তের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। আয়নায় মোড়া ছিল তাঁর ঘরের দেয়াল, সোফা–চেয়ার–টেবিলের পায়া, সিঁড়ির রেলিং, সব সুন্দর ফুলকাটা কাঁচের তৈরি ছিল, তাই লোকে সেটাকে বলত 'ক্রস্ট্যাল প্যালেস'। ভূমিকম্পে সেই স্ফটিক প্রাসাদ গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, পাহাড়ের মত পড়ে রয়েছে তার ধ্বংসস্তূপ। পাড়ার ছেলেপিলেদের কাছে সেটা ছিল 'রত্নখনি'। কত সুন্দর রঙীন, ফুলকাটা কাঁচের টুকরো তারা সেই স্তূপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে হীরে মাণিকের মত আদর করে নিয়ে আসত।"

পরে এই ভগ্ন 'ক্রস্ট্যাল প্যালেস'এর কাছেই সূর্যকান্তের ছেলে শশিকান্ত বানিয়েছিলেন সুদৃশ্য প্রাসাদ–'শশিলজ'। প্রাসাদের চারদিকে ঘেরা পাঁচিলের পরিসীমা ছিল মাইল তিনেকেরও বেশি। ডোরিক–গথিক–টুডোর স্থাপত্যের সংমিশ্রণে তৈরি একতলা প্রাসাদের সামনে গাড়ি বারান্দা, তার পর ফোয়ারা। ফোয়ারা ঘিরে বৃত্তাকার পথ। একদিকে গোলাপ বাগিচা। অন্যদিকে সবুজ ঘাসের ওপর হরেক রঙিন ফুলের মেলা। গোলাপ বাগিচার পাশেই ছিল আচার্যদের বিশাল লাইব্রেরি। এখন তা বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার। প্রাসাদের মেঝের পুরোটাই শ্বেতপাথরে মোড়া। দেয়ালে কার্নিসে কাচ আর কাঠের কারুকাজ। পেছনে ছিল প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুরপাড়ে সুদৃশ্য 'ঘাট বাড়ি'। স্নানের পর এখানেই সাজগোজ হত। ঘাটবাড়ির দু দিকে ছিল লতা ঘর। ভূমিকম্পের সময় তা ছিল আচার্যদের আশ্রয়স্থল। আর ছিল নাচ ঘর। চারদিকে কাঁচের দেয়াল।

মোম আর কাঠে তৈরি ঝকঝকে মেঝে তার। সাহেব সুবোরা এখানে আসতেন। নাচতেন।

কখনও আবার প্রাসাদ ছেড়ে আচার্যরা বেরিয়ে পড়তেন নৌকা বিহারে। ব্রহ্মপুত্রের জলে মাসের পর মাস চলত বাইশ দাঁড়ের প্রকাণ্ড বজরা। পুরোটাই রূপোয় মোড়া। স্নেহাংশুকান্তের দিদি কহিনুর-দেবী শুনিয়েছিলেন নৌকাবিহারের দিনগুলির কথা। বজরার মাঝখানে ছিল দুটি শোবার ঘর। একটি ডায়নিং হল। নোঙর করলেই প্রজারা নিয়ে আসত চাল, ডাল, ঝাঁকা ভর্তি মাছ, সবজি। এমনি করেই এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। এক নদী থেকে আরেক নদী। কী আনন্দের দিন ছিল তখন! সে সব আজ আর কোথায়। বজরাটিও ডুবে গেছে ব্রহ্মপুত্রের জলে। সে সময় মুক্তাগাছা ছিল ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান। মুক্তাগাছা ঘরানা–টপ্পা সঙ্গীতের পেছনে সূর্যকান্তের ছোটভাই জগৎ কিশোরের ছেলে জীতেন্দ্র কিশোরের অবদান ছিল অপরিসীম। সূর্যকান্তের নিজের কোন সন্তান ছিল না। জগৎ কিশোরের ছোট্ট ছেলে শশীকান্তকে দত্তক নিয়েছিলেন তিনি। শশীকান্ত তাঁর দাদা জীতেন্দ্র কিশোরের মত সঙ্গীত রসিক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সেকাল বাঙলায় শশীকান্তের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। তাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দীন খান। আর শশিকান্তর রাজপ্রাসাদেই মানুষ হয়েছিলেন বম্বের চিত্র জগতের প্রখ্যাত দুই নৃত্য পরিচালিকা অলকানন্দাদেবী ও সীতারাদেবী।

শশিকান্তের জন্ম মুক্তাগাছায়, ১৮৮৩-এ। ১৯০৯ –এ দেওঘরে সূর্যকান্তের আকস্মিক মৃত্যুর পর কেমব্রিজ থেকে সদ্য এম.এ. পাশ তরুণ শশিকান্ত জমিদারীর হাল ধরলেন। আর জমিদারীর পাশাপাশি যোগ দিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে। তিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা। ময়মনসিংহ থেকে এম এল এ ছিলেন। পরে ভারতের কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্যও।

ইনিই ভারতের প্রথম মোটরগাড়ি তৈরির অন্যতম প্রবক্তা। প্রদ্যুম্ন ঠাকুর, অ্যাড্রিয়ান গাব্বে, রাজেন মল্লিক ও শশিকান্ত প্রমুখেরা মিলিত প্রচেষ্টায় 'তিলজলা আয়রণ ওয়ার্ক্স' থেকে ভারতের প্রথম তৈরি মোটরগাড়ি 'কারটেগর' তৈরি করেছিলেন। খেলার জগতেও শশিকান্তের অবদান ছিল। টাউন ক্লাব, ওয়াড়ি ক্লাব তৈরি করেছিলেন তৈনি। আবার ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি মহলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সুকুমার রায় ছিলেন শশিকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ওতঃপ্রোত। সূর্যকান্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শশিকান্তের ঘনিষ্ঠতা। প্রায়শই বসত গল্পের আসর। কখনও ময়মনসিংহে, কখনও শিলাইদহে আবার কখনও কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশংকর রায়, সুকুমার রায়, আব্বাস উদ্দীন, কিরণ শংকর রায় প্রমুখেরা আসতেন সেই আড্ডার আসরে।

শশিকান্তের জন্ম মুক্তাগাছায়, ১৮৮৩ –এ। ১৯০৯ –এ দেওঘরে সূর্যকান্তের আকস্মিক মৃত্যুর পর কেমব্রিজ থেকে সদ্য এম.এ. পাশ তরুণ শশিকান্ত জমিদারীর হাল ধরলেন। আর জমিদারীর পাশাপাশি যোগ দিলেন ভারতীয় রাজনীতিতে।

আবার যেহেতু তাঁর তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল–তাই তখনকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আসতেন শশিকান্তর কাছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রায়শই তাঁর রাজপ্রাসাদে আসতেন সুভাষ বোস, শরৎ বোস, চিত্তরঞ্জন দাশ, এন সি চ্যাটার্জি, এম এম বোস, গণেশ ঘোষ প্রমুখেরা।

শশিকান্ত মারা যান ১৯৪২–এ, কলকাতায়। তখন আচার্য পরিবার থাকতেন লোয়ার সার্কুলার রোডে। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারীর দায়িত্ব নেন তিন ছেলে–সিতাংশুকান্ত, সুধাংশুকান্ত ও স্নেহাংশুকান্ত।

শেরশাবাদ পরগণার জমিদারী পেয়ে সিতাংশুকান্ত বসবাস শুরু করেন মালদার কনসার্ট–এ। এই কনসার্টে সিতাংশুকান্তের বাড়িটি ছিল রবীনসন সাহেবের নীলকুঠি। শশিকান্তর মেজ ছেলে সুধাংশুকান্তের ভাগে পড়ে শেরপুর পরগণা। আর ছোট ছেলে স্নেহাংশুকান্ত পান নেত্রকলা পরগণা। তিন ছেলেই থাকতেন আলাদা। যদিও ময়মনসিংহ ছিল তিন ভাইয়ের যৌথ মালিকানায়। সিতাংশুকান্ত রাজনীতিতে আসেন শশিকান্ত মারা যাবার পর। ১৯৪২ থেকে। শশিকান্তের জীবিত অবস্থায় সিতাংকান্ত বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন সঙ্গীতচর্চায়। 'সঙ্গীতাচার্য' ডিগ্রিও পেয়েছিলেন। 'সঙ্গীত দর্পণ' ও 'সুরের পূজা' নামে সঙ্গীত বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। সে সময় কনসার্ট কিংবা ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে সিতাংশুকান্তের সঙ্গীতের আসরে প্রায়ই আসতেন আমজাদ আলির কাকা নপু খান, নান্টুজী, দবীর খান, রাধিকামোহন মৈত্র, বিলায়েত খানের গুরু বিমলাকান্ত রায়চৌধুরি।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে সিতাংশু ছিলেন সুভাষ বোসের সহকর্মী। সুভাষ বোসের বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলেনটিয়ারী ফোর্সের কমাণ্ডেট ছিলেন সিতাংশুকান্ত। এই সংগঠনটি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক প্রস্তুতি। সিতাংশুকান্তের কনসার্টের বাড়িতে সুভাষ বোস বহুবারই এসেছেন। ময়মনসিংহেও গেছেন তিনি। তবে রাজনৈতিক সঙ্গী হিসেবে সিতাংশুকান্তর বেশিরভাগ সময় কেটেছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে। সিতাংশুকান্তের দুই ছেলে সহস্রাংশুকান্ত ও শত্রুঘ্নকান্ত এখন কলকাতায় থাকেন। বিচক্ষণতা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের অমলিন সংমিশ্রনে শত্রুঘ্নকান্ত কলকাতার এক অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। সেই সঙ্গে বি জে পি–র রাজ্য কমিটির নেতাও। স্ত্রী সুষমাদেবীও বি জে পি–র মহিলা সংগঠন করেন। আর একমাত্র সন্তান সৌমকান্তকে নিয়ে তাঁরা থাকেন যতীন দাস রোডে।

আসলে আচার্য পরিবারের রাজনৈতিক ধারাটি বরাবরই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পথ অনুসৃত। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের জাঁদরেল কম্যুনিস্ট নেতা হিসেবে বিশেষ খ্যাত স্নেহাংশুকান্ত আচার্যও ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের আজীবন সদস্য। পরে কম্যুনিস্ট বন্ধুদের ও কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে বিশ্বাসী স্ত্রী সুপ্রিয়াদেবীর চাপে তিনি যোগ দেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনে। তারপর ক্লাব রসিক স্নেহাংশুকান্ত একদিন উঠে এসেছিলেন ভারতের কম্যুনিস্ট রাজনীতির প্রথম সারিতে। যতদিন বেঁচেছিলেন কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। বিশেষত বাঙলার রাজনীতিতে- তিনি চিরকাল একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে। এছাড়া স্নেহাংশুকান্তের বিশেষ অবদান চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটাল। যা তাঁর অন্যতম সোস্যাল কনট্রিবিউশন। স্নেহাংশুকান্তের ছেলে সৌরাংশুকান্ত এখন লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। স্ত্রী থাকেন কলকাতায়, বেকার রোডে।

স্নেহাংশুকান্তের মেজ ভাই সুধাংশুকান্ত চিরজীবনই ছিলেন শিকার বিলাসী। শিকারের জন্যই তিনি রাঁচীতে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে শুভ্রাংশুকান্ত এখন কলকাতার জুলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর।

এই হল আচার্য পরিবারের প্রায় আট'শ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রবাহ নিয়ে এখনও কেউ কেউ কলকাতায় আছেন। বহন করে চলেছেন ময়মনসিংহ আর প্রাচীন কলকাতার ইতিকথা। এখনও অবসরে, চলে আসা পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে সেই সব দিনের বিয়োগান্ত সুর। এক উজ্জ্বল নস্টালজিয়া গ্রাস করে তখন।

তাপস মহাপাত্র

ছবি সংগ্রহ : সুস্মিতা চৌধুরী

জমতে শুরু করেছে যাযাবর পাখীর মেলা

আশ্চর্য পক্ষীসংসার

প্রতিবছর শীতের শুরুতে কলকাতা এবং তার চারপাশের শহরতলি ছেয়ে যায় বিদেশ থেকে উড়ে আসা যাযাবর পাখির ঢলে। তাদেরই আশপাশে ভিড় জমে বিচিত্রসব দেশী পাখিদের। পাখিদের কৌতূহলকর ঘর-সংসারের পক্ষীবিজ্ঞান স্বীকৃত অজানা কাহিনী।

সেই রূপকথার গল্প কার না জানা! এক সওদাগর বাণিজ্য তরী সাজিয়ে বিদেশ চলেছেন। মাসাধিক কাল বাইরে বাইরে কাটবে। যাবার আগে স্ত্রী ও পুত্রদের কাছে বিদায় নিতে গেলেন। বড় স্ত্রী চাইলেন দামী মুক্তোর গয়না। বড় ছেলে চাইল হাতির দাঁতের শৌখিন কারুকাজ করা ঘর সাজাবার শো-পিস। ছোট ছেলের বায়না ছিল কালো এক আরবী ঘোড়া। সবার শেষে ছোট স্ত্রীর কাছে সওদাগর গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জন্য কি আনব? রত্নখচিত অলংকার নাকি দামি আতর? ছোট স্ত্রী বললেন, এসবের কোন দরকার নেই। আমার জন্য আনবে শুধু দুটি পাখি। লালমন আর হীরামন। সকলের চাহিদামত দেশে ফেরার আগে সব কিছুই জোগাড় করেছিলেন সেই বণিক। কিন্তু ছোট স্ত্রীর জন্য লালমন-হীরামন খুঁজতে গিয়ে তাঁকে যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তা আর নতুন করে বলার নয়। আজ কেন, সেই রূপকথার গল্প-কাহিনীর যুগেও আশ্চর্য এই দু'টি পাখির সন্ধান পাওয়া ছিল রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।

রূপকথার লালমন আর হীরামন কেন, পাখিদের জগতটাই রীতিমত বিস্ময়কর। বিচিত্র তাদের ঘর সংসার। তারাও জানে সন্তান প্রতিপালন, বসবাসের বাসা তৈরি করতে। উদর পূর্তির জন্য তাদের করতে হয় দৈনিক আহার্য সন্ধান। ঠিক মানুষেরই মত তারাও প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা করতে জানে। শীতের প্রকোপ এড়াতে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষেরা যেমন পাততাড়ি গুটিয়ে সমতলে নামে, শীতের পাখিরাও উড়ে আসে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায়। পরে আবার ফিরে যায় স্বভূমে। পাখিদের উড্ডয়নের কর্মকুশলতাই রাইট ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল আকাশযান তৈরি করতে। কলম্বাস যখন প্রথম তার নৌ-যাত্রা থামিয়ে স্থলভূমিতে পা দিয়েছিলেন সেখানকার আদিবাসীরা তাঁকে উপহার দিয়েছিল আশ্চর্য এক মুকুট। পালকের মুকুট। অবিস্মরণীয় বর্ণসমারোহে সে মুকুট শোভা পেয়েছিল কলম্বাসের মাথায়। আবার এই পাখিদেরকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে কত না আচার সংস্কারের নির্ভরতা মেনে নিয়েছেন কতজন। কার্তিকের বাহন হিসেবে হিন্দুরা মেনে নিয়েছে ময়ূরকে, সরস্বতীর বাহন শ্বেতহংস, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক।

মানুষের বশ মানে এমন পাখির কথা কম কি? ঠাকুরপুকুর, বেহালার এক বাড়িতেই থাকে এক তীক্ষ্ণ-চঞ্চু বাজ। বশ মেনেছে। যাদের বাড়িতে থাকে, তাদের ছোটরা পর্যন্ত নির্ভয়ে বাজের কাছে চলে যায়। আঁচড়ে কামড়ে দেবে একথা কেউই ভাবতে পারে না। আসে, নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে, মাছ-ভাত খায় আবার বাইরে উড়ে যায়। খানিক ঘুরে ফিরে আবার চলে আসে নিজের জায়গাটিতে। পোষা ময়না, কথা বলা শালিক তো

হরহামেশা লোকের বাড়িতে দেখা যায়। ময়না, টিয়া কিংবা শালিককে কেউ শেখায় 'রাম' কেউ শেখায় 'কৃষ্ণ'। এমন শোনা যায়, ময়না অবিকল মানুষের সুরে ডাকছে, 'ছোট বৌমা, ভাত দিয়ে যাও তো!' কথা-বলা পাখির কথা বলতে গেলে আলিপুর চিড়িয়াখানার ময়নার কথা আসবে। ময়নাকে যে খাবার দেয়, দেখভাল করে তার নাম 'রামচন্দ্র'। মাঝে মাঝেই ময়না ডাকে রামচন্দ্রকে। ময়না তো মানুষের স্বরে কথা বলতেই পারে কিন্তু কাকও অবিকল মানুষের গলা নকল করতে পারে এমন কথা শুনেছে কেউ? এই আশ্চর্য কাকের আবাস কিন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানা। কণ্ঠের কার্কশ্যই কাকের বৈশিষ্ট্য, মানুষের কাছে তার সমাদর কম এমত সব ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে এই কাকটি। ময়নার মত সেও ডাকে রামচন্দ্রকে। খাঁটি মানুষের কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ করে কেউই বুঝে উঠতে পারে না এ কি করে হয়।

বাসা তৈরির শিল্পে কারিগর পাখিদের মধ্যে বাবুই-এর মর্যাদা একেবারে অন্যরকম। তাল-গাছের মাথায় সে ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে যে বাসা বোনে তা সকলেরই আগ্রহের বিষয়। বাসা নির্মাণের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আবার নানান পাখির মধ্যে নানান রকম। কোন কোন পাখি বসবাসের বাসাটিকে অতি যত্নের সঙ্গে তৈরি করে, তার জন্য প্রাণপাত করতেও তাদের আপত্তি নেই। খড়-কুটো, শুকনো ডালপালা সযত্নে জমিয়ে নিয়ে আশ্চর্য কারিগরি দক্ষতায় তৈরি করে বাসা। অন্যরা কেউ কেউ আবার এতখানিই অলস যে বাসা তৈরি করতে তাদের ইচ্ছেই থাকে না। অনেক মা-পাখি তো আবার নিজের ডিম অন্যের বাসায় দিয়ে আসে বাচ্চা ফোটাবার জন্য। কোকিলের কথা সবারই জানা। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, পুরুষ পাখিরা নিজের বাচ্চাকে নিজেরাই খেয়ে নেয় এমন উদাহরণও আছে বৈকি!

'বাংলার পাখি' বইটির লেখক অজয় হোমের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে পাখিদের সঙ্গে সময় কাটা-নোর। বললেন, এই উড্ডয়নশীল প্রাণীটির আচার ব্যবহার সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাদের পালকের রঙ, জীবনযাত্রা প্রণালী আমাদের স্তম্ভিত করে। দূর দেশের বহু পাখি শীতের প্রকোপ এড়াতে ভারতে উড়ে আসে। শুধু আলিপুর চিড়িয়াখানার লেকটিতে কেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা কয়েক মাসের জন্য ঘাঁটি গাড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে তো অনেক পাখিই উড়ে এসে থেকে গেছে স্থায়ীভাবে। আর এখানেই গেড়েছে বসত। তাদের খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, প্রজনন সবকিছুই পরিবেশের সঙ্গে মিল-মিশ খেয়ে ভালমতই অভিযোজিত হয়েছে।

আকাশে উড়ে বলেই পাখির নাম খেচর। আকাশে ওড়ার জন্য পাখির শরীরের গঠনও তৈরি হয়েছে বিশেষভাবে। এদের শরীর হালকা। দুটো ডানার উপর থাকে পালক, গায়ের সারা অংশ ছোট পালকে মোড়া। এই পালক যেমন শীতের সময়ে পাখির

ইস্টার্ন রোজেলা

লালমন-হীরামন

শরীরকে উষ্ণতা দেয়, তেমনি আকাশে উড়ে বেড়াবার সময়ে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। অথচ পাখিদের উড়ে বেড়ানোই স্বভাবধর্ম বলে পরিগণিত হলেও অনেক পাখিই আবার আকাশে ওড়ে না। উটপাখি তেমনি এক পাখি। ক্রমে ক্রমে তাদের দু'টি পক্ষ অভিযোজনের ফলে ছোট হয়ে উড়ে বেড়ানোর ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তা বলে পা'দুটি কিন্তু বিন্দুমাত্র কম ক্ষিপ্র নয়। এগুলির সাহায্যে তারা দ্রুত ছুটতে পারে।

পাখিদের মধ্যে ধনেশের গড়নটাই একটি আলাদা রকম মাত্রা দিয়েছে তাকে। ধনেশের চঞ্চুটির আকর্ষণ খুব। বলতে গেলে এই চঞ্চুটিই তার নিজের শত্রু। নাগারা এই চঞ্চুটিকে নিজেদের মাথায় ব্যবহার করতে পারলে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করত। আজও করে। পরোক্ষে মানুষের গর্বিত হবার উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়ে ধনেশ পাখি-টির প্রাণ ধারণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের পর ধনেশ শিকার আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হয়েছে ঠিকই, তবু চোরা গোপ্তা পথে লোভনীয় এই ধনেশ-ঠোঁট সরবরাহ যে একেবারেই হচ্ছে না-একথা

যাযাবর পাখিরা : পরম নিশ্চিন্তে

ফলেমিংগো সংসার

ম্যাকাও

হলফ করে বলা কঠিন।

পাখিদের গলা, রঙ শুধু সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেনি, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলকে সম্মোহিত করেছে। আর সেজন্যই কথাশিল্পীদের কাহিনীতে এসেছে পক্ষী সাম্রাজ্যের কথা। কবির কবিতায় পাখিদের বর্ণমহিমা আর কণ্ঠ মহিমা সুচারুভাবে ধরা পড়ে। রামায়ণ লিখতে গিয়ে মহামুনি বাল্মীকি এঁকেছেন ক্রৌঞ্চমিথুনের কথা। প্রেমিক প্রেমিকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কখনও তাদের তুলনা করা হয় মরাল-মরালী বলে, কখনো বা ক্রৌঞ্চমিথুন বলে। শুধুমাত্র পাখির ছবি এঁকে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর সম্মান আদায় করে নিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে মার্ক্স কোটস বাই, আলেক-জাণ্ডার উইলসন, উইলিয়াম সোয়াইনশন এড-ওয়ার্ড লিয়র, জোশেফ স্মিথ। এঁদের তুলি পাখিদের পালকের বর্ণদীপ্তিকে বোদ্ধাদের কাছে একযোগে উপস্থাপিত করে ধন্য হয়েছে। পক্ষী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি রীতিমত চোখে পড়ার মত। মোটামুটি-ভাবে ২৭টি অর্ডারের অধীনে আছে ১৫৫টি ফ্যামিলি। এখন পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী এই ১৫৫টি ফ্যামিলির অন্তর্গত আছে ৮.৬০০

হলদে ঝুঁটির কাকাতুয়া : সোহাগ–সময়

পিন্টেড স্টক

পেলিক্যান

ভিক্‌টোরিয়া কাউন্ট পিজিয়ান

রেড ড্রাম

প্রজাতির পাখি ।

সৌন্দর্যতত্ত্বের খাতিরে নয় । মানব কল্যাণে পাখিদের ভূমিকাটি অনস্বীকার্য । ডিন অ্যামাডন হলেন আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির অরনিমোলজি দপ্তরের লামন্ট কিউরেটর। তাঁর ভাষাতেই–'বার্ডস হ্যাভ হেল্ফড মিন ফর থাউজেন্ট অব ইয়ারস ফ্রম দ্য গ্রীজ হুজ ওয়ার্নিং ক্রাইজ সেভড রোম টু দ্য ক্যানারিজ দ্যাট ওয়ার ইউজড টু ওয়ার্ন কোল মাইনরস অব মিথেন গ্যাস লিকেজ। ট্রু–লি, বার্ডস টাচ আস ইন আনএক্সপেক-টেড প্লেসেস ।' পাখির দায়িত্ববোধ আর ভূমিকা নিয়ে যা না বললে প্রসঙ্গের খামতি থাকে তাহল, পাখির ওড়া থেকেই রাইট ভাতৃদ্বয় বানিয়েছিলেন বিমানের মডেল । ৯১–এর উপসাগরীয় যুদ্ধে মোরগবাহিনীর কথা কে না জানে ! ইরাক যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছেড়ে রেখেছিল লাল ঝুঁটিওলা মোরগ। সেনা-বাহিনী ও সাধারণ মানুষের বোঝার আগেই বুঝতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হল কিনা ! ওদের স্পর্শেন্দ্রিয় এমনি সজাগ, যে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে । এক শতাব্দী আগে টি.এইচ. হাক্সলে যাদেরকে 'গ্লোরিফায়েড রেপটাইলস' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সেই পক্ষীকুল কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে । সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে। অনেক পাখির আহার্য হল নানান কীট–পতঙ্গ যা মানুষের অনিষ্ট করতে পারে । পাখিরা শুধু কীটপতঙ্গের বিনাশকারী হিসেবে নয়, অনেক বিষধর সাপকেও তারা মেরে ফেলতে পারে। রামায়ণের রামকেও কিন্তু গরুড়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল যখন অনুজসহ তিনি সর্পপাশে আবদ্ধ ছিলেন। পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড়ের উল্লেখ আছে মহাভারতেও । আছে তার সেবাব্রতির কাহিনীমালা। ময়ূরকে দেখে ময়ূর পংক্ষীর কল্পনা, দৃষ্টিনন্দন ময়ূরকে কার্তিকের বাহন করা হয়েছেও বা সেই কারণে ।

কলকাতা চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর অধীর কুমার দাস কথা প্রসঙ্গে বললেন, মাইগ্রেটরি পাখিরা উড়ে যাবার আর উড়ে আসার দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব, আনন্দকর । বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল সেবার । এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'কি করছেন মশায়, এই বয়সেও টালিগঞ্জ থেকে রোজ সকালে আমি আসি একটি দৃশ্য দেখার জন্য। পাখিরা যখন উড়ে আসে। আর খিদিরপুরের দিকের গেটটাই বন্ধ করে দিলেন ?' সেই পক্ষী প্রেমিক মানুষটির প্রসঙ্গ এসেছিল যাযা-বর পাখির কথায় । শ্রীদাস বলছিলেন, 'আসলে চিড়িয়াখানা থেকে যখন উত্তরের পাখিরা উড়ে ভিড় জমায় সে এক বিরল আনন্দের জন্ম নেয় মনে। সত্যি বলতে কি, আজও অনেকের ধারণা এই শীতের পাখিরা বুঝি চার পাঁচ মাসের পাট্টা নিয়ে লেকে ভিড় জমায়, তারপর উড়ে চলে যায় । তা কিন্তু আদৌ নয়। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি শীতের সময়ে যে পাখিরা লেকে এসে ভিড় জমায় তারা প্রত্যেকদিনই সন্ধের সময় উড়ে যায়। ফের পরের দিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে সারবদ্ধ হয়ে উড়ে আসে লেকে । আর এই দৃশ্যটি দেখতে ওই বৃদ্ধ মানুষটি হেঁটে আসতেন রোজ । খিদিরপুরের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই ভদ্রলোককে অনেকটা ঘুরে আসতে হত । ওই ভদ্রলোক সেদিন রাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম-প্রতিদিন মানুষটি একটি দৃশ্য দেখার জন্য কতদূর থেকে ছুটে আসেন।'

–যে যে বিদেশি যাযাবর পাখি এখানে আসে, তারা কি বরাবরই এখানে আসে ?

–না, সকলে আসে না, আবার কিছু কিছু পাখি তো ঘুরে আসেই ।

–আগে যে পাখি এসেছিল, তারাই যে আবার ফিরে এল একথা আপনারা বোঝেন কি করে ?

–আমরা কখনো পায়ে আংটা লাগিয়ে দেখেছি, পরের বছরেও সেই আংটা পরা পাখিরা এসেছে ।

–এদের জন্য কি নতুন কোন খাদ্য সরবরাহ করতে হয় আপনাদের ?

–না, এদের জন্য বাড়তি অথবা বিশেষ কোন খাদ্য আমাদের দিতে হয় না ।

–এরা কি খায় ?

–আসলে সন্ধের সময়ে এরা কোথায় উড়ে যায়, সকাল বেলা যে কোথা থেকে উড়ে আসে কেউ জানে না । এমনি আমাদের লেকের স্থায়ী পাখিদের জন্য যে খাবার দেওয়া হয় জলের নিচে, ওখান থেকে ওরা মাঝে মাঝে শেয়ার করে ।

–শীতের পর এরা কি প্রত্যেকেই ফিরে যায় ?

–প্রত্যেকটি পাখি যে চলে যায় সে কথা বলা কঠিন । কঠিন এই জন্য কিছু মাইগ্রেটরি বার্ড তো এখানে বসবাসই করেছে । এখানেও তারা ভালমতই অভিযোজিত করেছে নিজেদের। ভালমত সেটল করেছে। আমরাও দেখি পরীক্ষা করে অন্য-রাও এখানে থাকতে পারে কি না ।

–মোটামুটি ক'ধরনের মাইগ্রেটরি বার্ড এখানে আসে ।

–এখানে মোট ৫ ধরনের মাইগ্রেটরি বার্ড আসে ।

–আপনারা এখানে ব্রিডিং করান না ?

ময়ূর এসে পেখম তুলে...

--আমরা পাখিদের ব্রিডিং যে একেবারেই করাই না তা কিন্তু নয়। কোন ক্ষেত্রে আমরা ভাল ফল পেয়েছি। মাইগ্রেটরি বার্ডের ক্ষেত্রেও আমরা ভাল রেজাল্ট পেয়েছি একটি দু'টি ক্ষেত্রে। তবু ব্রিডারদের মত আমরা যে খুব ভাল ব্রিডিং করাতে পারি তা দাবি করা কঠিন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রণয়ন ঘটলেও সত্যি কথা হল চোরাগোপ্তা পথে পশুপাখিকে কেন্দ্র করে পাখি ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে। দেশের পাখি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কড়া আইন জারি করা থাকলেও কোন কিছুই অবশ্য থেমে থাকেনি। বিদেশের পাখি ব্যবসায়ীরা যথারীতি আনছে, ব্যবসা করছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্যে যার দাম চার পাঁচ হাজার সেই পাখিই এখানে বিক্রি হচ্ছে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকায়। এই প্রতিবেদক কলকাতারই একাধিক পাখি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন, বাবুদের ড্রয়িংরুমে পাখি সরবরাহের দায়িত্ব পেয়ে নিজেরা রীতিমত নিজেদের আর্থিক অবস্থাটিকে মজবুত করে তুলেছে।

কলকাতারই এক পাখি ব্যবসায়ীর নাম কার্তিক চন্দ্র দাস। বললেন আমরা শখে কিছু পাখি পুষি, তাদের বাচ্চাও তুলি। তবে মূলত আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে পাখি কিনে আনি, আর সেই পাখিই বিক্রি করে দিই। এই করেই আমাদের চলে। কার্তিকের মতই আরেক পক্ষী ব্যবসায়ী কথা প্রসঙ্গে জানালেন, পাখির দাম যে ঠিক কত হতে পারে তার আনুমানিক মূল্য পেশ করা সত্যিই কঠিন। বিভিন্ন সময়ে পাখির বাজারে বিভিন্ন দাম হয়। তবে বিদেশি যে যে পাখি তার জোড়া ৮০ থেকে শুরু। রেয়ার বার্ডসের ক্ষেত্রে সে দাম ১০ লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে।

বিরল পাখির দাম যেখানে বিশ্বে আকাশ ছোঁয়া সেখানে পাখিদের বংশবৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কি? কলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্রিডার সুব্রত চক্রবর্তী। বিগত চল্লিশ বছর ধরে তিনি পাখির বাচ্চা তুলে চলেছেন। বাড়িতে কম করে 'শ খানেক দেশি বিদেশি বর্ণময় পাখি। একলেকটাস থেকে ম্যাকাউ, রোজেলা থেকে ম্যয়ূউ, ফিঞ্চ থেকে জাভা স্প্যারো সবই রয়েছে খাঁচায়। সুব্রত একটি গুরুত্ব পূর্ণ পদে চাকরি করেন বটে কিন্তু পাখির সঙ্গে বসবাস যেন তাঁর স্বভাবধর্ম। বললেন, আমরা নিজেরাই পাখিদের দামকে বাজারে বাড়িয়ে দিয়েছি। যে যে সব পাখি আজ বিশ্ব থেকে অবলুপ্তির পথে তাদের সংরক্ষণের কথা গুরুত্বসহ ভাবছি না। নিকেবির পিজিয়ন, হুপিং ক্রেন, বন মোরগের কয়েকটি প্রজাতি আজ বিশ্ব থেকে নির্মূল হয়ে যেতে বসেছে। অথচ সেগুলি সংরক্ষণের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। চিড়িয়াখানাগুলিতে পাখিদের ব্রিডিং করানো প্রায়ই হয় না, অথচ সেখানে ঢের সুযোগ ছিল আবার ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা ব্রিডিং করান তাঁদের কাজকে সরকার স্বীকৃতি জানানো তো দূরের কথা, তাদের নামে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ভঙ্গের দায়ে আইন রুজু করা হয়। আমি বিরল প্রজাতির দামী কিছু পাখি ব্রিড করাতে চাই। যখানে আমি চল্লিশ বছর ধরে ডিম পাখির বাচ্চা বাড়িতে খাঁচায় তুলে নিতে পারছি আমার বিশ্বাস ট্রপিক্যাল অঞ্চলের পাখিও এখানেও বাচ্চা দেবে। সরকার যদি আমাদের মত ব্রিডারদের পেছু না লেগে কিছু সহায়তা করতেন তাহলে মারাথা-র মত কোন পাখিকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত অবলুপ্ত হতে হয়ত হবে না। আমরা ব্রিডার, পাখি ব্যবসায়ী নই। আমরা পাখিকে জোড় দিয়ে বাচ্চা তুলে আনন্দ পাই, পয়সার কথা ভাবিনা। অথচ ব্রিডাররাই চেষ্টা করলে পাখির সংখ্যা বাজারে বাড়াতে পারেন। পাখি ব্যবসায়ীরা চাইবে বাজারে যত কম পাখি থাকবে তাঁদের লাভ তত ভাল হবে। জাভা স্প্যারো যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিল তখন তার দাম ছিল ৫ হাজার টাকা জোড়া। আর এখন এটির জোড়া শ' এর কোঠায় নেমে এসেছে। দুঃখের কথা এই, আমি ড্রইংরুমে পাখি-রাখা বাবুদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেও বাচ্চা তুলতে এক বছরের জন্য ধার চেয়ে পাইনি। অথচ আমি জানি তিনটি লেজার বিটার পাখি কলকাতায় রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাই এই বিরল কাকাতুয়াদের দাম নিয়ে মাথাব্যথা নেই-অথচ এই পাখি সারা এশিয়াতে ৫/৬টির বেশি নেই। এদের দীর্ঘশ্বাস পিঁজরায় ধাক্কা খাবে কিন্তু ভবিষ্যত প্রজাতির মধ্যে বেঁচে থাকবার সুযোগটি থেকে বঞ্চিত হবে।

সেই বাঘ আর সারস! এ গল্প কার না জানা? 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়া ছিল'। ...শুনে কোন ছোট ছেলেটি না খুশি হয়! দীর্ঘচঞ্চু সারস বিচিত্র পাখি ফ্লিসিংগো, কাক আর হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া, ময়না, আবার বিদেশি পাখি একলেকটাস, (লালমন হীরমন) ম্যাকাউ, লরি, স্প্যারো, ফিঞ্চ, রেড-ড্রাম, গথিনস্ কাকাতুয়া। বিশ্বের একটি অন্যতম দামী পাখি হল ভিক্টোরিয়া ক্রাউনড পিজিয়ন অবলুপ্ত ডোডো যে গোত্রের পাখি, এটিও সেই গোত্রীয়। বড় বিচিত্র দেখতে এই পায়রার মাথায় মুকুট। এ এক বিরল দৃশ্য।

কতই বিচিত্র সার্কাসে কাকাতুয়ার কামান দাগা! সার্কাসে পশুপাখি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রাক্তন কেন্দ্রিয় পরিবেশ মন্ত্রী মানেকা গান্ধী বিভিন্ন শর্ত আরোপ করলেও ব্রিডারদের জন্য কোন মন্ত্রী, কোন সরকারই তেমন কিছু করেন নি -অভিযোগ করলেন সুব্রত চক্রবর্তী। 'আমরা যদি কিছু রেয়ার বার্ডসকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবেও নিই সরকার কেন আমাদের আইন প্রণয়ন করে বাধা দেবেন সেটাই তো পরিষ্কার নয়। ১৯৭২-এর বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে তো স্পষ্টতই বলা আছে সরকার চাইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগী কাউকে ব্রিডিং-এর দায়িত্ব দিতে পারেন। কিন্তু সে রকম কোন কর্মসূচী সরকার নিয়েছেন বলে জানা নেই।' 'বিদেশে তো জনগণও উদ্যোগ নিয়ে থেকে থেকে পাখিদের বসবাস ও ব্রিডিং -এর ব্যবস্থা করেছেন' -বললেন সুপ্রতীক গুহ। কলকাতার অন্য এক বার্ডস ব্রিডার। 'ইংলন্ডে কেন পাশ্চাত্যের বহু দেশে সরকার এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন।'

-পাশ্চাত্যে বহুবার যিনি পাড়ি দিয়েছেন সেই সুপ্রতীক বলছিলেন কথায় কথায়।

পাখি আর পাখি, পক্ষী সাম্রাজ্যের জগতে কতই না রোমাঞ্চকর কাহিনী। এরা শৃঙ্গার করে, একে অন্যকে ভালবাসে, ত্বক চর্চা করে, ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট লাগিয়ে পুরুষ পাখি স্ত্রী পাখিকে আদর করে অবিকল যেমন করে প্রেমিক প্রেমিকা চুম্বন করে একে অপরকে। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি পাখিদের নিয়ে মানুষের কম আগ্রহ! জোড়া শালিক-দেখলে সারাদিন মন ভাল যাবে নচেৎ নয় এ ধারণা যেমনি আছে তেমনি অলস দুপুরে কোন ঠাকুমাকে দেখা যাবে নাতনি ঘুম পাড়াচ্ছেন এই বলে-লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া, ধরেছে যে বায়না, চাই তার লাল ফিতে চিরুনি আর আয়না।...'

তাপস মহাপাত্র ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

নেপথ্যকণ্ঠদায়িনী

রেলওয়ে স্টেশন, হোটেলের লাউঞ্জ, পাতাল রেলের কম্পার্টমেন্ট, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ, রেডিও কিংবা টেলিফোনে সাহায্যকারিণী যেসব অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনি সেইসব অন্তরালবর্তিনীদের অজানাকাহিনী পেশ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

প্রণতি মিত্র মুস্তাফী (ঠাকুর) : মেট্রোরেল

বিকেল প্রায় পাঁচটা। জনসমুদ্রের ঢল নেমেছে হাওড়া স্টেশনে। উপকণ্ঠ এবং শহরতলির বহু মানুষ ছুটছেন দিনের শেষে, নির্দিষ্ট ট্রেনটি ধরতে। সকলেই ব্যস্ত। সকলেরই ঘরে ফেরার তাড়া। মাইকে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে ঘোষিকার কণ্ঠস্বর, '৪-৫৫ মিনিটের বর্ধমান লোকাল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, ওভারহেড তারের গণ্ডগোলের জন্য ৫-০৭ মিনিটের মেচেদা লোকাল আজকের মত বাতিল করা হল।' অথবা '৫-২৫ মিনিটের মেন লাইন ব্যান্ডেল লোকাল পাঁচ নম্বরের পরিবর্তে ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।'—ইত্যাদি। মফস্বলবাসী কোন বৃদ্ধ হয়তো দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ একটু কষ্ট করেই বুঝে নিচ্ছেন ঘোষিকার কথাগুলি। তারপর স্মিত মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে। মনে মনে হয়ত কৃতজ্ঞতা বোধ করছেন ঘোষিকার কাছে। আবার হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ফলে ক্রুদ্ধ, ব্যস্ত নিত্যযাত্রীর ক্ষোভের অনেকটাই বর্ষিত হচ্ছে ঘোষিকার উদ্দেশ্যেই। ঘোষিকা কিন্তু শুনতে বা জানতে পারছে না কিছুই। বিকারহীন কণ্ঠস্বর যান্ত্রিক নিয়মে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির।

আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলার পথ অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণ করে এই ধরনের কণ্ঠস্বর——বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। অবচেতনেই মানুষ নির্ভর করে এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের ওপর যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কল্পনায় থাকে না কোন মানুষের ছবি। রেলওয়ে স্টেশনে প্রয়োজনীয় ট্রেনটির নির্ধারিত সময় আর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে নিতে সাহায্য করেন ঘোষিকারা। এয়ারপোর্টে জানিয়ে দেন ফ্ল্যাইট নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য। কলকাতাবাসী যেহেতু পাতালরেলের অভিজ্ঞতায় নবীন, তাই শুধু স্টেশনের নাম নয়--দরজা বন্ধ হওয়া, খোলা ইত্যাদি খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও যাত্রীদের সাহায্য করে অদৃশ্য কণ্ঠদায়িনী। আকাশবাণীর ঘোষিকা জানিয়ে দেন আবহাওয়ার খবর--আকাশ পরিষ্কার থাকবে না মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে, না কি উঠবে না। সমুদ্রতীরের জেলেরা সেই নির্দেশ মেনে নৌকো নামায় সমুদ্রে। শুধুমাত্র পথ নির্দেশ নয়, আকাশবাণীর ঘোষিকা যখন হঠাৎ সময়সূচীতে জানিয়ে দেন, সুচিত্রা মিত্র বা দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত বা পুরানো দিনের আধুনিক গানের খবর, তখন বহু জরুরি কাজ ফেলেও মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আটকা পড়ে বাড়িতে।

কানন বেরা : হাওড়া স্টেশনে নিয়মিত শোনা যায় যাঁর গলা

আশ্চর্য এই ঘোষিকাদের জীবন। প্রতিদিন হাজার হাজার অজানা অচেনা মানুষকে তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছেন। চালিত করছেন, সচেতন করে তুলছেন বিপদ সম্বন্ধে, আবার বয়ে আনছেন আনন্দ সংবাদও। অথচ অনেক সময়ই দেখা যায় যে তাঁদের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে পেশার মিল নেই এতটুকুও। হাওড়া স্টেশনে, লোকাল ট্রেনের হাজার হাজার যাত্রীকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট ট্রেনটি ধরতে সাহায্য করেন কানন বেরা। কানন কিন্তু অন্ধ। অগুন্তি মানুষকে প্রতিদিন পথ দেখাচ্ছেন এক দৃষ্টিহীন, যাঁর শক্তি নেই নিজের পথ চেনার। অবশ্য প্রতিবন্ধী হলেও পরনির্ভরশীল নন কানন। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা করেছেন 'ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল'-এ। সেখানে শুধু পড়া নয়, শিখেছেন গান, আবৃত্তি। পরে বড়িশার কলেজ থেকে স্নাতক হন। কানন বেরার বাবাও কাজ করেন রেলেই। সেই সূত্রে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ঘোষিকার পদ খালি আছে। সেইমত ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিতে যোগ দেন কানন। সেও হয়ে গেল প্রায় দশ বছর। এতদিনে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছেন তিনি। কাজে এসেছে খানিকটা একঘেয়েমিও। কিন্তু প্রথমদিকে যেমন উত্তেজনা ছিল, তেমনি ছিল নানা ধরনের অসুবিধাও। কারণ ঘোষিকা কিভাবে ঘোষণা করবেন, কেমন ভাবে কথা বললে যাত্রীরা সহজে বুঝতে পারবে, এই সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ রেল-কর্তৃপক্ষ দেন না। ইন্টারভিউ এর সময় শুধুমাত্র ফোনে স্বর-পরীক্ষা হয়, দেখা হয় উচ্চারণ যথাযথ কিনা, আর যেহেতু

তিনি অন্ধ তাই ব্রেইলের লেখা ঠিকমত পড়তে পারছেন কিনা সেটাও দেখা হয়। সুতরাং কাজের শুরুতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। প্রথমদিন কাজ করতে এসেই তিনি এরকম একটি সাংঘাতিক গণ্ডগোল করেছিলেন—কর্ড লাইন বর্ধমান লোকালের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ভুল বলেন। তার ফলে সাংঘাতিক গোলমাল শুরু হয়। এমন কি যাত্রীরা ডেপুটি এস·এম·এর অফিস ঘেরাও করে ভাঙচুর করেন। একবারে প্রথম দিন বলেই কানন বেরার বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু সেদিনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কতখানি দায়িত্বের ভার তাঁকে বহন করতে হবে। তাঁর সামান্য ভুলের জন্য বিপন্ন হয়ে পড়বেন হাজার হাজার মানুষ। আর সেই বোধই তাঁকে আজও কাজের প্রতি অখণ্ড মনসংযোগে বাধ্য করে।

শিয়ালদহ স্টেশনের ঘোষিকা পলি ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতাও অনেকটা একই রকম—'আমি জানি যে আমার সামান্য ভুলের মাশুল দেবে বহু লোক। একবার আমার এক বন্ধু অ্যানাউন্সমেন্টের গণ্ডগোলের জন্য ট্রেন ধরতে পারেনি। পরের ট্রেনে গিয়ে সে আর তার মাকে জীবিত দেখতে পেল না। মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হল না তার। ঘটনাটা আমায় দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে বন্ধুর অবস্থাটা সব সময় অমার মনে ভাসে। তাই চেষ্টা করি যাতে কিছুতেই ভুল না হয়।' শিয়ালদহ স্টেশনে পলি আছেন প্রায় দশ বছর। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই তিনি চাকরি পান। পরে চাকরি করতে করতেই স্নাতক হয়েছেন। কানন দেবীর তুলনায় পলি ভট্টাচার্যের অবস্থা অবশ্য খানিকটা সুবিধাজনক। প্রথম দিন কাজে এসেই মাইক্রোফোনের সামনে বসতে হয়নি। প্রায় একমাস ধরে সহকর্মীরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেন। এখন অবশ্য তিনি নিজের কাজে অভ্যস্ত এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনও।

একটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত--সারাদিন স্টেশনের ছোট্ট, চাপা ঘরে বসে ঘোষিকার কাজ করলেও কানন বেরা এবং পলি ভট্টাচার্য দু'জনেই সংস্কৃতি মনস্ক মহিলা। কানন এক সময় নিয়মিত আকাশবাণীতে আবৃত্তি করতেন। এছাড়া ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে পারেন। পলি দেবীও সুগায়িকা। প্রায় পাঁচ বছর তিনি যুববাণীতে নিয়মিত গান করেছেন। গাইতেন অতুল প্রসাদী, নজরুলগীতি অথবা রজনীকান্তের গান। এখন আর অনুষ্ঠানে যান না ঠিকই কিন্তু বাড়িতে চর্চা করেন নিয়মিতই।

স্টেশন চত্বরে সর্বক্ষণই ঘোষক বা ঘোষিকার প্রয়োজন হয়। তাই এঁদের সকলেরই শিফটিং ডিউটি। এখানে অসুবিধা দেখা দেয় মহিলাদের। রাতের শিফট শেষ হয় দশটায়। তারপর একাকী বাড়ি ফেরা বিপজ্জনক। অথচ সারাদিন যাঁরা বহু মানুষকে পথ দেখিয়ে সাহায্য করছেন, তাঁদের বাড়ি ফেরার রাস্তাটুকু সুগম করার কোন দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ নেন না।

আকাশবাণীর ঘোষিকার পদের চাকরি এখন রীতিমত লোভনীয়। সরকারি কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত বেতনক্রম এবং সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাও তাঁরা পেয়ে থাকেন। অবস্থাটা অবশ্য আগে ঠিক এরকম ছিল না। গারস্টিন প্লেসে যখন আকাশবাণীর অফিস ছিল, তখন ঘোষণার কাজ চালানো হত অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধী তথ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন যে ঘোষক বা ঘোষিকার পদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। সেই অনুযায়ী ষাটের দশকে ইডেনগার্ডেনের পাশে, বর্তমান আকাশবাণীর অফিস যখন উঠে এল তখন থেকেই ঘোষক, ঘোষিকারা তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত।

বছরখানেক হল আকাশবাণীতে ঘোষিকার চাকরি করছেন মালবিকা চক্রবর্তী। এখনও অবশ্য স্থায়ী কর্মী নন। কিন্তু কাজ করতে হয় প্রায় সব বিভাগেই। সাধারণতঃ শ্রোতাদের দিনের অনুষ্ঠানসূচী সম্বন্ধে অবহিত করাই তাঁর দায়িত্ব। কলকাতা ক বা খ, অন্তর্দেশীয় অথবা যুববাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঘোষণা তিনি করে থাকেন। এর আগে কাজ করেছেন আকাশবাণীর শিলিগুড়ি এবং আগরতলা অফিসেও। মালবিকা জানালেন যে এই কাজে যোগ দেওয়ার আগে কোন নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ করেন না। কিন্তু সহকর্মীরা সাহায্য করেন খুবই। অভিজ্ঞ ঘোষক ঘোষিকার স্বরক্ষেপণ শুনে শুনে ঠিক করে নিতে হয় নিজের গলাকে। একটা সুবিধা অবশ্য এখানে আছে——কর্তৃপক্ষ মনিটারিং-এর সুযোগ দেন। নিজের বলা কথা, কানে শুনতে পেলে ভুলত্রুটি ধরা পড়ে সহজেই।

মালবিকা চক্রবর্তী উত্তর ভারতের মেয়ে। স্নাতক হয়েছেন সেখান থেকেই। এখন রবীন্দ্রভারতীতে পড়াশোনা করছেন। বিষয়-নাচ। শুধু পড়াশোনা নয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত নাচ করেন মালবিকা--এক কথায় নাচ তাঁর নেশা। কিন্তু নেশা ও পেশার মধ্যে পার্থক্য তো দুস্তর—'আমি তা মনে করি না। ঘোষিকার চাকরি করতে গিয়ে আমি চেষ্টা করি স্বরক্ষেপণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে। নিজেকে একজন শিল্পী বলে ভেবে নিলেই আর কোন সমস্যা থাকে না।

পলি ভট্টাচার্য : শিয়ালদা স্টেশনের ঘোষিকা

ঘোষিকারা সাধারণতঃ তাঁদের উর্দ্ধতন কর্মীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যান। এরপর সেগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে বলার দায়িত্ব তাঁর। স্বভাবতই বিখ্যাত কোন শিল্পীর অনুষ্ঠান যখন ঘোষণা করেন নবাগত ঘোষিকা, তখন তাঁর মনে থাকে চাপা ভয় এবং আনন্দও। এছাড়া আছে দায়িত্ববোধের ব্যাপার। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন ঘোষণা করার প্রয়োজন হয়, তখন অত সাজিয়ে গুছিয়ে সব কিছু বলার সময় থাকে না। যেমন রাজীব গান্ধীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছনোর পর আকাশবাণীর সব অনুষ্ঠান সূচীই আমূল পালটে যায়। অনেকটা তাৎক্ষণিকভাবেই ঘোষণা করেছিলাম আমরা।' এছাড়া নির্বাচনের সময় যখন নির্বাচনী ফলাফল দ্রুত আসতে থাকে এবং বারবার নির্বাচনী সংবাদ প্রচার করতে হয় তখন ঘোষিকাদের দায়িত্ব বেড়ে যায় অনেকখানি। ভুল হলে চলবে না। নিখুঁতভাবে দেখে নিতে হবে প্রতিটি সংখ্যা, অথচ গলার স্বরে কোনরকম আড়ষ্টতা বা দ্বিধা ফোটানো নিষেধ।

'ঘোষিকাকে অবশ্যই হতে হবে দায়িত্ব সচেতন।' মালবিকার সঙ্গে একমত হলেন

আকাশবাণীর অভিজ্ঞ কর্মী শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি আছেন ঘোষিকার পদে। আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের। যৌবনে নাটক করার অভ্যাস ছিল। গারস্টিন প্লেসের অফিসে যেতেন সেই সূত্রেই। তারপর ষাটের দশকে আকাশবাণী যখন ইডেনগার্ডেনে স্থানান্তরিত হল, তখন প্রথমদিকে কিছু অস্থায়ী ঘোষক ঘোষিকা নিয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ এঁদের বেছে নেওয়া হয়েছিল নাট্য বিভাগ থেকেই। ফলে শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ পান। অবশ্য এই ব্যবস্থাটা চলেনি খুব বেশিদিন। একাত্তর সালে, তিনি আবার পরীক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে ঘোষিকার পদে নিযুক্ত হন। তখন থেকে আছেন এই পেশাতেই। তখনও লাগত, আজও ভাল লাগে নিজের কাজ।

শেফালি দেবী জানালেন যে, ঘোষক বা ঘোষিকার জন্য আলাদা কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই ঠিক কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয় অত্যন্ত খুঁটিয়ে। প্রথমত হয় লিখিত পরীক্ষা। তারপর থাকে 'ভয়েস টেস্টিং'। তবে চিরকালই আকাশবাণীর সহকর্মীরা খুব আন্তরিক। নবাগতকে নানাভাবে সাহায্য করেন তাঁরা। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রথম কাজে যোগ দেন তখন আকাশবাণী-কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাজী সব্যসাচী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরাদি, প্রমুখ। 'প্রথম দিনের কথা এখনও মনে আছে আমার। সন্ধ্যাবেলায় তৃতীয় অধিবেশনে পরিতোষ সেনের বেহালা ছিল। আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও খুবই নার্ভাস বোধ করছিলাম। সেই সময় কাজী সব্যসাচী ছিলেন পাশেই। তিনি বুঝতে পারেন আমার অবস্থা। তারপর যত্ন করে বুঝিয়ে দেন সমস্ত ব্যাপারটা। এমনকি, কি বলতে হবে সেটা লিখেও দেন। আমি শুধু দেখে দেখে পড়ি। পরে অবশ্য মনিটারিং শুনে বুঝতে পেরেছিলোম যে খারাপ কিছু হয়নি।' এখন যদিও কাজে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আকাশবাণীর ঘোষণার ধরাবাঁধা গৎ আছে। ঘোষক বা ঘোষিকা তার থেকে বেশি কিছু বলতে পারেন না, কমও নয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শেফালি দেবী নিজের কাজ নিয়ে করতে চান নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। কারুর ঘোষণা শুনে ভাল লাগলে, নিজেও চেষ্টা করেন সেইরকমটি করতে। কারণ তিনি জানেন যে কণ্ঠস্বরই তাঁর একমাত্র সম্বল—'ঘোষণার মধ্যে দিয়েই আমাদের প্রকাশ করতে হয় অনুষ্ঠানের মূল ভাব। আমি চাই আমার কথা যেন দর্শকদের চোখের সামনে একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে।'

দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হলেও মানুষ সবসময় নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে পারে না। অথচ ঘোষক বা ঘোষিকার অনেক সময় দীর্ণ হতে হয় এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বেও। কাজের দাবিকে মাথায় রেখে যন্ত্রের মত ভুলে যেতে হয় মনের বেদনা।

মালবিকা চক্রবর্তী : আকাশবাণীর ঘোষিকা

দায়িত্ববোধ আকাশবাণীর ঘোষক ঘোষিকার একটি আবশ্যিক গুণ। তাড়াহুড়ো করে কোন ভুল তথ্য যাতে না জানানো হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় তাঁদের। এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় আবহাওয়ার খবর' বলার সময়। কারণ বুলেটিনগুলি আসে ইংরাজিতে। সহজ বাংলায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে বলতে হয়। এই সংবাদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন উপকূলবর্তী জেলেরা। তাই সতর্ক থাকা একান্ত দরকার।

দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে এই দায়িত্ববোধ যে কত গভীরভাবে তাঁদের সত্ত্বায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, তার প্রমাণ শেফালিদেবী পেয়েছেন নিজের জীবনেই। ৭৭-র বন্যার সময়। ভয়ঙ্কর দুর্যোগ আর বৃষ্টিতে কলকাতা প্রায় অচল। সকালে কাজে এসেছেন তিনি—বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই। ছুটি হবে দুপুর দু'টোয়। কিন্তু ছুটি হল না। কারণ তাঁর বদলি কর্মী এসে পৌঁছাননি—অবশ্যই আসতে পারেননি। বিকেল—সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য ক্যান্টিনে খাবার দাবারও বিশেষ কিছু নেই। অবশেষে রাত্রি দশটার পরে তাঁর সহকর্মী এসে পৌঁছালেন প্রায় বুক জল ভেঙে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবার বাড়ির দিকে রওনা দেবেন। দুর্যোগের রাত বলে কর্তৃপক্ষ একটি গাড়িরও ব্যবস্থা করেছেন কর্মীদের জন্য। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কিছু দূর গিয়ে একটি গলির মুখে আটকে গেল গাড়ি, আর এগোল না। তারপর সেই অন্ধকার আর মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে সারা রাত বসে রইলেন গাড়িতে। শারীরিক কষ্ট তো ছিলই। আত্মীয়-পরিজনদের উদ্বেগ—উৎকণ্ঠারও অবধি ছিল না। কিন্তু তবু একবারের জন্যও মনে হয়নি যে দায়িত্ব ফেলে দুপুরেই চলে আসা উচিত ছিল।

দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হলেও মানুষ সবসময় নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে পারে না। অথচ ঘোষক বা ঘোষিকার অনেক সময় দীর্ণ হতে হয় এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বেও। কাজের দাবিকে মাথায় রেখে যন্ত্রের মত ভুলে যেতে হয় মনের বেদনা। যেমন শেফালি দেবীর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ছিলেন স্মৃতিকণা বোস। হঠাৎ একদিন অফিসে এসে শুনলেন সে মারা গেছে। প্রায় পনের বছর দু'জনে কাজ করেছেন পাশাপাশি বসে। মনের কথার আদান প্রদান হয়েছে বহুবার। অথচ সেদিন তাঁর এমারজেন্সি ডিউটি। অনেক সহকর্মী চলে গেলেও তিনি পারলেন না প্রিয় বান্ধবীকে শেষ দেখা দেখতে যেতে। চোখ জলে ভরে আসছে। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসছে তবুও মাইকের সামনে

অবিকৃত কণ্ঠে করে যেতে হল একটির পর একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানের ঘোষণা।

কলকাতার বহু মানুষ আজ পাতাল রেলে চড়ে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তাঁরা শুনতে শুনতে আসেন, 'দরজা বন্ধ করা হচ্ছে' পরবর্তী স্টেশন ভবানীপুর বা রবীন্দ্রসদন বা পার্কস্ট্রিট ইত্যাদি। মহিলা কণ্ঠের সুললিত, সপ্রতিভ উচ্চারণ। তাঁকে দেখেন না কেউ কিন্তু অনেকেই তাঁর কণ্ঠস্বরের অনুরাগী। মহিলার নাম প্রণতি মিত্র মুস্তাফী ঠাকুর। বেতার এবং দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দীর্ঘদিন। ভাল আবৃত্তিও করেন। কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা ফুটে ওঠে ব্যবহারেও। মেট্রোরেলের ঘোষিকার কাজটি করতে পেরে তিনি ভারি খুশি। অনুভব করেন যে কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে গেলেন চিরকালের জন্য। যতদিন মেট্রোরেলে যাতায়াত করবেন কলকাতার মানুষ ততদিনই স্মরণে রাখবে তাঁর কথা। আরও একটা ব্যাপার তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, 'পাতাল রেল ভারতের আর কোথাও নেই। তাই মানুষ এই ট্রেনের নিয়মকানুনের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। মেট্রোর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়েছি আমি। আমার ঘোষণা অনভ্যস্ত মানুষের যাতায়াতকে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে। এটা একটা খুব বড় অনুভূতি যা মনকে পূর্ণ করে দেয়।'

কোন বিশেষ দরকারে যদি কলকাতার অন্যতম পাঁচতারা হোটেল গ্র্যান্ডে ফোন করেন, তাহলে সম্ভাবনা থাকে একটি সুমিষ্ট সুললিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর শোনার। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এখানে টেলিফোন অপারেটরের কাজ করছেন মিষ্ট-ভাষিণী হেদার রেক্সন। কাজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি টেলিফোন অপারেটিং-এর কোর্স করেছেন। যদিও চাকরি পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানে, বিশেষ কয়েকটি টেকনিক্যাল বিষয় শেখানো হয়েছিল। কিন্তু সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। টেলিফোন অপারেটার তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তুলবেন হোটেলের আভিজাত্য। তাঁকে হতে হবে ধৈর্যশীল এবং দায়িত্ববান। চেষ্টা করতে হবে খদ্দেরদের যতখানি সম্ভব সাহায্য করার, বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না।

শ্রীমতী রেক্সন স্বীকার করলেন যে এই প্রশিক্ষণ তাঁর ব্যবহারিক জীবনে খুবই কাজে লেগেছে। পাঁচতারা হোটেলের অপারেটর হিসাবে ইংরাজিতে কথাবার্তা বলাই তাঁদের নিয়ম। কিন্তু কোন কোন সময় এমন অতিথি আসেন যাঁরা ভাল ইংরাজি বলতে বা বুঝতে পারেন না। তখন চেষ্টা করতে হয় যথাসম্ভব সহজ করে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার, আর ভাঙা ভাঙা ইংরাজিও ঠিকঠাক বুঝে নিয়ে কাজ করার।— 'কিছুদিন আগে আমাদের হোটেলে একদল জাপানী অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের নিয়ে খুবই মুশকিল হয়েছিল। টেলিফোনের লাইন তাঁরা চাইছেন, অথচ কত নম্বর, কোড নম্বর কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছেন না। খালি বলেন 'মুশি মুশি'। শেষকালে একজন দোভাষী ডেকে নিয়ে এসে তবে সমস্যার সমাধান করা গেল।' অনেকদিন কাজ করার ফলে শ্রীমতী রেক্সন এখন গলা শুনে অতিথির প্রকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারেন। অনেকেই খুব ভদ্রভাবে প্রয়োজনীয় লাইনটি ধরে দিতে বলেন। অনেকে আবার হন অভদ্র। লাইন না পাওয়া গেলেও অপেক্ষা করতে রাজি থাকেন না। বারবার অপারেটারকে বিরক্ত করেন—'এমন ভাগ্য জানেন, যাঁরা এরকম বাজে ব্যবহার করেন, তাদের লাইনটাই পাওয়া যায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। যাঁরা খুবই ভদ্র, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের লাইন পেতে অনেক সময়ই খুব দেরি হয়।'

কাজের পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কোনরকম অভিযোগ নেই হেদার রেক্সনের। তিনটে শিফটে কাজ করতে হয় তাঁদের—সকালে ৬টা-২টো, দুপুরে ২টা-১০টা আর রাত্রে ১০টা-৬টা। যারা দুপুরবেলায় কাজে আসেন, রাত্রি দশটার পর তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। অন্যসময় অবশ্য নিজেদেরই যাতায়াত করতে হয়।

শ্রীমতী রেক্সন স্বীকার করলেন যে এই প্রশিক্ষণ তাঁর ব্যবহারিক জীবনে খুবই কাজে লেগেছে। পাঁচতারা হোটেলের অপারেটর হিসাবে ইংরাজিতে কথাবার্তা বলাই তাঁদের নিয়ম। কিন্তু কোন কোন সময় এমন অতিথি আসেন যাঁরা ভাল ইংরাজি বলতে বা বুঝতে পারেন না। তখন চেষ্টা করতে হয় যথাসম্ভব সহজ করে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার, আর ভাঙা ভাঙা ইংরাজিও ঠিকঠাক বুঝে নিয়ে কাজ করার।

হেদার রেক্সন : গ্রান্ড হোটেলের টেলিফোন অপারেটর

অন্তরালে থেকে এভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে সাহায্য করে চলেছেন বহু নেপথ্যকণ্ঠদায়িনী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন তাঁরা। সংস্থার প্রকৃতি অনুসারে কাজের ধরনধারণও আলাদা। কিন্তু একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় সকলের মধ্যেই। তাঁদের চেতনায় টিকটিক করে ঘুরে চলে দায়িত্ববোধের কাঁটা। মানুষের ক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয় না তাঁদের। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন তাঁর একটি ছোট্ট ভুলের মাশুল গুনবেন হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। আর এই বোধই তাঁদের সচেতন রাখে। পরিবার এবং পটভূমিকে সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দিয়ে সাহায্য করে মূর্তিমান যান্ত্রিকের মত কাজে মনোনিবেশ করতে।

– দীপান্বিতা রায়

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

এ ক্স ক্লু সি ভ

কেবাং, মোরাং, রাশেং : আদি উপজাতিদের গোপন কথা

সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যরতা আদি যুবতীরা

অরুণাচল প্রদেশের মিয়াং জেলার আদি বা অবর উপজাতিদের অদ্ভুত আদিম জীবন ধারা ও রহস্যময় যৌনজীবনের অজানা জগতের তথ্য ও ছবিসমৃদ্ধ এই লেখ্যদলিলটি আলোকপাতের একান্ততম প্রতিবেদন হিসেবে পেশ করা হল গবেষক প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে।

জেন্না ! জেন্না !

দুটি অপরিচিত শব্দ গভীর রাতে প্রতিধ্বনি তোলে পাহাড়ে পাহাড়ে। মানে বুঝতে না পেরে নেমু সাহেবের মুখের দিকে তাকাই। অপং (ধেনো মদ) খেয়ে বুঁদ হয়ে আছেন নেমু সাহেব। আধ বোজা চোখ তুলে বলেন, কেবাং এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে।

জেন্না আমার কাছে যতখানি লাতিন—কেবাংও ঠিক ততখানি গ্রীক।

গ্রামের নারী—পুরুষ সমস্বরে জবাব দেয়, জেন্না! পাহাড়েরকোলে গ্রাম। পাশে উপল ভাঙা নিম্নগামী সুবনসিঁড়ি। অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার জীবন—রেখা। ডিহিং এর মত ব্রহ্মপুত্রের আর একটি শাখানদী।

গ্লাসে অপং ঢেলে নেমু সাহেব বলেন, ভয় পাচ্ছেন ?

—ভয় ? মোটেই না বরং কৌতূহল বাড়ছে।

—কৌতূহল বাড়লেই আপনাকে মসুপ আর রাশেং এর গল্প শোনাব। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত এগারটা। রাত গভীর না হলে, নেমু সায়েব গল্পের মুড পান না। তিরাপের মিয়াও শহরে গভীর রাতে ক্যাপ্টেন ব্যাগলের প্রেমের কাহিনী শুনিয়েছিলেন তিনি। প্রায় দেড়শ' বছর আগের সেই অবৈধ প্রেমের কাহিনীর কথা মানুষ

ভুলে গেলেও নোয়াডিহিং এর স্রোতে তার স্মৃতি এখনও ভেসে চলেছে।

নামডাফায় পরিচয় হয়েছিল নেমু সাহেবের সঙ্গে। অরুণাচলের খামতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ প্রেমজিৎ নামচুক। সংক্ষেপে আমার কাছে নেমু সাহেব। নামডাকা অভয়ারণ্যে চাকুরি করলেও–রাজ্যের নৃ–তত্ত্ব, ভূ–তত্ত্ব আর প্রত্নতত্ব নিয়ে অবসর সময়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন নেমু সাহেব। আদিবাসীদের জীবন চর্চা তাঁর পেশা না হলেও এক অনতিক্রমনীয় নেশা। এই নেশাই তাঁকে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তিরাপের ওয়ানচু আর দুর্ধর্ষ কোনিয়াতের সমগোত্রীয় নক্‌টেরাও তাঁর যেমন বন্ধু তেমনি মোন–ইয়ুলের মোন্‌–পা আর কামেং জেলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নোরডুকাপেন তাঁর আত্মীয়। এক ঢোক অপং খেয়ে নেমু সাহেব বলেন, জেন্না মানে ছুটি ইংরাজিতে আপনারা যাকে বলেন হলিডে।

–ছুটি তো বুঝলাম। কিন্তু কেবাং কে ?

অপং এর প্রভাবে নেমু সাহেবের চোখ আধ বোজা হয়ে এলেও কথার মধ্যে কোন জড়তা আসেনি। নেশায় কখনো তাঁর কথা জড়িয়ে যায় না। আমি কোনদিন নেমু সাহেবকে মাতাল হতে দেখিনি।

নেমু সাহেব বলেন, কেবাং কারো নাম নয়। আদিদের একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পঞ্চায়েতের মত। এই কেবাং হল আদিদের সংহত রাখার শক্তি। মেল বন্ধনের রাখি। কেবাং–এ যেমন আদালতের কাজও হয়–তেমনি কেবাং এর সদস্যারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। কেবাং পরিচালন পর্ষদ গঠিত হয় ভোটের মাধ্যমে। গ্রামের সব বয়স্ক মানুষই কেবাং এর সদস্য। মহিলারা কেবাং এর সদস্য হতে পারে না। তবে তাঁদের অভাব অভিযোগ তাঁরা নিজেরাই কেবাং এর সামনে উপস্থিত করতে পারে। কেবাং এর রায় সর্বসম্মত–তার কোন নড়চড় হবে না।

নেমু সাহেব থামেন। অবর হিসসে গভীর রাতের নৈঃশব্দ্য। শুধু উপল ভাঙা শব্দ তুলে সুবনসিঁড়ি বয়ে চলেছে। সুবনসিঁড়ির ধারেই আমাদের বাংলো। বহুদিনের পুরানো। অনেকদিন সংস্কার হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর ছাপ এখনও স্পষ্ট।

–সব সিদ্ধান্তই কি এমন করে গভীর রাতে জানানো হয় ?

–সব নয়; গভীর রাতের সিদ্ধান্ত গভীর রাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়। আজ যেমন সিদ্ধান্ত হল আগামী কাল ছুটি–হলি ডে। হয়ত অবস্থা বুঝে আগামী কাল সিদ্ধান্ত হবে–সব মেয়েরা জুমে যাবে–মাঠের কাজ করবে। ছেলেরা ঘরে থাকবে।

–মেয়েদের মাঠে পাঠিয়ে, ছেলেরা ঘরে থাকবে, এ কেমন সিদ্ধান্ত ?

নেমু সাহেব মৃদু হেসে বলেন, আজ আর এ সব কথা বলব না। আপনাকে যা দেখাতে নিয়ে এসেছি–সেই মসুপ আর রাশেং এর কথা বলব।

বিয়ের সাজে শ্যালং যুবক

দিগারু সুন্দরী

–মসুপ আর রাশেং !

আমি জানি, নেমু সাহেবকে দিয়ে জোর করে কিছু বলানো যাবে না। নিজের খেয়াল–খুশি মত যা বলবেন, নীরবে তা শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নেমু সাহেব বলেন, আপনাকে মসুপ আর রাশেং দেখাবার জন্যেই আদি বা অবরদের রাজত্বে এসেছি।

–আগে বলুন, মসুপ কি আর রাশেংই বা কাকে বলা হয় ?

–ঠিক কথা! শব্দ দুটি আপনার কাছে অপরিচিত বলেই আপনার অসুবিধা হচ্ছে। মোরাং শব্দটির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আদিরা সেই মোরাংকে বলে মসুপ। অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষদের শয্যাধাম! বলেই হেসে ওঠেন নেমু সাহেব। বলেন, রাশেং হল কুমারী মেয়েদের শয়নাগার।

–শয্যাধাম আর শয়নাগার! চমৎকার প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন তো !

নেমু সাহেব বলেন, প্রতিটি উপজাতির মধ্যে মোরাং ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সকলেরই প্রায় এক। অথচ কেউ কাউকে চেনে না। নীলগিরির উপজাতির সঙ্গে কামেং এর উপজাতির কোনদিন দেখা হয়নি। সম্ভবত পরস্পরের অস্তিত্ব অজানা। কিন্তু তাঁদের জীবন চর্চায় আমরা এক বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাই।

নেমু সাহেবকে প্রশ্ন করতে হয় না। প্রশ্ন করলে উনি বিরক্তবোধ করেন। আপন মনেই বলতে ভালবাসেন। তার বলার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস থাকে না। থাকে বলিষ্ঠ বক্তব্য। যার জন্য শ্রোতাকে বড় একটা প্রশ্ন করতে হয় না।

বাইরে গভীর অন্ধকার। পাহাড়ের অস্তিত্ব অন্ধকারে আবৃত। নিশুতি রাতে সকলেই নিদ্রামগ্ন। জেগে আছি আমরা দু' জন আর সুবনসিঁড়ি। সুবনসিঁড়ি কখনো ঘুমোয় না। ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে জন্ম নিয়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর বয়ে চলেছে। এক লহমার জন্য থামেনি–ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম নেয়নি। সেই সুবনসিঁড়ির দিকে তাকিয়ে নেমু সাহেব বলেন, কুমারী মেয়েদের জন্য আলাদা শয়নাগারের ব্যবস্থা দক্ষিণের নীলগিরিতে যেমন আছে তেমনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে একই ব্যবস্থা রয়েছে। নামের পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নাগারা যাকে বলছে মোরাং অবরদের ভাষায় তাই হল মসুপ।

মধ্যপ্রদেশের বস্তারে তাকেই বলা হয় ঘটুল।

ঘটুলে রাত কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবার আপনার দৌলতে মসুপ আর রাশেং দেখা যাবে। নেমু সাহেব বলেন, আমার দুর্ভাগ্য, অরণ্যের অগ্নিশিখা মুড়িয়াদের ঘটুল আমার দেখা হয়নি। শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে মুড়িয়াদের ঘটুল একটা বিশিষ্ট নাম। তার বৈশিষ্ট্য সর্বদেশে প্রশংসিত। সময় ও সুযোগ পেলে, অবশ্যই ঘটুল দেখে আসব।

বলি, ঘটুলে তো অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকে।

অরুণাচলে সে ব্যবস্থা নেই।

নেমু সাহেব বলেন, না এখানে ছেলে মেয়ে আলাদা থাকে।

বাপুর দৃষ্টিতে

আগামী দিনের পৃথিবী
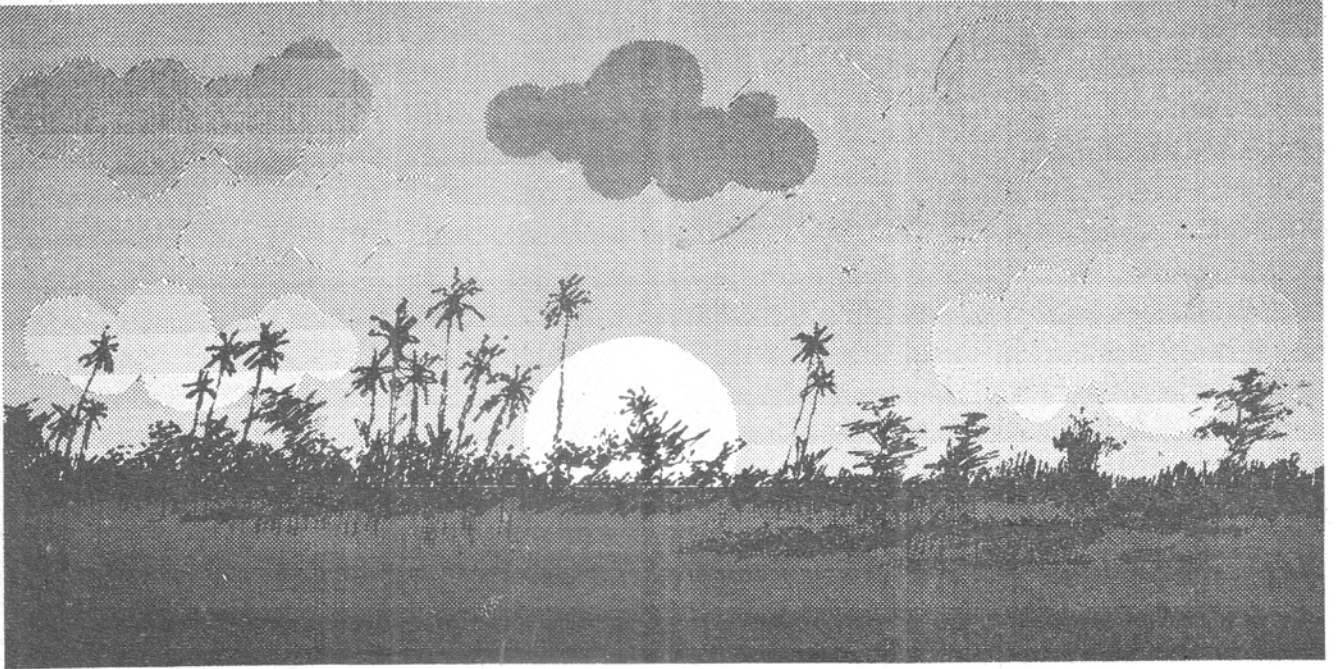
"আগামী দিনের পৃথিবীতে অহিংসা ভিত্তিক এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে এবং গড়েও উঠবে। সেটাই হবে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতি। আর তার মাধ্যমেই অন্য সব কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতিদের অহিংসার পথকে গ্রহণ করতেই হবে — কারণ সেটাই হল ভালবাসার পথ।

এটা করা হলে আগামী দিনের বিশ্বে কোন দারিদ্র, কোন যুদ্ধ, কোন বিপ্লব এবং কোন রক্তপাত দেখা যাবে না।"

শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রগতি

davp 91/387

মসুপে মেয়েরা যেতে পারে না। কিন্তু রাশেং–এ ছেলেদের রাত কাটাতে কোন বাধা নেই।

–এ আবার কেমন ব্যবস্থা ? মেয়েরা মসুপে আসতে পারবে না, অথচ ছেলেদের রাশেং–এ যেতে বাধা নেই। তাহলে তো সব ছেলেই রাশেং–এ যাবে। মসুপ তো খালি পড়ে থাকবে। তাই না ?

আমার প্রশ্ন নেমু সাহেবকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন হয়ত মনে মনে একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। বলি, তাহলে রাশেং তো ঘটুল হয়ে যাবে!

নেমু সাহেব স্বীকার করেন। বলেন, আপনার প্রশ্নের যোগ্য জবাব আমি এই মুহূর্তে দিতে পারছি নে। কেবাং–এ এই নিয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আমার প্রশ্নের জবাব মিলুক আর নাই মিলুক অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা শয়নাগারের ব্যাপক ব্যবস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সেই নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত আছে। কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা শিথিল হয়ে এলেও–মিজো, নাগা, লালুং, মিকির, গারো এবং লিঙ্গম খাসিদের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য সামুদায়িক শয়নাগারের ব্যবস্থা আছে।

নেমু সাহেব বলেন, বিহারের মাল পাহাড়িয়া, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ও বিরহরদের মধ্যে সামুদায়িক শয়নাগারের প্রচলন বর্তমান। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর পৃথক শয়নাগারের ব্যবস্থা কবে থেকে শুরু হয়েছে, সে ইতিহাস নেমু সাহেবের জানা নেই। বনদপ্তরে চাকুরি করলেও স্বজাতি স্বগোত্রের জীবন–চর্চার উৎস সন্ধানে তিনি একজন অক্লান্ত সমীক্ষক। কোন প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করতে পারেন নি সত্য, তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে। নব্য প্রস্তর যুগে প্রাকৃতিক গুহাকে মানুষ বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করেছে। খাসি জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে প্রাকৃতিক গুহা নেমু সাহেব দেখেছেন। অরুণাচলের গিরি কন্দরে খুঁজলে এরকম অনেক গুহা পাওয়া যাবে তাঁর পূর্বজরা গুহার অভ্যন্তরে সামুদায়িক জীবন-যাপনই করত। হয়ত সামুদায়িক শয়নাগারের ব্যবস্থা সেই যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। কালক্রমে কিছু পরিমার্জিত রূপে আজকের ব্যবস্থায় এসে ঠেকেছে।

নেমু সাহেব বলেন, মানুষ, মসুপ ও রাশেং এর বয়স সমান। যখন এই অঞ্চলের নাম ছিল মহাকান্তার, তখনও সামুদায়িক শয্যাধাম ছিল। রামায়ণের যুগে–এ অঞ্চলের নাম হল ধর্মারণ্য, তখনও এই শয়নাগার বিধি কার্যকর ছিল। মহাকান্তার আর ধর্মারণ্যের লিখিত ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু প্রাগ–জ্যোতিষপুরের ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীরাও অবিবাহিত যুবক যুবতীর জন্য আলাদা

অবর দম্পতি

শয়নাগারের ব্যবস্থা রেখেছিল। নেমু সাহেবর যুক্তির যথার্থ চ্যালেঞ্জ করার বিদ্যা–বুদ্ধি আমার নেই তাই তাঁর সব কথা নির্বিবাদে মেনে নিতে হয়। নেমু সাহেবকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের রাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। বলি, আপনি বর্তমান মসুপ আর রাশেং এর কথা বলুন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে আপনাদের যুবক যুবতীরা এই ব্যবস্থাকে কতখানি সম্মান দিচ্ছে ?

নেমু সাহেব বলেন, পূর্বপুরুষেরা যতখানি সম্মান দিয়েছে–উত্তর পুরুষেরা ততখানি সম্মান দিয়ে চলেছে। কারণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা শুধু জৈবিক শিক্ষা পায় না–জীবনের শিক্ষাও নেয়। আমার ইঙ্গিতে দুঃখ পান নেমু সাহেব। বলেন, আপনারা যারা বাইরে থেকে মসুপ বা মোরাং আর রাশেং এর কথা শুনতে আসেন, তারা ধরেই নেন যে, এসবের মধ্যে যৌনতার বাড়বাড়ি রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। চুপ করে নেমু সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। রাতের গভীরে পাহাড় নিঃঝুম। সুবনসিঁড়ি আপন মনে বয়ে চলেছে। বন্য প্রাণীর বিচিত্র আওয়াজে গভীর রাতের স্তব্ধতা চমকে ওঠে। নেমু সাহেব বলেন, অস্বীকার করব না, যুবকযুবতীর যৌন রহস্যের উন্মেষ ধীরে ধীরে এখান থেকেই ঘটে। নারী–পুরুষের জৈবিক চেতনা–দৈহিক মিলনে রূপান্তরিত হয়। শুধু কামনার আগুনে অন্তর খাক হয় না-বন্ধনের মন্থনে অমৃতের স্বাদ পায়।

আদি ও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা অনেক ভেবে চিন্তে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন।

কালের বিবর্তনে বার বার পরীক্ষিত এই ব্যবস্থা উপজাতিদের সামাজিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের অনুরাগ ও দায়িত্ব বাড়িয়েছে। যুবক যুবতীর নৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। তাই মসুপ বা মোরাং আর রাশেং আদি সমাজের গর্বের বস্তু।

মসুপ আর রাশেং থেকে জৈবিক শিক্ষা নেবার ফলে উপজাতি যুবক-যুবতী যৌন যন্ত্রণায় ভোগে না। তাই প্রায় নগ্ন দেহী যুবতী নির্ভয়ে পথ চলে, পুরুষের পাশাপাশি একসঙ্গে জুমে কাজ করে। ধর্ষণের ঘটনা উপজাতিদের মধ্যে বিরল। অথচ-বলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থামেন নেমু সাহেব। তাঁর চোখ দেখে বুঝতে পারি, তিনি তথা-কথিত সভ্য সমাজের প্রতি একটা ইংগিত করছেন।

বিনা প্রতিবাদে মেনে নিই-ধর্ষণের ঘটনা বর্ত-মানে আমাদের সমাজে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

নেমু সাহেব বলেন, মোরাং আর রাশেং থেকে যুবক যুবতীরা সহবত শিক্ষা পায়। হিংসার পরিবর্তে ভালবাসার পাঠ নেয়। মোরাং তাদের রিরংসু হতে শিক্ষা দেয় না। তাই মোরাং আর রাশেং প্রতিটি উপজাতির কাছেই দেবস্থানের মতই পবিত্র।

অপংএর প্রভাবে নেমু সাহেবের কপোল-স্বেদ-সিক্ত হয়ে ওঠে। হাড় কাঁপানো শীতেও গা থেকে কোট খুলে ফেলেন। আর ফায়ার প্লেসের পাশে বসেও আমার হাঁটু দুটো ঠিক থাকে না।

নেমু সাহেব বলেন, সিয়াং-এ বরফ পড়ে না। বরফ যদি দেখতে চান তাহলে আপনাকে যেতে হবে-পশ্চিমে তাওয়াং-এ অথবা রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণে বার্মা সীমান্তে তিরাপে। অবশ্য সেখানে আপনাকে আমি কয়েকবার নিয়ে গেছি।

সুবনসিঁড়ির তরঙ্গের শব্দে রাতের গভীরতা বুঝতে পারি। বাধা বিহীন একটানা শব্দ। দিনের কোলাহলে এ শব্দ বড় বেশি কানে বাজে না। দিনের মৃত প্রায় সুবনসিঁড়ি যৌবনোন্মত্ত হয়ে ওঠে রাতে।

নেমু সাহেবের বাইরে খাবার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। জানালা খুলতেও বারণ করি।

-আপনি বরং পানীয় খাওয়া বন্ধ করুন।

নেমু সাহেবের ঠোঁটে মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, তাহলে আর আপনাকে মসুপ আর রাশেং এর গল্প বলতে পারব না। পান না করলে তাঁর প্রাণ তাজা হয় না। নিস্তেজ প্রাণ নিয়ে আদৌ গল্প করতে পারেন না নেমু সাহেব।

নেমু সাহেব বলেন, যা বলছিলাম, মোরাং আর রাশেং প্রতিটি উপজাতির কাছে দেবস্থানের মতই পবিত্র। বিভিন্ন উপজাতির কাছে মসুপ বা মোরাং বিভিন্ন নামে পরিচিত। অবররা বলে মসুপ, পদমদের কাছেও তাই। কিন্তু মিনংসরা মোরাংকে বলে 'দেড়ে'। মিলাং আর তাদের সম-গোত্রীয়েরা বলে মাপটেক। বরিস ও আশিংরা বাংগো। যে যে নামেই ডাকুক, মোরাং ও রাশেং এর উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

জিজ্ঞাসা করি কেবাং এর সঙ্গে মোরাং বা মসুপের

মিরি তীরন্দাজ

ওয়ান্‌চু যোদ্ধা

কি সম্পর্ক? নেমু সাহেব বলেন, মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের যে সম্পর্ক-কেবাং এর সঙ্গে মোরাং এর সম্পর্ক সেই রকম।

মোরাং আর রাশেং বুঝতে কেবাং সম্পর্কে দু'চার কথা আপনাকে বলা দরকার।

নেমু সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওয়াংসু ওয়াং-সায়। একদা মস্তক শিকারী ওয়ানচু বা বনকেরিয়া নাগাদের চিরাচরিত নির্বাচিত গ্রামীণ পরিচালন পর্ষদ। ওয়াংসু ওয়াংসায় একদিকে যেমন গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের সামুদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তেমনি অপর দিকে গ্রামের শৃঙ্খলা রাখার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক অপরাধ থেকে শুরু করে জমি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা এই ওয়াংসু- ওয়াংসা থেকে হয়। নেমু সাহেব বলেন, অবরদের কেবাং সেই একই নীতি অনুসরণ করে। এটা হচ্ছে গ্রামের মানুষদের নির্বাচিত ও পরিচালিত গ্রামীণ সরকার। এই সরকারের আদেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তেমনি সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগ আনতে পারেনি।

নেমু সাহেব বলেন, বিভিন্ন উপজাতিরা মসুপে ও রাশেংকে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করে-তেমনি গ্রামীণ সরকারেরও বিভিন্ন নাম আছে। আপনি তো ওয়ান্‌চুদের ওয়াংসু-ওয়াংসা দেখে এসেছেন। এবার অবর বা আদিদের দেখবেন কেবাং। যদি কোনদিন সুযোগ পাওয়া যায়, মোন্-পাদের 'টরজেন'-এ নিয়ে যাব। ইচ্ছে করলে আপনি শেরডুকাপনদের জুং দেখে আসতে পারেন। অ্যাকাচ্‌রা গ্রামীণ সরকারের নাম দিয়েছে 'মেলে' আর আপাতানিরা তাকেই বলে 'বুলিয়াং'। নেমু সাহেব একটু থামেন। এক ঢোক অপং গলায় ঢেলে আধবোজা চোখে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে থাকেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ভীষ্মকনগর গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ইদু মিশমী-দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

-হ্যাঁ। বেশ কয়েকদিন মিশমী গ্রামে ছিলাম।

নেমু সাহেব বলেন, কেবাংকে ইদু-মিশমীরা বলে আবালী। কামান মিশমীরা বলে ফারাই।

জিজ্ঞাসা করি, আপনারা অর্থাৎ খাম্‌তিরা কি বলেন।

-মোকচুপ্।

-মোকচুপ্!

নেমু সাহেব বলেন, নামে কিছু আসে যায় না। যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলের উদ্দেশ্য এক।

মনে হয় রাত শেষ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে। সূর্যোদয়ের রাজ্য অরুণাচল। ভোরের সূর্য সর্বপ্রথম এই রাজ্যকেই চুম্বন করে। সবুজ পাহাড়ের গায়ে সূর্যের সোনালি আলো এই রাজ্যেই প্রথম উদ্ভাসিত হয়।

নেমু সাহেব বলেন, ভোর হবার আগেই মোরাং আর রাশেং এর গল্প শেষ করব।

আজকাল-নৃতাত্ত্বিকেরা ঘটুল, মোরাং ও রাশেং নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। কবে এবং কেমন করে এই ব্যবস্থা শুরু হল, তার আদি তথ্য খুঁজতে শুরু করেছেন। ভারতীয় মানব-বিজ্ঞানীরা যা শুরু করেছেন বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী পর্যটক ও প্রশাসকেরা তাই শুরু

করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। হয়ত বা তার কিছু আগে থেকেই। মূলত মসুপ মোরাং আর রাশেং এর কাহিনী আমরা তাদের মুখ থেকেই আগে শুনতে পাই। কম–বেশি প্রত্যেকেই শুধু আদিদের জীবন–চর্চা কাছে থেকে সমীক্ষা করেন নি, তাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক জীবন–এমন কি জৈবিক জীবনের খুঁটি–নাটিও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদেরই প্রদর্শিত পথে আজ-কের নৃ–তাত্ত্বিকেরা এগিয়ে চলেছেন। নিষিদ্ধ সীমান্তে রাজ্যের অনেক অজানা কাহিনী প্রথমে আমরা তাদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। সেই জানবার আকাঙ্ক্ষা এখনও সমানভাবেই চলেছে।

নেমু সাহেব বলেন, এর জন্য অনেক ব্রিটিশ পর্যটক ও প্রশাসককে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে বসে আছি –এটা হল পদমদের 'রাজ্য'। আদিদের একটি উপশাখার নাম পদম।

অবরদের কথা প্রথম শুনিয়েছিলেন সম্ভবত এক পাদরি। তার নাম ফাদার ক্রিক। ১৮৫৪ সালে এই অবর পাহাড়ে এসেছিলেন। অবরদের মসুপ নিয়ে তিনিই প্রথম মন্তব্য করেছিলেন। মসুপকে একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পদমদের রাজত্ব থেকে তিনি যাচ্ছি-লেন মিশমীদের রাজ্যে। কি হয়েছিল আমরা জানি না। কোথাও সে কাহিনী লেখা নেই। মিশমীরা ক্রীককে হত্যা করেছিল।

–হত্যা।

নেমু সাহেব বলেন, ইতিহাস তো সেই কথাই বলে। তবে হত্যার কারণ আজও অজ্ঞাত।

কারও কারও ধারণা, ফাদার ক্রীকের পূর্বেও মসুপ আর রাশেং–এর বিবরণ সংগ্রহের জন্য উইল-কক্স আর নিউফভিনে এই দু'জন বন-জঙ্গল-পাহাড় অতিক্রম করে অবর হিল্‌সে পৌঁছেছিলেন। সন তারিখ কারো জানা নেই। এই দুই সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তারও কোন দলিল প্রমাণাদি নেই। সম্ভবত পর্যটক হিসাবেই তাঁরা দুর্গম অবর পাহাড়ে গিয়ে-ছিলেন। ডালটন অর্থাৎ ই.টি ডালটন ১৮৫৫ সালে অবর পাহাড় পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকেই ইউলকক্স–আর নিউফভিনের কথা জানা যায়। এই দু'জনেই মসুপে অবরদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। অবরদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এই দুই সাহেব। ডালটন সাহেবও অবরদের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি মসপু আর রাশেং এর পূর্ণ বিবরণ লিখেছেন।

কেবাং এর অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কেবাং পরিচালকদের সভা পরিচালনা পদ্ধতিকে তিনি 'আধুনিক' বলে মনে করেছেন। কেবাং–এ সকলের বলার অধিকার আছে। কোন কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটলেও মনান্তর তাঁর নজরে আসেনি। পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত হয় কেবাং। গ্রামের মাঝখানে নির্মিত মসুপেই কেবাং–এর

অতিথি সেবায় মোনপা যুবতী

জঙ্গল থেকে নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। একটা পাখির অদ্ভুত ডাক শুনে নেমু সাহেব বলেন, পূব আকাশে সূর্য উঠতে এখনও এক ঘন্টা বাকি।

রাশেং–এ খাবার প্রস্তুতি

অধিবেশন বসে। নেমু সাহেব বলেন, সব উপজাতি-দেরই মসুপ বা মোরাং গ্রামের ঠিক মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত। বেশ একটু ফাঁকা জায়গায়। কিন্তু রাশেং থাকে সকলের দৃষ্টির গোচরে। গ্রামের প্রধানের বাড়ির কাছাকাছি। সম্ভবত নিরাপত্তার খাতিরেই তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আয়তনে কিছু বড়, কিন্তু আকৃতিতে মসুপ সাধারণ বাড়ির মত। গ্রামের মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী মসুপের আয়তন নির্ধারিত হয়। অন্তত শ'চারেক লোক একসঙ্গে বসতে পারে, প্রতিটি মসুপ বা মোরাংএ এরকম ব্যবস্থা থাকে। লোক সংখ্যা বেশি হলে মসুপের আয়তন বড় করা হয়। প্রতিটি মসুপ বা মোরাং আদিদের নিজেদের সংস্কৃ-তিতে সজ্জিত। আয়তন অনুসারে ফায়ার প্লেস রাখা হয়। শীত বলেই এই ব্যবস্থা। আমার অস্থিরতা দেখে নেমু সাহেব নিজেই মনে করিয়ে দেন, ভয় নেই আপনার, ভোর হবার আগেই মোরাং আর রাশেং এর গল্প আমি শেষ করব।

জঙ্গল থেকে নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। একটা পাখির অদ্ভুত ডাক শুনে নেমু সাহেব বলেন, পূব আকাশে সূর্য উঠতে এখনও এক ঘন্টা বাকি।

শাখিটার নাম জানতে ইচ্ছে করে। নেমু সাহেব বলেন, পাখিটার একটা স্থানীয় নাম আছে (নামটা সেই সময় নেমু সাহেব বলেছিলেন, এখন মনে করতে পারছি না) দেখতে খানিকটা বন মোরগের মত। তার ডাক থেকেই গাঁয়ের মানুষ বুঝতে পারে, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠবে। রাশেং এ মেয়েরা আড়মোড়া ভাঙবে। পাশে ঘুমন্ত রাত্রির সহচরকে জাগিয়ে দিয়ে নিজেও ঘরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে। সূর্য ওঠার প্রাক্কালে তারা রাশেং ছেড়ে ঘরে ফিরে যায়।

মসুপেও এর ডাকে সকলের ঘুম ভাঙে। ওই পাখিটাই তাদের এলার্মের কাজ করে।

নেমু সাহেব বলেন, আমি তাই পাখিটার ইংরাজি নামকরণ করেছি অ্যালার্ম বার্ড। নামটা আপনার ভাল লাগছে না ?

—চমৎকার। ওয়াণ্ডারফুল ! পাখিটার স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছেন। বনের পথে, যদি চোখে পড়ে, পাখিটাকে একবার দেখিয়ে দেবেন।

আবার মসুপ আর রাশেং এর কথায় ফিরে আসেন নেম সাহেব। বলেন, বার বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলে মোরাং এর সদস্য হতে পারে। অবশ্য তাকে বয়োজ্যেষ্ঠদের অধীনে থাকতে হবে। যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের শিক্ষানবিশী করতে হয়।

নেমু সাহেবের কথায় আমার মুড়িয়াদের ঘটুলের কথা মনে হয়। সেখানেও অল্পবয়সী ছেলে–মেয়েরা বড়দের হেপাজতে থাকে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়। জীবনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৌন–জীবনের রহস্যও তারা জেনে যায়।

নেমু সাহেব ঠিকই বলেছেন, উত্তরের উপজাতির সঙ্গে পূবের উপজাতির কোনদিন দেখা হয়নি। অথচ সমাজ ব্যবস্থায় অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটুলে শৃঙ্খলা শিক্ষা ও রক্ষার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে না। মসুপ রাশেং–এ থাকে একাধিক বয়স্কা মেট্রন।

ছোটরা শিক্ষা শুরু করে ফায়ার প্লেসের জন্য কাঠ সংগ্রহ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বেড়ে যায়। সমাজের প্রতি কর্তব্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তাকে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কেবাং বা ওয়াংসু–ওয়াংসা থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মসুপ বা মোরাং এর ছেলেরা গভীর রাতে দল বেঁধে গ্রামের মানুষকে তা চিৎকার করে জানিয়ে দেয়। সেরকমই একটা চিৎকার আপনি শুনেছিলেন, জেন্না ! মানে আজ সকলের ছুটি।

গ্রাম রক্ষা থেকে আরম্ভ করে পূজা পার্বণ ও উৎসবে মসুপ আর রাশেং এর ছেলে মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবাং–এ শুধু সিদ্ধান্ত হয়, সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করে মসুপ আর রাশেং এর সদস্যরা। তাদের জীবনের জিজ্ঞাসার জন্ম হয় সেখানে। সেখান থেকেই তারা জিজ্ঞাসার জবাব পায়। যৌন জীবনের রহস্য অতি সন্তর্পণে মনের সত্তায় অমৃতের সন্ধান দেয়। সেই অমৃতের সন্ধানে মসুপ থেকে যুবকেরা চলে যায় রাশেং–এ। আর ভয় মিশ্রিত এক আনন্দের জোয়ারে ঘর থেকে যুবতীরা ভেসে আসে রাশেংএ। অদৃশ্য হৃদয় অনুভূতির প্রাবল্যে ঊর্মি মুখর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার সম্মোহন ও তৃতীয় যামের উন্মাদন অবশেষে গভীর রাতে মৈথুনে মিলিয়ে যায়।

নেমু সাহেব আসেন। রাতের শেষ প্রহরে তিনি আর অপং পান করেন না। বোতলের তলানিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন ! সুবনসিঁড়ির জলে মিশে অপং এর অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়।

নেমু সাহেব বলেন, আমাদের গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এবার আমরা শুধু রাশেং এর কথা বলব। মাঝে মাঝে হয়ত মোরাং এর সঙ্গে একটা তুলনা এসে যেতে পারে।

নেমু সাহেব বলেন, রাশেং কে আপনি ইংরাজিতে বলতে পারেন, লেডিস ক্লাব। কোন কোন নৃ–তাত্ত্বিক নাম দিয়েছেন ভার্জিন হাউস।—বাংলায় কুমারী আলয় বললে কেমন হয় ?

নেমু সাহেব হেসে বলেন, টাকার এপিঠও টাকা, ওপিঠও টাকা। আপনার ভাষায় উপজাতিদের মধ্যে কুমারী আলয়ের প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। পৃথিবীর অনেক বিবর্তনের পরেও তাদের অস্তিত্বে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি।

ভারতের সব উপজাতির মধ্যেই আলাদা কুমারী শয্যাধামের সংস্থান রয়েছে। কিছু রকমভেদ থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশাদৃশ্য নেই।

নেমু সাহেব বলেন, আপনি নিশ্চয়ই র‍্যাং ব্যাং এর নাম শুনেছেন ? নিশ্চয়ই আপনি সেলাঙ্গি-ডিঙ্গোজ এর কথা জানেন ? অবাক হয়ে অজ্ঞের মত নেমু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এ দুটি শব্দই আমার কাছে অজানা। আর অজানা বলেই জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমার অজ্ঞতা নেমু সাহেবের চোখ এড়ায় না। তিনি বলেন, র‍্যাং ব্যাং হল আলমোড়া–গাড়োয়াল এলাকার ভাটিয়াদের কুমারী আলয়। উড়িষ্যার বঁদোদের মধ্যে রয়েছে সেলাঙ্গি ডিংগোজ। এটাও কুমারী শয়নাগার। কুমারী শয়নাগার থেকেই প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এখান থেকেই শুরু হয়, মন দেয়া–নেয়ার পালা।

যৌন রহস্যের উন্মোচন হলেও যৌনতার বাড়াবাড়ি এখানে নিষিদ্ধ। রাশেং–এ একজন বয়স্কা পরিচালিকা থাকেন। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকে কয়েকজন সহকারী। এই সহকারীগণ লক্ষ্য রাখেন, যৌন–জীবনের নিয়ম কানুন ও বিধি–নিষেধগুলো কেউ যেন না ভাঙে।

একটু চুপ করে থেকে নেমু সাহেব আবার বলেন, যৌন উত্তেজনা সব সময় সংযত রাখা যায় না। মাঝে মাঝে দু'একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে। কোন কোন যুবতী অসাবধানতার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়।

—সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কি সেই ছেলে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয় ?

—সেটাই নিয়ম এবং সামাজিক বিধি।

—কোন ছেলে যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে ?

—এরকম ঘটনা বিরল। যদি কেউ করে কেবাং-এ তার বিচার হয়। শাস্তিও সে পায়। এমন কি গ্রাম থেকে তাকে বহিষ্কার করেও দেওয়া হয়।

—সে সন্তান কি অবৈধ ?

—আদিরা কোন সন্তানকে অবৈধ মনে করে না। মেয়েটির উপরও কোন সামাজিক বিড়ম্বনা নেমে আসে না। যে ছেলে তাকে বিয়ে করবে —সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হবে সে।

নেমু সাহেব থামেন। অপং এর প্রভাব কেটে গেছে। চোখ–মুখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বলেন, আপনাকে আর একটা জিনিস বলা হয়নি।

—কি ?

নেমু সাহেব বলেন, উঁচু এলাকায় যে সব অবরেরা থাকে তারা বলে রাশেং। নিম্নভূমিতে যারা বসবাস করে–সেই রাশেংকে তারাই বলে পুনাং। তবে নিয়ম কানুন আর উদ্দেশ্য এক। এই পুনাং–এ প্রতি আগস্ট–সেপ্টেম্বরে একটি উৎসব হয়। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবের নাম পুনা। অর্থাৎ উর্বরা। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা এই উৎসবে বড় বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

অরুণাচলের সব উপজাতির মধ্যে আলাদা কুমারী শয়নাগারের ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণে তিরাপে নক্টে ও ওয়াংচুদের মধ্যে যেমন রয়েছে আলাদা কুমারী নিলয়, তেমনি পূর্বে লোহিত জেলার খামতি আর পশ্চিমে সেরডুকপেনদের মধ্যেও রয়েছে একই ব্যবস্থা। মহাকান্তারের যুগ থেকে সেই একই ধারা সমানভাবে চলেছে।

—খামতিদের কুমারী নিলয়ের কথা কিন্তু শোনা হল না। এবার যখন লোহিত জেলায় যাব, তখন কিন্তু খামতিদের কুমারী নিলয়ে নিয়ে যাবেন।

অপং প্রভাবমুক্ত নেমু সাহেবের উজ্জ্বল চোখে-মুখে হঠাৎ একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পূব আকাশে সূর্যের সোনালি রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। রাশেং থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছে মেয়েরা। এখনই মসুপও খালি হয়ে যাবে। আবার পাহাড়ে ফিরে আসবে প্রাণের স্পন্দন। নারী–পুরুষ চলে যাবে জুমে। নারী–পুরুষের সুরেলা গান সুবনসিঁড়ির তরঙ্গের সঙ্গে তাল মেলাবে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হবে 'কা ল্যাং কেই,

এমি কা ল্যাং কেই,

মেতুং মেতে এম ক্যামপোপে,

হো হো হো'।

অর্থাৎ আগুন থেকে সাবধান। জ্বলন্ত কাঠ থেকে নিজেকে যত্নে রেখ। শোন, শোন, শোন।

নেমু সাহেব আমার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরেন। বুঝতে পারি, তার অন্তঃস্থলের কোন এক নরম জায়গায় আঘাত লেগেছে।

—আপনাকে কি আমি দুঃখ দিলাম ?

—না। দুঃখ আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। তা না হলে সুজুকি লোহিতের জলে ভেসে গেল কেমন করে ? রাশেং–এ আমাদের পরিচয় রাশেং–এই আমাদের প্রেম কিন্তু রাশেং–এ আমাদের পরিণয় হল না। সুজুকি নেই। তিনি আমি আর রাশেং–এ যাই না। রাশেং আমার কাছে এক বেদনা–বিধুর স্মৃতি।

গোপালকৃষ্ণ রায়

ছবি : প্রদ্যোত মিত্র

জলজীবনের অচিন মায়ায়

সারেং : জলজীবনের গল্প

যাদের নিয়ে অনেক কথাকাহিনী জড়িয়ে আছে বাঙালির রূপকথা, ভ্রমণসাহিত্য ও গল্প উপন্যাসের মধ্যে সেই অজানা 'সারেং'দের অপ্রকাশিত জীবনচর্যা পরিবেশিত হল এই প্রতিবেদনে।

কলকাতা থেকে ঘন্টা খানেকের পথ গঙ্গার ধারে রঙনগর গঞ্জ। নামেই গঞ্জ, গঙ্গার ধার ছাড়ালেই মাটির ঘর, টালি বা টিনের চাল, কলাবাগান আর ধানক্ষেত মিলিয়ে নিপাট গ্রাম। গঙ্গার ধারের আরও পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে এর পার্থক্য একটি জায়গাতেই—পীর সারেং—এর দরগা। মোহনা ঘেঁষা এই অঞ্চলের মানুষদের সর্বক্ষণের সঙ্গী জল। অধিকাংশই মৎসজীবী—ট্রলার বা ছিপ নৌকা নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের কাছাকাছি। এছাড়া অনেকেই পেট চালায় লঞ্চ চালিয়ে। প্রাইভেট লঞ্চ—মাল আর মানুষ পারাপার ছাড়াও কাজে লাগে বিয়ে-সাদির পার্টি বা পিকনিক পার্টিতে। এই লঞ্চ-চালকদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সারেং হওয়া। সারেং সিপ পাশ করার জন্য তারা প্রতিবছর পরীক্ষা দিতে আসে কলকাতার ট্রেনিং সেন্টারে। দোয়া মাঙতে যায় পীর সারেং-এর দরগায়—সারেং সিপ পাশ করার জন্য দরগার বড় হুজুরের আদার টুকরো নাকি অব্যর্থ।

পর পর দু বছর সারেংসিপের পরীক্ষা দিয়েছে হামিদ মিঞা। এবারে তৃতীয় বার। আর যাতে বিফল মনোরথ হয়ে না ফিরতে হয় তার জন্য আর্জি জানাতে এসেছে দরগায়। জল পুলিশ ধরলে ফাটকে যেতে হতে পারে জেনেও প্রাইভেট লঞ্চ চালাচ্ছেন অনেকদিন ধরেই। গঙ্গার অন্ধিসন্ধি তাঁর জানা। কৃষ্ণপক্ষের রাতেও চিনে নিতে পারেন লালবাতি জ্বলা সাদা বয়া। সাদা বাতি—সবুজ বয়া দেখলে বুঝে নেন চর আছে সামনেই। রাঙ্গাকুলার চর বা সাকরাইলের চড়ায় এরকম সবুজ রঙের বয়া আছে। সেখানে লঞ্চ চালাতে হয় সাবধানে। তাছাড়া ওয়াল্লিশ ঘাটের কাছে কোথায় কোন চোরা স্রোত আছে তা-ও তার নখদর্পণে। ওয়াল্লিশ ঘাটের পর বড় দরিয়া—ছোট ছোট স্রোতই সেখানে সবথেকে ভয়ানক। তা সেই চোরা টানের পাশ কাটিয়ে লঞ্চ চালানো হামিদ মিঞার কাছে কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু পরীক্ষার সময় কলকাতার বাবু সেই স্রোতের নাম জিজ্ঞাসা করলেই সব গুলিয়ে যায় হামিদের। বাঁয়ের নাম ডাইনে আর ডানের নাম বামে বলে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড।

সমস্যাটা অনেকটা একইরকম-কানাইলাল দেশাই, রসিদ মিঞা, আব্দুল কাদের আর সেলিম মিঞার। যদিও সারেংসিপের পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত পাশ করেছেন তাঁরা, লঞ্চে কাজও করছেন অনেকদিন ধরেই। এঁদের কাজ কারবার নদী আর মোহনা ঘেঁষেই। 'ঝড় ঝঞ্ঝার রাতে বড় ভয় লাগে।' বললেন কানাইলাল, 'চেনা নদীও তখন কেমন যেন অচেনা হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময় নদীতে ছিলাম। কিভাবে যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছি, তা আজ ভাবতেও ভয় লাগে।' ছোটবেলা থেকেই জলের সঙ্গে খেলা করে অভ্যস্ত আব্দুল কাদেরের লঞ্চ চালানোই এক মজার খেলা। অন্ধকার রাত্রে তারার আলোয় নদীর বুকে জল কেটে যাওয়া তার শুধু পেশা নয় নেশাও।

সারেংসিপে পাশ করা এখন দিনের পর দিন কঠিন হয়ে উঠেছে। বছর বিশেক আগেও অবস্থাটা ঠিক এরকম ছিল না। পরীক্ষা তখনও হত কিন্তু এত কড়াকড়ি ছিল না—বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগত সেখানে। স্কুলের বিদ্যা নির্ধারিত থাকত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। সোদপুরের জ্যোতিষ চন্দ্র রায় ১৯৫২ সালে এই সারেংসিপের পরীক্ষা দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেম। দীর্ঘ চল্লিশ বছর চাকরি করার পর আজ তিনি অবসর গ্রহণের
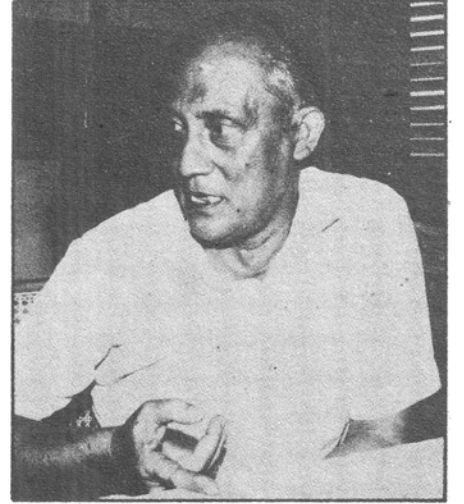
সারেং : জ্যোতিষ চন্দ্র রায়

মুখে। 'এখন তো মাধ্যমিক পাশ করাটা কোন মতেই গণ্য নয়। আমাদের সময় ম্যাট্রিকুলেশন-কেও শিক্ষার একটা মাপকাঠি বলে গণ্য করা হত। ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলেরাও তাই এই চাকরিতে আসত না বা আসলেও ওভার কোয়ালিফায়েড বলে তাদেরকে বাদ দেওয়া হত। আর আজ সারেংদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের ছড়াছড়ি। উপায় নেই, চাকরির বাজার এখন খুবই খারাপ।'

রশিদ মিঞার মত জল জীবনে অভ্যস্ত নয় এমন অনেকেও উপস্থিত বুদ্ধি সপ্রতিভতা আর সুস্বাস্থ্যের জন্য সারেংসিপ পরীক্ষায় পাশ করে যান। কিন্তু জলের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তারা যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনি আনপড় জাহাজের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও। তাই পরীক্ষায় পাশ করার পর তাদের

তিনমাস ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকে। এই সময় পরিচয় হয় জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঙ্গে। সারেংদের কাজ মূলত জাহাজের ডেকে। কাজ কারবার যদিও মেশিন নিয়েই, কিন্তু ইঞ্জিনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ জাহাজের দেখাশোনা করা। জাহাজ যখন কোন বন্দর থেকে ছাড়ছে অথবা কোন বন্দরে নোঙর করতে উদ্যত তখন সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা থাকে সারেংদেরই। মালপত্র লোডিং বা আনলোডিং-এর দায়িত্ব তাদের। মাল বোঝাই এর জন্য দরকার পড়ে বড় বড় ক্রেন ডেরিগ বা জাম্বো ক্রেনের। সেগুলো ঠিকমত চালু রাখা, যন্ত্রপাতির গণ্ডগোল সারিয়ে তোলাই সারেংদের কাজ। তিন মাসের ট্রেনিং শেষ হওয়ার সি·ডি·সি-র সার্টিফিকেট পান তাঁরা। যোগ্যতার প্রমাণপত্র এটিই। এই চাকরির ভিত্তিতেই আবেদন করতে হয় জাহাজ কোম্পানিগুলির কাছে–– মনোনীত হলেই জলে ভেসে পড়ার পালা।

একষট্টি বছর বয়সেও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী–যৌবনে কেমনটি ছিলেন এখনও
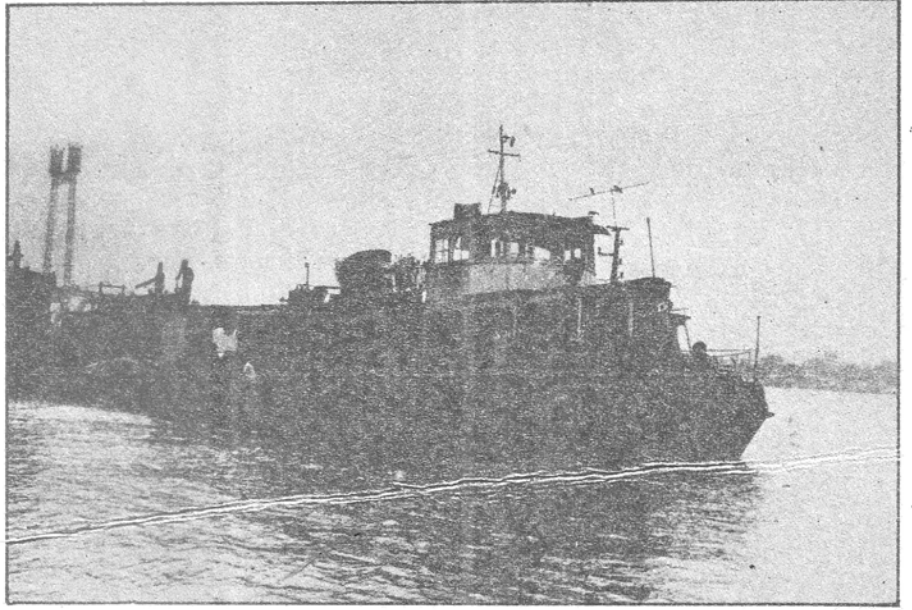
সারেং রশিদ মিঞা

দেখলে বোঝা যায়–'চেহারার জন্যই কলকাতা পুলিশে চাকরি পেয়েছিলাম তখন। আমাদের মত ছা-পোষা মধ্যবিত্তরা আর জাহাজ-টাহাজ সম্বন্ধে কি জানে বলুন–সরকারি চাকরিটাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু মুশকিল হল অন্য জায়গায়। তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। পুলিশদের সম্বন্ধে মানুষের কেমন যেন একটা নাক সিঁটকানো ভাব ছিল। আজও অবশ্য আছে। বরং কিছুটা হয়তো বেড়েছে। তা পুলিশে ঢোকার পর বাড়িতে মা, বৌ সবাই খুঁতখুঁত করত। এমন সময় এক বন্ধু খবর নিয়ে এল এই চাকরির। চিরকালই আমি একটু ডাকাবুকো ধরনের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। তা ভাবলুম লেগে পড়ি না কেন, কত দেশ দেখা যাবে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে। ভাল না লাগলে

যাত্রার আগে

ছেড়ে দেব। তখন তো আজকের অবস্থা ছিল না। একটা চাকরি ছাড়লেও আর একটা পাওয়া যেত। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ভালবেসে ফেললুম এই জলের জীবনটাকে। ডাঙার মানুষ আর হওয়া গেল না। আজ তো রিটায়ার করব ভাবতেই কষ্ট হয়।'

বিদেশি কোম্পানির জাহাজ ক্ল্যান ম্যাকেনড্রি-কে চেপে প্রথম অকূল দরিয়ায় ভেসেছিলেন জ্যোতিষবাবু। কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়েছিল। তার কয়েকদিন আগে থেকেই আগ্রহ আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শরীরের সমস্ত স্নায়ু ছিল টানটান–এক নতুন অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায়। এদিকে পিছুটানও রয়েছে। একান্ত আপনার মানুষগুলিকে কতদিন দেখতে পাবেন না ভেবেই গোপনে চোখ জলে ভরে উঠছে। এই টানাপোড়েন মনে চেপে রেখে জাহাজে উঠলেন। দূরপাল্লার জাহাজ ছিল সেটি–ইউরোপগামী। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে লণ্ডন, লিভারপুল আর গ্লাসগোর বন্দর। বই-এর পাতায় পড়া শহরগুলির ছবি কল্পনায় চোখের সামনে ঝিকমিক করে উঠল।

জাহাজ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো। কর্মচারীদের পরনে ফুটফুটে পোশাক। খাওয়া-দাওয়াও বেশ ভাল। জাহাজের প্রথম রাত্রিটি বেশ ভালভাবেই উপভোগ করেছিলেন জ্যোতিষ-বাবু। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল বিপত্তি। জাহাজের সারাক্ষণের দোলানি মাটির মানুষের সহ্য হয় না। বমি হতে থাকে–ক্রমাগত, এর নাম 'সী সিকনেস্'। মোহনা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। তখন একেবারে 'ছেড়ে–দে-মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। মনে হচ্ছিল চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। নতুন জীবন নতুন শহর দেখার ইচ্ছে উবে গিয়েছিল কর্পূরের মত।' পর পর দুটো তিনটে যাত্রার শুরুতে এরকম শরীর খারাপ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে শরীর অভ্যস্ত হয়ে গেছে ঢেউয়ের ওঠাপড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে।

সারেং-এর জীবন যেন এক অদ্ভুত বর্ণময় রামধনু। অজানা দেশ, অজানা মানুষ আর অভূতপূর্ব ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ আর দিক হারানো দরিয়ায় চলন্ত জাহাজের একঘেয়েমি। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জাহাজী জীবনে জ্যোতিষবাবু ঘুরেছেন প্রায় সারা পৃথিবী–দেখেছেন বহু অজানা দেশ–জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, হল্যাণ্ড, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল আর প্রায় সমগ্র আরবদুনিয়া। 'বিভিন্ন দেশের মানুষের পোশাক আলাদা, ভাষা ভিন্ন, জীবনযাত্রা অন্যরকম এমন কি নিয়মকানুনও আলাদা আলাদা ধরনের। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে জাহাজী মানুষদের মধ্যে। অবশ্য জাহাজ চালানো, তার যন্ত্রপাতি আর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে, যেগুলো সব দেশেই এক। তাই এ বিষয়ে যে কোন জাহাজী মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই খুব অসুবিধা হয় না। হয়তো বা সেজন্যই যে কোন অজানা, অচেনা দেশেও সী-ম্যানদেরই সবথেকে কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও আলাদা আলাদা রকম। সবারই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। তবু

জ্যোতিষবাবুর সবচেয়ে ভাল লেগেছে অস্ট্রেলিয়া। ছোট্ট দেশ। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। হাসি খুশি মানুষ। অপর্যাপ্ত খাবার-দাবার আর নানা ধরনের সুন্দর সৌখিন জিনিসপত্র। যে কোন ভারতবাসীর কাছে অস্ট্রেলিয়া অবশ্যই স্বর্গরাজ্য।

সারেং-এর কাজে জ্যোতিষবাবুর প্রায় বছর দশেক কেটে যাবার পরের একটি ঘটনা। জাহাজ থেমেছে লণ্ডনের উপকূলে। বিকেলে কিছু কেনাকাটার জন্য গেছেন শহরের ভেতরে। সেদিনের বিকেলটি ভারি মনোরম। লণ্ডনের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আর ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে এক বিরল ব্যতিক্রম। তাই শহরের মানুষজনও অনেকে বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। ব্রিটিশ গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে ঈষৎ উচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। খুশি মনেই হাঁটছেন জ্যোতিষবাবু, মনে পড়ছে দেশের বাড়ির গোধূলি লগ্নের দৃশ্যগুলি। হঠাৎ চোখে পড়ল সাদা সাহেবদের ভিড়ে একটি শ্যামলা মুখ। কালো চুল, চোখে চশমা, নিপাট বাঙালি। সেও ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'মনে হচ্ছে আপনি বাঙালি?'— সাহেবদের দেশে। গাঁক গাঁক করে ইংরাজি বলে আর শুনে যখন কান পচে যাওয়ার জোগাড় তখন যে বাংলা ভাষা কেমনটি লাগে তা আর বলে বোঝানো যাবে না। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল তার বাড়ি ভাগ্যকুল। সেখানকার রায় পরিবারের ছেলে। তার মানে তো পাশের গ্রাম। প্রায় নিকট আত্মীয়ের সমান। সেবার তো কথাবার্তা, গল্প গুজব হলই। এরপর থেকে যতবার এসেছেন লণ্ডনে ততবারই দেখাশোনা হয়েছে। গড়ে উঠেছে নিবিড় সম্পর্ক। দেশ ছেড়ে আসার পর আর ইলিশ মাছ খেতে পায়নি শুনে পার্সিয়ান গাল্ফ থেকে ইলিশ নিয়ে এসে খাইয়েছেন তাদের। 'দেশে তো সারাক্ষণই শুনছি জাতীয় সংহতি নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা। তবু তো সংহতি আসে না। এক প্রদেশের মানুষ মারছে অন্য প্রদেশের বাসিন্দাকে। অথচ দেশের টান যে কতবড় টান, তা বুঝতে পারি আমরা। অজানা দেশে লক্ষ লক্ষ অপরিচিত মানুষের ভিড়ে, নিজের দেশের একটি লোককে খুঁজে পেলেও মনে হয় গলা জড়িয়ে ধরি। বিদেশে দেশের মানুষ বড় আপনার।' ফিজি আইল্যান্ডের বাসিন্দাদের প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভারতবাসী। বন্দরে জাহাজ ভিড়লে তারা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে জাহাজী মানুষদের জন্য। অচেনা ব্যক্তিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আদর আপ্যায়নে তাকে করে নেয় একান্ত কাছের মানুষ। বিদায় নেওয়ার সময় দুজনেরই চোখ জলে ভরে ওঠে।

রাধারমণ দেবনাথের অভিজ্ঞতা কিন্তু আরও অভিনব। সোনারপুরে বাড়ি, ১৯৫২ সাল থেকে জাহাজে সারেং-এর কাজ করছেন। প্রথম প্রথম কষ্ট হত, শারীরিক পরিশ্রমটা মনে হত বড্ড বেশি। তারপর অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ভালবেসে ফেলেছেন জাহাজী জীবনকে। গল্প শোনালেন নিজের অনুভবের ঝুলি থেকে। ১৯৬০ সালে গিয়েছিলেন কিউবার মাতানিয়া বন্দরে। জেটির কাছেই একটা বড় ফোর্ট আছে। জাহাজ থেকে নেমে ফোর্টের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হঠাৎ মিলিটারির পোশাক পরা এক অফিসার বেরিয়ে এসে তাকে ধরলেন। রাধারমণবাবু বুঝতে পারলেন অফিসার নিশ্চয়ই কাস্টমসের লোক। বিদেশি বলে ধরেছেন, এবার ঝামেলা আছে কপালে। যাইহোক ইশারা ইঙ্গিতে বুঝলেন যে ভদ্রলোক তাকে গাড়িতে চাপতে বলছেন। 'উঠে বসলাম গাড়িতে। গাড়ি গিয়ে থামল একটা পার্কের কাছে। এক শ্বেতাঙ্গিনী তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। হাবেভাবে বুঝলাম অফিসারের বউ। তখনও ভয় কাটেনি। কিন্তু মহিলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন যে আমার মত এক দূর দেশের নাবিককে অতিথি হিসাবে পেয়ে তাঁরা খুব খুশি। ওদের বাড়িতে গেলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম। যে-কদিন ছিলাম রোজই যেতাম।' বিদেশি অতিথি পেতে ভালবাসেন অনেক দেশের মানুষই। এ বিষয়ে সবথেকে অগ্রগণ্য বোধহয় স্পেন আর কিউবা। 'অমন বন্ধুভাবাপন্ন মিশুকে আর খোলা মনের মানুষ পাওয়া দুর্লভ।' জাহাজী মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু পৃথিবীর ধনী দেশগুলির লোকজন তত সুবিধাজনক নয়। আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। ভারতীয়দের সঙ্গে তারা একটা দূরত্ব রেখে চলে, ঘনিষ্ঠ হতে চায় না। আমেরিকা আর ইংল্যান্ডে এটা সবথেকে প্রকট। ভারতীয়দের আদর আছে আফ্রিকা মহাদেশে। সামান্য একটু হিন্দি গান
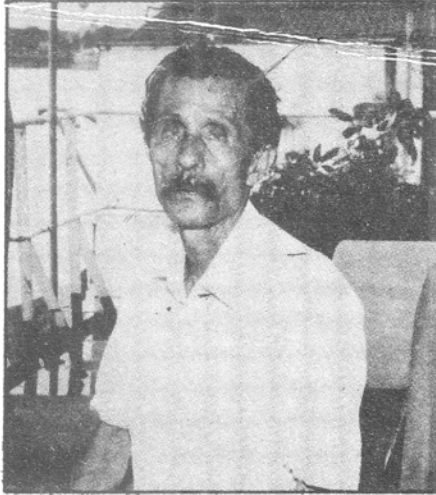
প্রফুল্ল সিংহ রায়

কানাই লাল দেশাই

> হঠাৎ চোখে পড়ল সাদা সাহেবদের ভিড়ে একটি শ্যামলা মুখ। কালো চুল, চোখে চশমা, নিপাট বাঙালি। সেও ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'মনে হচ্ছে আপনি বাঙালি?'–সাহেবদের দেশে গাঁক গাঁক করে ইংরাজি বলে আর শুনে যখন কান পচে যাওয়ার জোগাড় তখন যে বাংলা ভাষা কেমনটি লাগে তা আর বলে বোঝানো যাবে না।'
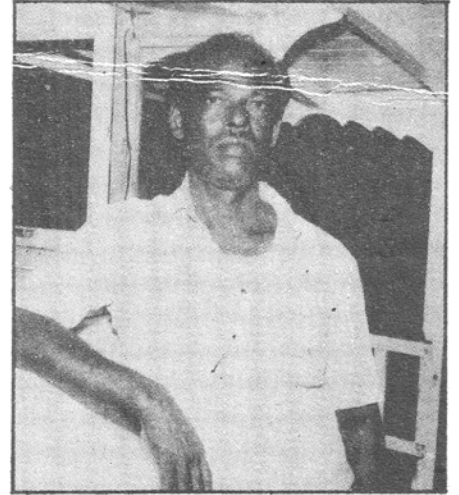
শোনার জন্য তারা নাবিকদের টেনে নিয়ে যায় বাড়িতে। আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতিয়ে তোলে সবাইকে।

কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই যে এরকম উষ্ণ অভিনন্দন পাওয়া যায় তা নয়। অভিজ্ঞ সারেং সুবোধকান্ত মৈত্র জানালেন যে আরব দুনিয়ার দেশগুলি কিন্তু অন্যরকম। জাহাজ থেকে নামার পরই নাবিকদের তারা নাম জিজ্ঞাসা করে। হিন্দু বুঝতে পারলেই শুরু হয় অশ্লীল গালাগালি। বিদেশি মানুষ বলে কোনরকম সুবিধা তো পাওয়াই যায় না বরঞ্চ অসুবিধা জোটে বিস্তর। একই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এমনকি ঘরের পাশের বাংলাদেশেও।

সীমাহীন সমুদ্রের জলে জাহাজ যখন ভেসে চলে তখন আত্মীয় স্বজন থাকে বহু দূরে। সহকর্মীরাই তখন একমাত্র বন্ধু। বিপদের সহায়। তাই জাহাজী মানুষদের পরস্পরের সঙ্গে গড়ে ওঠে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক। জলের সঙ্গে মিতালি পাতানোর ফলে ধুয়ে যায় মনের অনেক মালিন্য,

জটিলতা। জাহাজী মানুষ তাই সরল, সোজা পথের পথিক। ডাঙার মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। ১৯৭৪ সালের কথা। সুবোধবাবু তখন ছিলেন আমেরিকাবাসী এক জাহাজে। বাল্টিমোর বন্দর থেকে সবে জাহাজ ছেড়েছে। সেদিন আবহাওয়া ছিল খারাপ। জাহাজের যন্ত্রপাতিরও কিছু গণ্ডগোল চলছিল। জাহাজের দুপাশে যে ছোট্ট সরু গলিতে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়, তাকে বলে এলিও। সেখানে কাজ করছিল ছজন সারেং। হঠাৎ একটি বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ডেকের ওপর। এলিওর ভিতরে জল ঢুকে যায়। ভেতরে আটকা পড়েন ছজন নাবিক। ঢেউ-এর জল সরিয়ে বহু কষ্টে উদ্ধার করা হয় তাদের। প্রচণ্ড আঘাতে তিনজন তখন সংজ্ঞাহীন, বাকিদেরও যথেষ্ট লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেস করা হয় বন্দরে।

কাঞ্জিলাল মজুমদার

জাহাজটি আবার ফিরে যেতে থাকে পুরানো পথে। 'সেদিন রাত্রে আহত বন্ধুদের পাশে যখন বসে আছি, তখন তাদের ছটফটানি দেখে নিজেকে যে কি অসহায় লাগছিল। মনে হচ্ছিল কোনভাবে যদি নিজে কষ্ট করেও ওদের যন্ত্রণা কমাতে পারি। আমার মনে হয় নিজের ভাই বা ছেলের জন্যও বোধহয় মানুষের এর থেকে বেশি ছটফটানি হয় না। জাহাজী জীবনের নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাই ঝুঁকিও আছে প্রচুর'। 'অ্যাকসিডেন্ট তো যে কোন সময় হতেই পারে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আমাদের কাজ করতে হয়। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমাদের মিনারেল অয়েলের ট্যাঙকার নিয়ে যেতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। ঝুঁকি ছিল, কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

সারেং হিসাবে কাজে ঢুকলেও উত্তরোত্তর উন্নতি করেছেন প্রফুল্ল সিংরায়। ছোট লঞ্চে যেমন থেকেছেন, তেমনি গেছেন বড় জাহাজেও। ১৯৭২ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় চোখের সামনেই একটি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ভয় পেয়েছিলেন খুবই। কিন্তু চাকরি ছাড়েননি। 'তবে আত্মীয় স্বজনদের খুবই দুশ্চিন্তা হয়। বিশেষত স্ত্রী সবসময় উদ্বেগে থাকেন।' বাড়ির টান একটা বড় সমস্যা কাঞ্জিলাল মজুমদারেরও। ১৯৭২ সাল থেকে চাকরি করছেন জাহাজে। কিন্তু নিজের মধ্যে কোথায় অপরাধ-বোধ কাজ করে। 'ছেলেমেয়ের দেখাশোনা হয় না। স্ত্রীকে সময় দিতে পারি না। মনে হয় নিজের কর্তব্য করছি না। পয়সা রোজগারটাই তো জীবনের সব নয়।' মনের এই টানাপোড়েন অধিকাংশ জাহাজী মানুষেরই একটি বিরাট সমস্যা। কিন্তু জলের টান বোধহয় বড় কঠিন টান।

সারেংরা জাহাজে কাজ পান চুক্তির ভিত্তিতে। সিপিং কর্পোরেশনের এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের নিয়োগ করে না। জলযাত্রায় কতদিন থাকতে হবে সে বিষয়ে আগে কোন নিয়মকানুন ছিল না। সে সময় জাহাজগুলি ছিল বিভিন্ন ব্রিটিশ কোম্পানির। ভারতবর্ষের সঙ্গে তারা চুক্তিবদ্ধ থাকত। ১৯৭৫-এ শিপিং কর্পোরেশন তৈরি হয়। তারপর থেকেই চালু হয় নানারকম নিয়মকানুন। এখন যাত্রা শুরুর নয় মাসের মধ্যে সেটি যদি ভারতবর্ষের কোন বন্দরে ভেড়ে তাহলে সারেং সেখানে নেমে যেতে পারে। নইলে অবশ্য থাকতে হবে পুরো এক বছর। একটা চুক্তি শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় 'রেস্ট পিরিয়ড' বা 'ওয়েটিং পিরিয়ড', এই সময় সারেং বা কোন জাহাজীই কোনরকম বেতন পান না। আগে নাকি রেস্ট পিরিয়ডে নাবিকদের মাসিক ৩৫০ টাকা করে দেওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু ১৯৭৬ সালে আই·এন·টি·ইউ·সি· দাবি করে যে এই টাকার পরিমাণ বাড়াতে হবে। শিপিং কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন। ফলে মামলা শুরু হয়। সেই অবধি ভাতা বন্ধ আছে।

রাধারমণ দেবনাথ

ব্রিটিশ কোম্পানির জাহাজগুলি যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে কাজ করত ততদিন সারেংদের চাহিদা ছিল প্রচুর। তাই 'রেস্ট পিরিয়ড' কতদিনের হবে সেটা নির্ভর করত নাবিকের নিজের ওপর। তিন মাস বা চার মাসের বেশি কেউ বাড়িতে থাকতে পেত না। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি জাহাজ তুলে নেওয়ার পর বহু জাহাজী বেকার হয়ে পড়ে। শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে এখন মাত্র ১৬০টি জাহাজ রয়েছে। তার অধিকাংশই গেছে বোম্বাই বন্দরে। কলকাতায় ছিল মাত্র ৪০টি। এর মধ্যে অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট ৩২টি জাহাজ। ফলে কলকাতার সারেংদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সাত-আট মাস তো কোন ব্যাপার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বসে থাকতে হয় তিন থেকে চার বছর। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। জাহাজে কাজ করার সময় যথেষ্ট ভাল মাইনে পেলেও জমানো টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে এই দীর্ঘ অবসরে। ফলে দৈনন্দিন জীবনে সারেংদের আজ মুখোমুখি হতে হচ্ছে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার। অনেকেই ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারছেন না। অনাহার অর্ধাহারের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করছে কেউ কেউ। প্রতিদিন শিপিং কর্পোরেশনের অফিসে কাজের আশায় এসে বসে থাকেন বহু বেকার জাহাজী মানুষ। অভিজ্ঞতার অভাবে অন্য কোন কাজ করতে পারেন না তাঁরা। অপেক্ষায় থাকেন ডাক আসার। জাহাজী জীবনের রোমাঞ্চ, অজানাকে দেখা বা জানার আনন্দ, দেশবিদেশের রঙিন ছবি মুছে গিয়ে তাঁদের ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন মুখে ফুটে থাকে শুধু এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের আশঙ্কা।

শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে এখন মাত্র ১৬০টি জাহাজ রয়েছে। তার অধিকাংশই গেছে বোম্বাই বন্দরে। কলকাতায় ছিল মাত্র ৪০টি। এর মধ্যে অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট ৩২টি জাহাজ। ফলে কলকাতার সারেংদের বিশ্রাম নেওয়ার সময় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

দীপান্বিতা রায়

উপসাগর যুদ্ধ : শারজায় ভারত বনাম পাকিস্থান
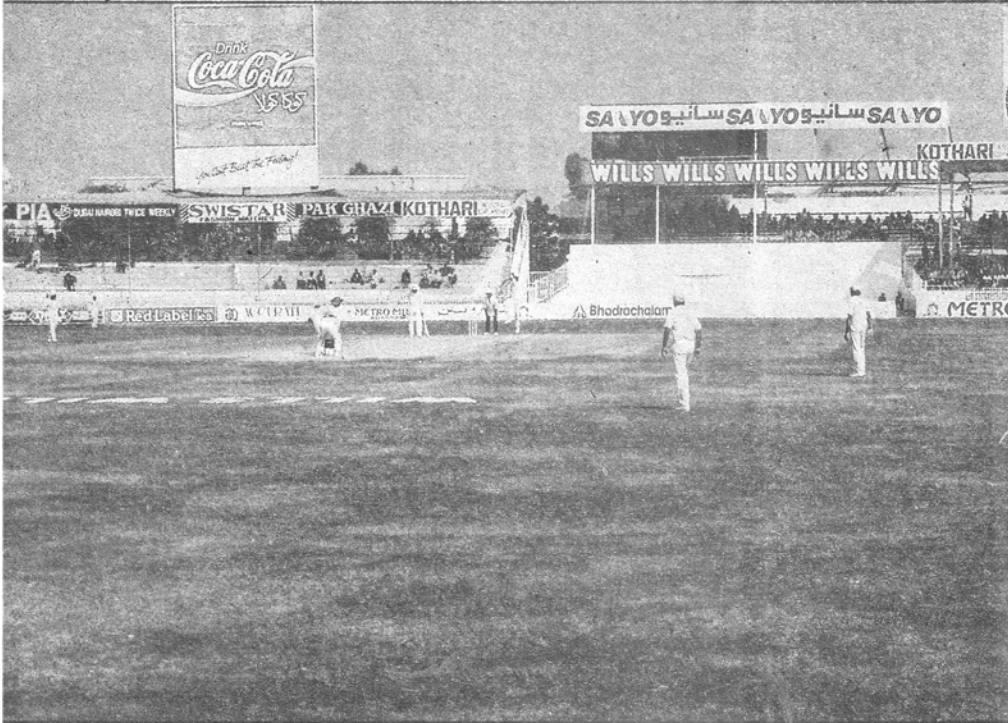
শারজা : মরূদ্যানে 'মক্কা'

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শারজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রুদ্ধশাস নাটকীয়তা ও পাক-ভারত ফাইনালের ব্যতিক্রমী চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ করছেন সদ্য শারজা প্রত্যাগত আলোকপাত প্রতিনিধি।

সাদ্দাম হসেন বনাম আমেরিকার মিত্রবাহিনীর উপসাগর যুদ্ধের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার পর সেই উপসাগরেই আবার অনুষ্ঠিত হল দম বন্ধ করা টানটান উত্তেজনায় ভরা 'ক্রিকেট যুদ্ধ'। ভারত বনাম পাকিস্থান। ক্রিকেট ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারত-পাক ম্যাচ মানেই নাটকীয় উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা। দুপক্ষের এপর্যন্ত বাইশগজের রণভূমিতে দেখা হয়েছে ১২ বার। সিংহ ভাগ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে পাকিস্থান। সর্বমোট ৯ বার। তিনবারের বিজয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতকে।

মজার ব্যাপার এবারে কিন্তু পাকিস্থানকে প্রথম থেকে একবারও মনে হয়নি যে 'সিংহশাবক'। প্রথম দুটি ম্যাচ দেখার পর সকলের ধারণা জন্মেছিল এবার আর পাকিস্থানের ভাগ্যে 'শিকে' ছিঁড়বে না। তিন নম্বর স্থানে থাকতে হবে। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের সঙ্গে প্রথম দুটি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয় 'সিংহ-বিজেতা' পাকিস্থানকে। 'ওস্তাদের মার শেষরাতে' দেয়ার মত ফাইনালে সকলকে চমকে দেয় পাকিস্থান। তার আগের দুটি ম্যাচেও ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে প্রথমবারে হারের বদলা মিটিয়ে নেয়। যদিও জয়ের 'মার্জিন' ছিল খুব সামান্যই।

শারজার ক্রিকেট মাঠ পাকিস্থানীদের জন্য খুব 'লাকি'। ১৯৮৬ সালেও আমরা দেখেছি; সেবারে ফাইনাল খেলায় এমন একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল যখন শেষ ওভারে পাকিস্থানীদের জয়ের জন্য দরকার ১৪ রান। সেই উত্তেজনা আরও চরমে পৌঁছে যায় যখন শেষ বলে দরকার ৪ রান। ক্রিজে তখন জাভেদ মিঁয়াদাদ। বোলিং রানআপে চেতন শর্মা। নতুন করে সে খেলার বর্ণনা দেয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কারণ শেষ বলে ৪ রানের জায়গায় মিঁয়াদাদের ওভার বাউন্ডারি কেউ কখনো ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না।

এবারের ক্রিকেট নিয়ে আমাদের আলোকপাত প্রতিনিধি বিভিন্ন ক্রিকেট বোদ্ধা ও সমালোচকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে পাকিস্থান যখন ক্রিকেট যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়

কটাক্ষে শারজা-সুন্দরী

আ . ন্ত . র্জা . তি . ক . ক্রি . কে . ট

সীমিত ওভারের খেলায় ২০০ উইকেট: কপিলদেবের অনন্য নজির

ইমরান খাঁ: জয় যখন নিশ্চিত

সঞ্জয় মঞ্জরেকার: ম্যান অব দ্য সিরিজ

আজাহারুদ্দিনের লেগ গ্লান্স

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ: ওয়াকার ইউনুসের বলে ক্লিন বোল্ড ইয়ান বিশপ
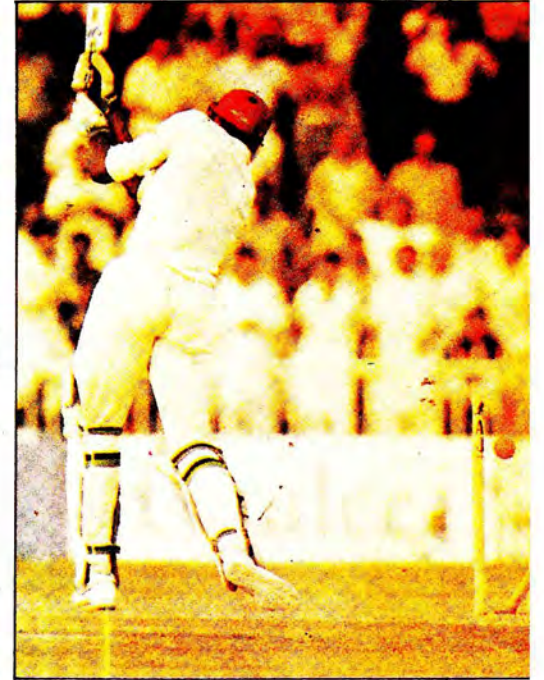
তখন তাঁরা নামে পূর্ণ উৎসাহ, উদ্দ্যম ও জেতার মরণপণ বাজি নিয়ে। সবসময় ইতিবাচক ক্রিকেট খেলার মনোবৃত্তি রাখায় ভাগ্যলক্ষ্মী পাকিস্থানকেই সহাস্যে বরণ করে নিয়েছেন। এমনকি যে-ক্ষেত্রে সমবেত দর্শকরা ধরে নিয়েছেন যে ভারতকে আর হারানো যাবে না, তেমন পরিস্থিতিতেও নাটকীয় মোড় জয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে পাকিস্থানকে। পাকিস্থানের জয়ের কারণ হিসেবে বলা যায় তাঁরা দল, দেশ ও ধর্মের তাগিদ নিয়ে মাঠে খেলতে নামে। নিছক খেলার খেলা হিসেবে নয়। তার ওপর শারজা মরুদ্যানের দর্শকদের তুমুল হর্ষধ্বনি ও সমর্থন পাকিস্থানকে জেতার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়। অন্যদিকে ভারতকে সবসময় থাকতে হয়েছে চাপের মুখে। দর্শক সমর্থন তো দূরের কথা তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে হয়েছে।

ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে প্রথম দুটি ম্যাচ হারার পর পাকিস্থান নিজেদের আরও চাঙ্গা করতে দেশ থেকে তিনজন পরিবর্ত খেলোয়াড় আনায়। তাঁরা হলেন আমির সোয়েল, সঈদ আনোয়ার ও জাহিদ ফজল। বাদ পড়েন অভিজ্ঞ অথচ ফর্মে না থাকা জাভেদ মিঁয়াদাদ, রামিজ রাজা ও ওপেনার ব্যাটসম্যান গুলাম আলি। পাকিস্থানী ক্রিকেট কর্মকর্তাদের মতে, এঁরা নাকি ফিজিক্যালি ফিট ছিলেন না।

ক্লাইভ লয়েড কিংবা ভিভিয়ান রিচার্ডস-এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে এবারে রিচার্ডসনের দলের ছিল আকাশ জমিন ফারাক। কারণ দলে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান বলতে একমাত্র অধিনায়ক রিচি রিচার্ডসন। পাকিস্থানের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে জয়ের নায়ক স্বয়ং তিনিই। রিচার্ডসনের শতরান অনেকদিন মনে থাকবে ক্রিকেট প্রেমিক দর্শকদের।

দ্বিতীয় ম্যাচেও একসময় মনে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। বলতে গেলে ইমরান খান সেই ম্যাচে ফাইনালে ওঠার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ দুর্ধর্ষ রিচি রিচার্ডসনের ১২২ রান। কিন্তু রিচার্ডসন আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। চাপের মুখে ওয়েস্ট

মরুদ্যানে ক্রিকেট ও মহাউদ্যমী বুখাতির

প্রথম যখন শারজায় ক্রিকেটের আসর বসে সেসময় দুর্ধর্ষ পাকিস্থানী ফাস্ট বোলার সরফরাজ খাঁ বলেছিলেন, 'মরুভূমিতে ক্রিকেট খেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা।'

সত্যিই তেমনটিই মনে হয়েছিল অনেকের। দশ বছর আগে কেউই স্বপ্নে ভাবেননি সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসবে। এবং মরুভূমির দেশে তা সফলভাবেই সম্পন্ন হবে। এর পেছনে একজন মানুষের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি হলেন আবদুল রহমান বুখাতির। শারজার এই 'বিজনেস ম্যাগনেট' তাঁর পাঠ্যজীবনে করাচিতে থাকাকালীন দারুণ উৎসাহী হন ক্রিকেটে। নিজেও ভাল খেলতেন। পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বপ্নকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান তিনি তাহল, শারজায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর। প্রথমেই তিনি ব্রতী হন মরুভূমির দেশ শারজায় উপযুক্ত ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট মাঠ ও পিচ তৈরি করতে। ধু ধু মরুতে বুখাতির বলতে গেলে একক উদ্দীপনায় তৈরি করেন ক্রিকেট মাঠ, পিচ ও আলট্রামডার্ন স্টেডিয়াম। যেখানে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না যে সবুজ ঘাসের কার্পেট দেখা যাবে সেখানে বুখাতির সেই অবাস্তবকে রূপায়িত করেন বাস্তবের দুনিয়ায়। খেলার জন্য নিবেদিত প্রাণ এই আবদুল রহমান বুখাতির শারজায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসর বসিয়ে প্রমাণ করেন 'উদ্যমেণ হি সিদ্ধন্তি কার্যানি'…। ক্রিকেট প্রেমিকদের কাছে এখন শারজা মানে 'ক্রিকেটের মক্কা'। তার সমস্ত কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন শারজায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের 'জনক' আবদুল রহমান বুখাতির।

বিনোদ কাম্বলি: সম্ভাবনাময় বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান

শচীন তেন্দুলকর: ভারতীয় ক্রিকেটের 'মারাদোনা'

শারজায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের উদ্দীপনা

ইন্ডিজের মাঝের সারির ব্যাটস্‌ম্যানরা দিশা হারায়। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয় পাকিস্থানীদের জন্য। খেলার শেষ ওভারে জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল ১০ রান। ওভারের প্রথম তিন বলেই ৮ রান করে পাকিস্থানীদের উৎকণ্ঠায় রাখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু শেষ রাখতে পারেনা। ইয়ান বিশপকে দারুণভাবে ঠকিয়ে দিয়ে আগামী দিনের পাকিস্থান দলের 'উজ্জ্বল সম্ভাবনা' ওয়াকার আলো রয়েছে। সেসময় দুর্দান্ত গতি নিয়ে 'হুল' ফোটাচ্ছে পাকিস্থানী বোলাররা। ৪৬ ওভার থেকে শেষ পর্যন্ত স্বল্প আলোতে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কোন ক্রিকেট সমালোচক বা বোদ্ধা মেনে নেবেন না। সে সময় খেলা বন্ধ হলে রান এভারেজে বিজয়ী হত ভারতই।

ফাইনালে ভালই শুরু করেছিল ভারত। খুব তাড়াতাড়ি দুটি পাকিস্থানী উইকেটও তাঁরা পেয়ে যায়। সেসময় চাপের মুখে পড়ে পাকিস্থান। কিন্তু দুর্বল ফিল্ডিং ও ক্যাচ ফসকানোর জন্য পাকিস্থান রানের পাহাড় গড়ে নেয়। ৫০ ওভারে তাদের রান ২৬২। জবাবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও ভালোই আরম্ভ করে। সিধু ও শাস্ত্রী প্রথম কয়েক ওভার দ্রুত রান তোলার চেষ্টায় সফল হন। কিন্তু কয়েক ওভার পরে সেই আকিফ জাভেদ। তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় মানচিত্র ওলট পালট করে দেন মাত্র দু ওভারেই। তবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আজাহার ও তেন্দুলকারের এল বি ডব্লু আউট হওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। অনেকের মতে আজাহার বলটি ব্যাটে খেলার পর পায়ে লাগে।

ভারতকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় সঞ্জয় মঞ্জরেকারের 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হওয়ার শিরোপা নিয়েই। অধিনায়ক আজাহার উদ্দিনের ফিল্ডিং দারুণ প্রশংসার দাবি রাখে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্যাপটেন রিচি রিচার্ডসনের ক্যাচ দুটি আজাহার তালুবন্দি না-করলে হয়তো শারজার ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

কাগজে কলমে ভারতের ব্যাটিং শক্তি নাকি এখন বিশ্বসেরা। তবে শারজার মাঠে প্রমাণ হল আরও কিছু সঞ্জয় মঞ্জরেকার তৈরি করতে না–পারলে কিংবা ভালো বোলিং লাইন না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসর থেকে খালি হাতেই ফিরতে হবে ভারতকে।

শারজা টুর্নামেন্ট জিতে পাকিস্থান আট লক্ষ টাকার সম্মান অর্থ ছাড়াও পেয়েছে সুদৃশ্য উইলস্ ট্রফি। ভারতের পক্ষে সঞ্জয় মঞ্জরেকার ছাড়াও আরও একটি সান্ত্বনা দুঁদে অলরাউণ্ডার কপিল-দেবের আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচে ২০০ উইকেট প্রাপ্তি। সীমিত ওভারের খেলায় কপিলের এই কৃতিত্ব এখনো পর্যন্ত নজির বিহীন।

ছবি: শারজা থেকে আলোকপাত প্রতিনিধি

দশ বছরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্মান

প্রতিবছর সুষ্ঠভাবে মরুদ্যান শারজায় দারুণ ক্রিকেট উপহার দেয়ার জন্য শারজার আয়োজকেরা ভূয়সী প্রশংসার দাবি করতে পারেন। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ান ও রানার আপ দলকে বিরাট অংকের অর্থ সম্মান দেয়া ছাড়াও তাঁরা গত দশ বছরে ভারতীয় ও পাকিস্থানী খেলোয়াড়দের ৫ কোটি টাকার সম্মান-অর্থ দিয়েছেন। গত দশ বছরে শারজা ক্রিকেট থেকে যাঁরা অর্থ-সম্মান পেয়েছেন তাঁদের তালিকা হল:

এম· মান্ত্রি
এস·এম· গাভাসকার
এইচ· গুপ্তে
জি·আর· বিশ্বনাথ
কপিলদেব
মহিন্দর অমরনাথ
পি·আর উমরিগড়
সি· এস· নাইডু
রমাকান্ত দেশাই
বিষেণ সিং বেদি
সেলিম দুরানী
একনাথ সোলকার
মুস্তাক আলি
রবি শাস্ত্রী
কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত
এরাপল্লি প্রসন্ন
সৈয়দ কিরমানি
বিজয় মার্চেন্ট
বিজয় হাজারে
দিলীপ বেঙ্গসরকার
লালা অমরনাথ
চন্দ্রশেখর
মদনলাল

ইউনুস পাকিস্থান ও ইমরান খানকে পৌঁছে দেয় ফাইনালে।

দ্বিতীয় খেলায় ভারতকে নামতে হয় পাকিস্থানীদের রানের 'পাহাড়' ২৫৭ মাথায় রেখে। কিন্তু দারুণভাবে শুরু করে ভারত। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে কাম্বলি দারুণ সম্ভাবনা জাগায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। আকিফ জাভেদ শুধুমাত্র মিডিয়াম পেসার নন সবরকম 'অস্ত্রই' ছিল তাঁর তূণে। বাঁ-হাতি কাম্বলি প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানের প্রমাণ রাখলেও এখনো তাঁকে হাত পাকাতে হবে আন্তর্জাতিক মানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

বম্বের দুই উদিয়মান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তরুণ ব্যাটসম্যান সঞ্জয় মঞ্জরেকার ও শচীন তেন্দুলকার। ক্রিকেটের কেতাবী ব্যাখ্যায় যত রকম স্ট্রোক-এর কথা বলা আছে সবগুলিতেই চোস্ত সঞ্জয় ও শচীন। দুজনে অভিন্ন হৃদয় বন্ধুও। এদের 'রানিং বিটউইন দ্য উইকেট'ও প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু তেন্দুলকার আউট হয়ে যাবার পর অন্যরা খেলার 'টেম্পো' ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। সেদিন খেলা শুরু হয় আধঘন্টা দেরিতে। ৪৫ ওভারের পর আলোর অভাব দেখা দেয়। মনোজ প্রভাকর ও কিরণ মোরে একথা শ্রীলংকার আম্পায়ারদের জানালেও কোন ফল হয় না। সারা দুবাই-এর রাস্তা ও ফুটবল স্টেডিয়ামে তখন আলো জ্বলছে। অথচ আম্পায়ারদের মতে মাঠে 'উপযুক্ত'

বিরল ব্যক্তিত্ব : মাধবরাও সিন্ধিয়া

এবারের শারজার অভিজ্ঞতা আরও দারুণ রকমের আনন্দঘন। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মাননীয় মন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়া স্বয়ং ছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে। মাননীয় সিন্ধিয়াজী কতটা উদার ও আন্তরিক এবারে তার প্রমাণ মিলল। পাকিস্থান ও অন্যদেশের ভি·আই·পি·রা যখন এয়ার-কন্ডিশান কেবিন, হটলাইন টেলিফোন, টি·ভি· ও অন্যান্য বিশেষ আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভি·আই·পি· প্যাভিলিয়নে বসে, তখন মাধবরাও সিন্ধিয়া নিজে স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসার আসন। শারজার তপ্ত আবহাওয়া ও বাতাসের আদ্রতা সত্বেও তিনি সমানে খেলোয়াড়দের সাহস জুগিয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সাংবাদিকদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সাংবা-দিকরাও সিন্ধিয়াজীর ব্যবহারে অভিভূত। তাঁরা আগে কখনো দেখেননি কোন দেশের সম্মানীয় ব্যক্তি বা অতিথি এভাবে দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে হাসি ঠাট্টা তামাশা করছেন। শুধু খেলোয়াড়দের সঙ্গেই নয় সাংবাদিকদের সঙ্গেও জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন মাধবরাও সিন্ধিয়া। সাবাশ মাধবরাওজী। আবারও ধন্যবাদ।

কৃষ্ণার মহাভারত

রণধীর কাপুরের বহু বছরের পরিশ্রমের ফল 'হেনা'। ছবিটি তিনি সর্বভারতে রিলিজের দিন ঠিক করেছিলেন ২১ জুন। ওই দিনটিতে আবার ডি·রামা·নাইডু তাঁর 'প্রেম ক্যায়দি' ছবিটিরও শুভমুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। বলা বাহুল্য, ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রণধীর কাপুরের কন্যা করিশমা কাপুর। ফিল্ম জগতে তিনি নবাগতা নায়িকা। না রণধীর কাপুর, না তাঁর স্ত্রী ববিতা কিংবা করিশমা-কেউই চাইছেন না একই দিনে ছবি দুটি প্রেক্ষাগৃহে আসুক। অথচ দিন পরিবর্তন করতেও কেউ রাজি নন। যে যার জিদ ধরে বসে রইলেন। দু-পক্ষ একে অন্যকে দিন পরিবর্তন করতে বলছেন, চাপা রাগারাগি, চাপান-উতোর চলল কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ছবি রিলিজ করার এক সপ্তাহ আগে শশি ও ঋষি দরবার করলেন কাপুর পরিবারের 'মুখিয়া' কৃষ্ণার কাছে। প্রয়াত রাজকাপুরের স্ত্রী কৃষ্ণা কাপুর 'ভেটো' প্রয়োগ করেন রণধীর কাপুরের উপর। ব্যস, মাতৃভক্ত রণধীর লাখ লাখ টাকা লোকসান দিয়ে, নতুন ভাবে প্রচার করে 'হেনা' রিলিজ করলেন 'প্রেম ক্যায়দি'র এক সপ্তাহ আগে।

রাহুলের ধনুর্ভঙ্গপণ

'আশিকি' খ্যাত 'আশিক' রাহুল রায় অনু আগরওয়ালের সঙ্গে আর কোন ছবি করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। রাহুলের বিপরীতে অনু যে সব ছবিতে সাইন করেছেন সেইসব ছবির প্রোডিউসারদের এরপর আর ঘুম থাকে? রাহুলের এই ধনুর্ভঙ্গপণ অনুর কানে যেতেই তাঁর ঘুমও একেবারে পগার পার। 'আশিকি'-তে রাহুল রায় অনুর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন। বইটি বক্স অফিসে হিট করার পর অনুর বাড়িতে লাইন লেগে যায় প্রোডিউসারের। কিন্তু এখন হিরো পাওয়া যায় কোথায়? লম্বা ছিপছিপে অনুর সঙ্গে যে রাহুলকেই ঠিকঠাক মানায়। সানি দেওল, গোবিন্দা, আমির খানের সঙ্গে অনু যখন কথা বলে তখন বেচারিকে মাথা নিচু করে কথা বলতে হয়। কেননা ওঁরা যে অনুর চেয়ে বেশ খাটো। গোবিন্দা তো বলেই ফেললেন, 'এই ভাবে কি কখনো রোমান্টিক মুড পাওয়া যায়? টুলে দাঁড়িয়ে হিরোইনের সঙ্গে রোমান্স করা যায়? তার উপর আবার গলা জড়িয়ে ধরলে মনে হয় গলা নয়, বাঁশ জড়িয়ে ধরেছি।' বাকি রইলেন সঞ্জয় দত্ত। কিন্তু তার শুষ্ক চোখের দিকে তাকালেই অনু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। বেচারি। পরিচ্ছন্ন সুন্দর চোখ কি অমন শুষ্ক সাহারা মরুভূমির চোখ সহ্য করতে পারে? কিন্তু এদিকে যে প্রোডিউসাররা অথৈ জলে!

ড্রিমগার্লের স্বপ্নভঙ্গ?

প্রথম ছবি 'শাবারা'র ব্যর্থতার পর সাফল্যের মুখ দেখলেন টেলিসিরিয়াল নূপুর-এ। হ্যাঁ, একদার ড্রিমগার্ল হেমা-মালিনির কথাই বলছি। নূপুর-এর সাফল্যে উৎসাহিত হেমা আবার বড় পর্দায় ফিরে আসতে চান। আবার পরিচালিকার ভূমিকায়। ছবির নাম 'দিল আশনা হ্যায়'। খবরটি আশাব্যঞ্জক। কিন্তু শুরুতেই হোঁচট খেতে হচ্ছে তাঁকে। কোন মতে ডিম্পলকে তাঁর ছবিতে নায়িকা হিসাবে অভিনয় করতে রাজি করাতে পারলেও পছন্দমত নায়ক যে খুঁজে পান না। তাঁর প্রথম পছন্দ অমিতাভ বচ্চন। কিন্তু অমিতাভ আমতা আমতা করে প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেলেন। এরপর হেমা ধরলেন বিনোদ খান্নাকে। কিন্তু হেমার পরিচালনায় অভিনয়? তোবা, তোবা। ফলে মুখ ঘুরিয়ে এবার দ্বারস্থ হলেন তাঁর তৃতীয় পছন্দ 'সওদাগর' রাজকুমারের কাছে। রাজকুমার অবশ্য পিতৃতুল্য চরিত্রে মানিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই তবে তাঁকে নায়ক মানায় না। এই ভাবে ব্যর্থ হয়ে হেমাকে কবীর বেদী, নাসিরুদ্দিন শাহ, মহসিন খান নিয়ে কাজ চালাতে হল। ধর্মেন্দ্র, সানি দেওল এবং ববি দেওল এই তিন-তিন অভিনেতা তো তাঁর ঘরেই মজুত তবু তাঁর এই দৌড়ঝাঁপ কেন? প্রশ্নটা আপনার আমার সবার মনেই জাগা স্বাভাবিক, তাই নয় কি?

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি

সাহেব-পূজিতা বৌবাজারের খ্যাতনামা কালীবাড়ির কথা

প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা কিংবা লৌকিক দেবদেবীর প্রতি মানুষের ভক্তি এতই প্রবল ছিল যে নিজগৃহে তো বটেই এমনকি অলিগলি, গাছগাছালির নীচে, হাটেবাজারে সর্বত্র নানা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের পারলৌকিক আত্মার শান্তি কামনা করতেন। সেই থেকে মূর্তি প্রতিষ্ঠার সুবাদে একই দেবদেবীর নাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হয়ে এসেছে। বিশেষ করে কোন গোষ্ঠী কিংবা একক প্রতিষ্ঠাতার নামেই দেবতার থানটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কলকাতায় বর্তমানে বৌবাজারের বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীটে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মূর্তিটিও একই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গি। বাংলা ৯০৫ সাল। গ্রামীণ কলকাতা তখন জলা-জঙ্গলে ভরা। এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কলকাতায় এসেছিলেন মূলত বাণিজ্য করতে। সেই সুবাদে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন। ব্যবসায়িক কুটকচালির মধ্যে থেকেও জমাটি ও আধ্যাত্মিক মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। বিদেশী হিসেবে সাহেব না হলেও ফিরিঙ্গিসাহেব নামে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি কলকাতার মানুষের কাছে।

বাঙালির দেবদেবীকে যদি কেউ সাহেবী কেতায় ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত করে তাহলে নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত রহস্যময় জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। কারণ, দেবী কালীর মূর্তিটি আমাদের প্রত্যেকের মনে এক ভয় মেশান ভক্তির ভাব আনে। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শবাসনে শায়িত শিবের বুকের উপরে দাঁড়ানো এক বিবসনা মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালিনী শ্যাম বর্ণের নারীর ছবি। দেবীর চার হাতের মধ্যে এক হাতে খড়্গ, আর এক

হাতে মানুষের মাথা, যার থেকে রক্ত ঝরছে অনবরত। রক্তলোলুপ জিভ দেবীর। তাঁর কোমরের চারপাশে মানুষের কাটা হাতের মালা দিয়ে সাজান এক ধরনের আচ্ছাদন। দেবীর দেহে নানা অলংকার। কালীর এই ভয়ঙ্কর সুন্দর মূর্তি একদিকে তাঁকে ধ্বংস ও অশুভনাশের এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের দেবী রূপে চিহ্নিত করে। এই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ের অপূর্ব প্রকাশ দেবীকালীর মূর্তি। ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মূর্তিটিও বর্ণিত অবয়বের অনুরূপ।

তখনকার গ্রামীণ কলকাতার এই পথ ধরে ফিরিঙ্গি সাহেব নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্যে। কিন্তু জঙ্গল পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলে কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের জন্য কুলী মজুর শ্রমিকদের নিয়ে আড্ডা জমাতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে জায়গাটির উপর তাঁর মায়া পড়ে গেল। কলকাতায় মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন এইভাবে ব্যবসা বাণিজ্য আড্ডার সুবাদে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করলেন। নিজ ধর্মের প্রতি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝেছিলেন যে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে নিজের ব্যবসাকে তরান্বিত করতে হবে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে তাঁর মত বাঙালিরাও নিজের দেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি পোষণ করে। এইভাবে তিনি বহুবাজারে তৎকালীন শীল পরিবারের জমির উপর একটি গোল পাথরের গায়ে ফুল চন্দন দিয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে তিনিও বাঙালির মত কাজে স্বভাবে ধর্মে এক হয়ে গেলেন। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত অক্ষেম ব্যানার্জির কথায়-যখন ফিরিঙ্গি সাহেবের সাধনক্ষেত্র দিনে দিনে বাড়তে শুরু করল তখন একদিন তিনি স্বপ্নে আদেশ পেলেন কালীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করার। সেইমত তিনি মাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু অন্য একটি মত অনুসারে শ্রীমন্ত ডোম (কারও মতে শ্রীমন্ত পণ্ডিত) নামে এক ব্যক্তি কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ৭০ বছর ধরে পূজারীর কাজ করেছেন। শ্রীমন্ত ডোম এই অঞ্চলে বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মন্দিরের ভিতরে কালীমূর্তির পাশেই একটি শীতলার মূর্তিও রাখা আছে। ওই অঞ্চলের ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের মধ্যে এই মন্দিরের খুব নাম যশ হয়। ফিরিঙ্গিরা বসন্ত রোগ থেকে সেরে উঠলে এই কালীমন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দিতেন। সেই থেকে এই কালীর নাম হয় ফিরিঙ্গি কালী।

তবে এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর কথা সাধারণ মানুষ চিন্তা না করে ধর্মমত নির্বিশেষে তাঁরা কেবল তাঁদের পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন মায়ের কাছে। আজও দেখা যায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান-শিখ সমস্ত জাতির মানুষ এই পথে যেতে আসতে মাকালীর কাছে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর চরণামৃত গ্রহণ করেন। সেইজন্য অনেকে আবার এই থানটিকে ম্লেচ্ছো কালীবাড়ি নামে অভিহিত করেন। মন্দিরের বর্তমানে পুরোহিত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের কথায় বিদেশীদের মধ্যে চিনারাই পুজো দিতে আসেন সব থেকে বেশি। তিনি আরও বলেন-ফিরিঙ্গি সাহেব ছিলেন মূলত চীনের নাগরিক। সেই সূত্রে ফিরিঙ্গি কবিয়ানের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে হিন্দুদের বাদ দিলে চীনারাই নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতেন।
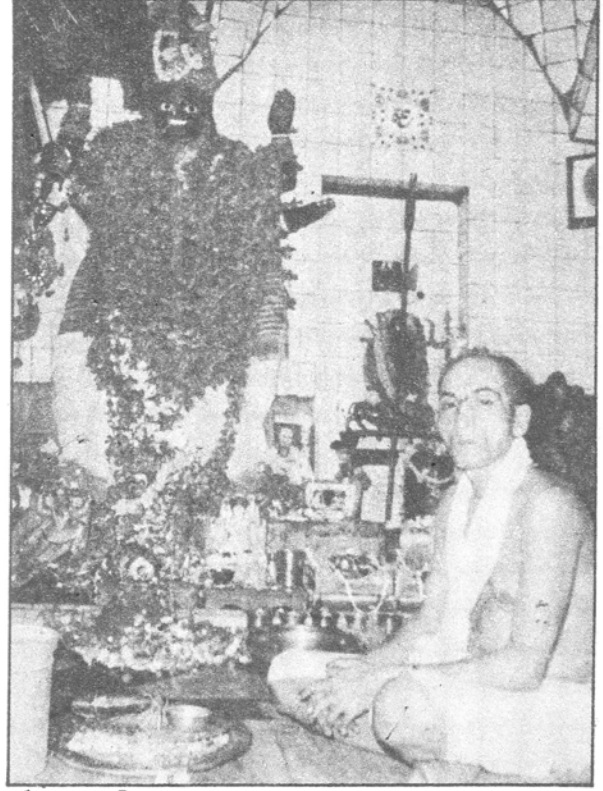
আজও ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মন্দিরে সকাল সন্ধে পুজোয় দ্বীপ জ্বলে, শাঁখ বাজে, ঘন্টা বাজে, হাজার হাজার মানুষ এসে পুজো দেয়, হাতজোড় করে প্রার্থনা করে মায়ের কাছে।

অর্চনারত পূজারী

শোনা যায় অতীতে বহু বিদেশী স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলকাতায় এসে এই মন্দিরে পুজো দিয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে শুরু করে শ্রীমা, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভোলাগিরি বহু মনীষী এসেছেন এবং পুজো দিয়েছেন। ১৯৮৫ সালে জগৎগুরু শংকরাচার্য কলকাতায় এসে সর্বপ্রথম এই কালী মন্দিরে আসেন।

১৯৪৭ সালে রায়টের সময় এই মন্দির ও মূর্তিটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ১৯৯১ সালে আগস্ট মাসে এই মন্দিরের কালীর বহু গয়না চুরি হয়ে যায়। মন্দিরের লোহার ও কাঠের দরজার তালা ভেঙে দুষ্কৃতিরা প্রতিমার পাঁচটি সোনার নথ, একজোড়া সোনার দুল, সোনার বালা, জিভ, রুপোর জবা ফুল, রুপোর সাপ এবং বহুমূল্যবান বাসন চুরি করে নিয়ে যায়। অবশ্য কলকাতা পুলিশের তদন্তে গয়নাপত্র উদ্ধার করা হয়। চুরি হওয়া জিনিসের অর্থমূল্য তত বেশি না হলেও মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে বিষয়টি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। বর্তমান সেবায়েত অক্ষেমবাবু পারিবারিক সূত্রে মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তিনি জানালেন এই মন্দিরের দস্তাদলিল কিংবা ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। যতটুকু শোনা তারই ওপর নির্ভর করতে হয়। অক্ষেমবাবুরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে মন্দিরের সেবা করে আসছেন। প্রথম সেবায়েত শ্রীমন্ত ডোমের পর প্রয়াত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দিরের দায়িত্ব বুঝে নেন। সেই থেকেই বর্তমানে অক্ষেমবাবু আছেন।

আজও ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মন্দিরে সকাল সন্ধে পুজোয় দ্বীপ জ্বলে, শাঁখ বাজে, ঘন্টা বাজে, হাজার হাজার মানুষ এসে পুজো দেয়, হাতজোড় করে প্রার্থনা করে মায়ের কাছে। কারণ মানুষ জানে মন্দিরটি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন মায়ের মূর্তিটি তাদের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার মূর্ত প্রতীক।

অমিতবিক্রম রাণা

ছবি: তপন সর্বাধিকারী

হাওড়ার রহস্যময় জানবাড়ি ও জানপরিবার

জানবাড়ি

সাধনরত ঈশ্বরী প্রসাদ

৫০০ বছর ধরে হাওড়ার দালালপুকুরে রহস্যঘন 'জানবাড়ি'তে ঈশ্বরীপ্রসাদের জানপরিবার কোন অতি-লৌকিক শক্তির সাহায্যে কিভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য অসাধ্যসাধন করছেন তারই চমকপ্রদ কাহিনী।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে পৌষের এক সকাল। হাওড়ার বালিগ্রামে গঙ্গার তীরে তখনও স্নানার্থীদের জটলা শুরু হয়নি। সবে রাত শেষ হয়েছে। তার ওপর জাঁকিয়ে শীত পড়েছে তাই সাত সকালে গঙ্গা স্নানে পূণ্যলাভাকাঙ্ক্ষী মানুষদের গরজ নেই। সে সময় বালীগ্রাম অধুনা বালি ছিল জন জঙ্গলে পূর্ণ এক অজ গ্রাম। রাতে শিয়াল হায়না এমন কি এক আধটা চিতার ডাকও শোনা যেত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু চালাবাড়ি। লোকসংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। এই সাত সকালে কাছে পিঠে কোন পথচারীকেও দেখা যাচ্ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু একজনেরই ক্ষেত্রে। যাকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সব ঋতুতেই প্রায় একই সময়ে গঙ্গায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ জপ করতে দেখা যায়। নাম অচ্যুৎ পঞ্চানন। দীর্ঘ দেহী, সুপুরুষ। গৌরবর্ণ; মাথায় জটা। আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ, ঈষৎ রক্তবর্ণ। শুধু ওই অঞ্চলে নয়, আশেপাশে বিশ পঁচিশটা গ্রামে তাকে এক বিশিষ্ট তন্ত্র সাধক বলেই জানে। তাঁকে দর্শন করলে সম্ভ্রম ও ভক্তিতে মাথা হেঁট করে। দিনে রাতের অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাধনায় কেটে যায়। গভীর রাতে তাঁর কুটিরের চারপাশ মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে মা–মা শব্দে গমগম করে ওঠে। প্রতিদিনের মত সেদিনও অচ্যুৎ পঞ্চানন আকণ্ঠ

নিমজ্জিত হয়ে চোখ বুজে স্তব করছিলেন। হঠাৎ তাঁর অনুভূতি হল কে যেন তাঁর কিছু দূরেই অবস্থান করছে। শীতের এত সকালে অন্য কেউ তো অবগাহন করে না! বিস্মিত অচ্যুৎ পঞ্চানন চোখ খুললেন। দেখলেন, কৃষ্ণবর্ণ এক ব্রাহ্মণ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। অচ্যুৎ পঞ্চানন কোন কথা না বলে ব্রাহ্মণের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন তাঁর কাছাকাছি। বললেন, বহুদূরের এক গ্রামে তিনি থাকেন। বালীগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলেন। প্রাতঃস্নান তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। স্নানান্তে নিজ আলয়ে ফিরে যাবেন। সাথে সাথে ওই ব্রাহ্মণ বললেন, আমি বহু পূর্বে আপনার তন্ত্র ও যোগ সাধনার কথা শুনেছি। একবার আপনাকে দেখেছিও, কিন্তু আলাপের সুযোগ হয়নি। আজ ভোরে গঙ্গার পাড় দিয়ে চলতে চলতে আপনাকে দেখে আলাপের সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাইল না। গঙ্গা স্নান ও সাধু সঙ্গ, রথ দেখা কলা বেচা একই সঙ্গে হল। অচ্যুৎ পঞ্চানন, শুধু মৃদু হাসলেন। এরপর ব্রাহ্মণ বললেন, শুনেছি তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে আপনি অনেক উচ্চ মার্গে পৌঁচেছেন, বহু দৈবশক্তি আপনার করায়ত্ত। আচ্ছা বলুন তো এই মুহূর্তে শনিগ্রহ কোথায় অবস্থান করছেন?

অচ্যুৎ পঞ্চানন মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি বন্ধ করলেন। তারপর ওই ব্রাহ্মণকে বললেন, এই মুহূর্তে শনিগ্রহের অবস্থান দু জায়গায়। এক জম্বু দ্বীপে আর আমার সামনে ব্রাহ্মণ রূপে। অচ্যুৎ পঞ্চাননের জবাব শুনে ওই কৃষ্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণের চোখে মুখে এক আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল। তিনি দুহাত তুলে পরম উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, ধন্য! তুমি ধন্য! তোমার বংশ ধন্য। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার বংশধরেরা সর্বজ্ঞ হবে, মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সমস্যা জর্জরিত মানুষকে তারা সমাধানের রাস্তা দেখাবে। তোমাদের আরাধ্য হয়ে থাকবেন মহামায়া মা কালী রূপেই। তোমার বংশধরেরা যুগে যুগে তাঁর কৃপায় তন্ত্রসাধনার অভিষ্ট ফল পাবে। তবে সাধনা লব্ধ ফল মানুষের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করতে হবে। ক্ষতি সাধনের জন্য নয়। একথা বলে অন্তর্হিত হলেন শনি মহারাজ। তিনি অন্তর্হিত হবার আগে, তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে অচ্যুৎ পঞ্চাননের একটি চোখের দৃষ্টি নিয়ে গেলেন। শনি মহারাজের বিশেষত্বই হল, তিনি বিরাট কিছু দিলে সামান্য কিছু নিয়ে যান। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না।

পাঁচশো বছর আগেকার সেই দৈববাণী আজ একইভাবে ফলপ্রসূ হয়ে চলেছে। অচ্যুৎ পঞ্চানন তাঁর নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনায় যে দৈব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, আজও তাঁর প্রবাহ বয়ে চলেছে তার উত্তরসূরীদের মধ্যে। তবে অক্লেশে নয়, এই প্রবাহকে ধরে রাখার জন্য অচ্যুৎ পঞ্চাননের সাধন পদ্ধতিকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত করে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার। কথা হচ্ছিল, দক্ষিণ হাওড়ার দালাল পুকুর অঞ্চলের মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোডে জানবাড়িতে বসে অচ্যুৎ পঞ্চাননের দশম তথা বর্তমান বংশধর ঈশ্বরীপ্রসাদ জ্যোতিঃশাস্ত্রীর সঙ্গে। তিনিই শোনাচ্ছিলেন কোন পুণ্য বলে আজও তাঁরা এক গরিমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। তিনি বললেন, তাঁদের মূল পদবী ভট্টাচার্য হলেও অচ্যুৎ পঞ্চাননের পরবর্তী বংশধর রামরুদ্র আমল থেকে তাদের বংশ 'জান' উপাধিতে

> **অচ্যুৎ পঞ্চানন মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি বন্ধ করলেন। তারপর ওই ব্রাহ্মণকে বললেন, এই মুহূর্তে শনিগ্রহের অবস্থান দু জায়গায়। এক জম্বু দ্বীপে আর আমার সামনে ব্রাহ্মণ রূপে।**
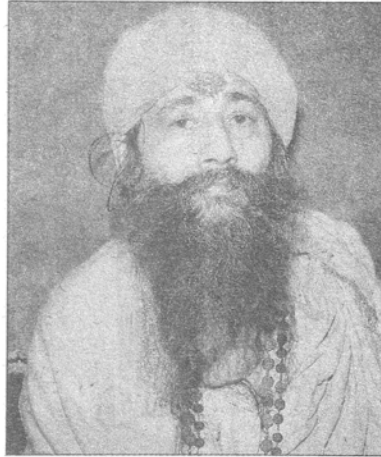
ঈশ্বরী প্রসাদ : মানব কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ

অলঙ্কৃত হয়েছে। যিনি পরবর্তী কালে দালাল পুকুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, তখন এই জায়গা চক্ররেড গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। রামরুদ্রের বাড়িই জানবাড়ি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কালে কালে যা একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়, পরিচিত দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তবে জানদের আদি বাড়ি ছিল কিছুটা পশ্চিমে, বর্তমানে তা ভগ্নস্তূপ। পরবর্তী কালে বর্তমান বাড়িটি নির্মিত হয়।

'জান' উপাধি কিভাবে ভট্টাচার্য পরিবারে এল সে প্রসঙ্গে ঈশ্বরী প্রসাদ জানালেন, 'জান' উর্দু শব্দ। যার অর্থ সর্বজ্ঞ, মানে যিনি সব জানেন। রামরুদ্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দৈব জ্ঞানের কথা শুনে দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে সভাপণ্ডিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই এই 'জান' উপাধিটি দেন। তখন থেকেই তা সযত্নে লালিত হচ্ছে। জানবাড়ি শুধু হাওড়ার একটি প্রতিষ্ঠান নয়, সারা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে বহুস্থানে এর পরিচিতি আছে। শোক সন্তপ্ত মানুষ, সমস্যা জর্জরিত সংসার থেকে শুরু করে হারানো সন্তানকে ফিরে পাবার আকুলতায় কিংবা অনূঢ়া কন্যার দায়ভারগ্রস্ত পিতামাতা প্রতিদিনই ছুটে আসেন ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে। ঈশ্বরী প্রসাদ উপশমের রাস্তা বাতলে দেন। পান কিছু প্রণামী। সমস্যা জর্জরিত মানুষের দুঃখের কথা শুনে তাঁর চোখে মুখে সহানুভূতির ছায়া নামে। তাদের আশ্বস্ত করতে তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত হয়। তাগা, তাবিজ, মায়ের ফুল যখন যা প্রয়োজন তা তিনি প্রয়োগ করেন যা নিরাময় হতে পারে না, তা স্বপ্নাদেশে মা তাঁকে জানিয়ে দেন। অযথা মানুষকে আশার আলো দেখিয়ে নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করার তিনি ঘোরতর বিরোধী। কেউ কারোর ক্ষতি করার বাসনা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি তিরস্কার করে ফিরিয়ে দেন। বলেন, মঙ্গলময়ী মা কি কোন সন্তানের অমঙ্গল চায়?

ভদ্রমহিলা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কৃতজ্ঞতায় তিনি হাত ছোঁয়ালেন তাঁর পায়ে। তাঁর সঙ্গে ফুটফুটে ছ'সাত বছরের একটি ছেলে। ছেলেটি গত বছর হারিয়ে গিয়েছিল। ছেলের মা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছিলেন ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে জানিয়েছিলেন আমার বকুকে তিন দিন ধরে তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাচ্ছি না। থানা পুলিশ করা হয়েছে, কিছুই হয়নি। আমার একমাত্র ছেলেকে না পেলে আমি মরে যাব। ঈশ্বরী প্রসাদ হাত তুলে অভয় দিয়েছিলেন, অধৈর্য হয়ো না মা। মঙ্গলময়ী মায়ের ওপর ভরসা রাখ। তিনিই তোমার ছেলেকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবেন। তোমার ছেলে তোমার আঁচল ছাড়িয়ে যেখানেই যাক না কেন, মহামায়ার সংসার ছেড়ে তো কোথাও যায় নি। তা তোমার ছেলে তোমাকে ফাঁকি দিল কি করে, বল তো মা? ওই মহিলা জবাব দিয়েছিলেন, আমি আর ওর বাবা মল্লিক ফটকে (মধ্য হাওড়া) পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। বকুকে গাড়িতে বসিয়ে আমরা এ দোকান সে দোকান ঘুরছিলাম। আমাদের দেরি দেখে ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল। বকু অধৈর্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমেছিল, আর তারপর...। ভদ্রমহিলা ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, দাঁড়াও দেখি কি করা যায়। এরপর তিনি চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার পর বললেন, আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে পাবে। চিন্তার কিছু নেই। ঈশ্বরীপ্রসাদ মায়ের ফুল ও একটি কবজ ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও। যারা তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে, তারা হয়তো মুক্তি

পণ হিসাবে কিছু টাকা চায়। ও সব লাগবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন, বাড়ি ফিরে গেলেন। দশ দিনের মাথায় বকুকে পাওয়া গেল। যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দলেরই এক মাঝবয়েসী মহিলা বকুর কচি মুখটা দেখে করুণায় আপ্লুত হয়েছিল। ওই মহিলাই বকুকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে তার বাড়ির কাছে রেখে এসেছিল। তারপর থেকে সময় পেলেই ওই ভদ্রমহিলা ঈশ্বরী প্রসাদের সঙ্গে দেখা করে যান। ঈশ্বরী প্রসাদের কথায়, মহামায়াই ওই মেয়েটার ওপর ভর করে তোমার ছেলেকে উদ্ধার করলেন। দেখলে তো, আমার কথা মিলল কি না!

পণ্ডিত ঈশ্বরী প্রসাদের বয়স ৬৫'র কাছাকাছি। গৌরবর্ণ সৌম্য চেহারা, বয়সের ভারে কিছুটা নত। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। গোঁফ দাড়ি কাঁচা পাকা। দেখলে ভয় ভীতি নয়, মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগায়। বললেন, বয়স তো হচ্ছে, তাই শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। কদিন আগে খাট থেকে পড়ে বুকের দুটো পাঁজরা ভীষণ চোট পেয়েছে। এখনও প্লাস্টার করা আছে। মাকে বলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন না? একথাটা বলতেই লজ্জা পেলেন। শরীর থাকলেই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। মা'র কাছে নিজের জন্য প্রার্থনা করতে সঙ্কোচ হয়। উনি তো না চাইতেই প্রতিনিয়ত করুণা বিলিয়ে চলেছেন। সাধারণ গৃহীরা শুধু নয়, বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের ভবিষ্যত জানতে বা মুস্কিল আসানের জন্য ঈশ্বরী প্রসাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন। কেন্দ্রিয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী অজিত পাঁজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। যোগাযোগ ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ও বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত বঙ্কিম চন্দ্র করের সঙ্গে। এঁরা ঈশ্বরী প্রসাদের গুণমুগ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বললেন, এই অঞ্চলের জনপ্রিয় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রী প্রয়াত কানাইলাল ভট্টাচার্যের আমার গণনার ওপর বিরাট আস্থা ছিল। ১৯৮২ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ঈশ্বরীপ্রসাদ যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা পুরোপুরি মিলে গিয়েছিল। বেশ কিছু মার্কসিস্টও ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে আসে, এদের নাম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তা এড়িয়ে গেলেন।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন? ঈশ্বরী-প্রসাদ এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, হয়তো জেনেছিলাম। কিন্তু জানলেই কি সব প্রকাশ করা যায়, বিশেষ কোন রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করলে, আমাকে তার ভক্তেরা কি রেহাই দেবে? ঘুরিয়ে বলা যায়, বিপদ আসতে পারে। ঈশ্বরী প্রসাদের মন্তব্য, এখন নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে। মহানির্বাণ তন্ত্র অনুযায়ী এখন কলির যৌবন চলছে। ধর্ম কর্ম লুপ্ত হবার অবস্থা হবে। আদি ব্যাধি বাড়বে, খুন জখম, দুর্ঘটনা, রাষ্ট্র বিপ্লব, বিশ্বাসঘাতকতা নিয়মিত ঘটতে থাকবে। অশান্তির চূড়ান্ত হবে। একমাত্র মহামায়ার–ধ্যানই কিছুটা শান্তি দিতে পারে।

পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দৈবক্ষমতা ধরে রাখতে ঈশ্বরী প্রসাদ সাধনা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনদিন শৈথিল্য দেখান নি। তাঁর কথায়, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, একটা পিতলের লোটাকে নিয়মিত ঘষা মাজা করলে, তবে সেটা চকচকে থাকে, অন্যথায় তাতে কলঙ্ক পড়ে। তাই ঈশ্বরী প্রসাদ তাদের বসতবাটী সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের রাস্তা ঘেঁষা মা কালীর মন্দিরে গিয়ে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত মায়ের আরাধনা করেন। এই রাস্তাটি তাঁর পূর্বপুরুষ রামকুমার ভট্টাচার্যের নাম অনুসারে হয়েছে। চক্রবেড়েতে আসার পর অচ্যুৎ পঞ্চাননের পুত্র রামরুদ্র পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রসাধনা করতেন। মা কালী তাঁকে স্বপ্নাদেশ
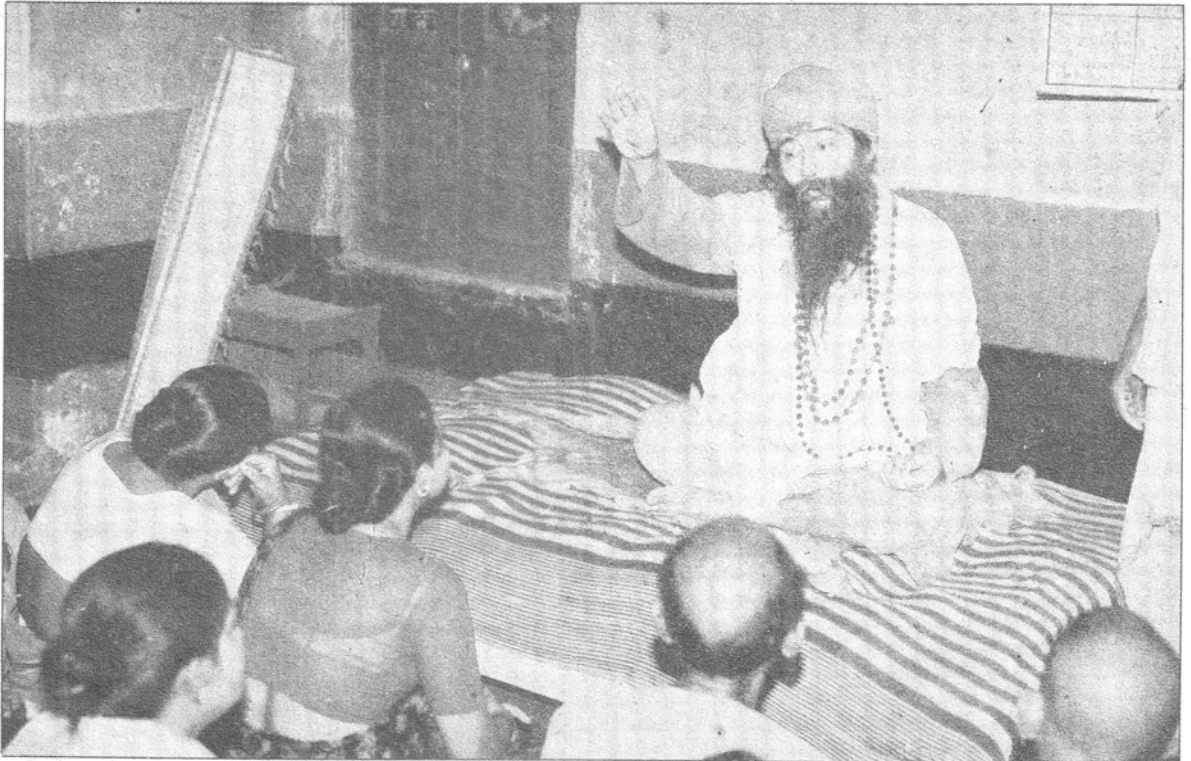
দর্শনার্থীদের মাঝখানে ঈশ্বরী প্রসাদ

দেন পাশেই এক পুষ্করিণীতে তাঁর ঘট আছে। রামরুদ্র মায়ের ঘট প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাঁর পুত্র রামচন্দ্র কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ক্রম পর্যায়ে একে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন রামচন্দ্রের পুত্র গুরুপ্রসাদ ও তাঁর পুত্র রামকুমার। মন্দিরে মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এই দেবী মূর্তিই জ্ঞান পরিবারের আরাধ্যা দেবী। প্রায় দু বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা মায়ের মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল গাছগাছালিতে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এখানে পাশাপাশি দুটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। একটি মা কালীর অন্যটি নবগ্রহের। ঈশ্বরী প্রসাদ পঞ্চমুণ্ডির আসনেও বসেন। তাঁর পিতা ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীই তাঁর দীক্ষাগুরু।

ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর সাধনা লব্ধ ও পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানকে আরও সম্প্রসারিত ও অলঙ্কৃত করতে বিলেত পর্যন্ত গিয়েছেন। স্কুল কলেজের সংস্কৃত অধ্যয়ন শেষ করার পর তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছেন। তিনি লণ্ডনে ছিলেন তিন বছর। রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সদস্যপদ দিয়েছে। সারা ভারতে মাত্র ৩৭ জনের ভাগ্যে এই গৌরব জুটেছে। ঈশ্বরী প্রসাদ বৃটেনের একটি গেজেট বুকে তা দেখালেন। ঠিকুজি কোষ্ঠী ও গ্রহরত্ন নিয়ে ঈশ্বরীপ্রসাদ নিয়মিত চর্চা ও তার প্রয়োগ করেন। জ্ঞানবাড়ি হিসাবে পরিচিত বাড়িটির দরজায় প্রস্তর ফলকে লেখা আছে,——জ্ঞানবাড়ি কালীবাড়ি। পণ্ডিত ঈশ্বরী প্রসাদ জ্যোতিঃ শাস্ত্রী। এম.এ.এ. (গ্রেটবৃটেন), এফ.আর.এ এস (লণ্ডন)।

জ্ঞানবংশের পূর্ব পুরুষদের শাখা প্রশাখার কেউ কেউ তন্ত্র সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগের চেষ্টা করলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি মাঝপথেই আটকে গিয়েছে। মূল জ্ঞানবাড়ির আশে পাশে জ্ঞানবাড়ি প্রস্তর সম্বলিত বেশ কয়েকটি অট্টালিকা সে সাক্ষ্যই বহন করছে। ওইসব বাড়িতে ধ্যান–ধারণা বা সাধন চর্চার বিষয় বর্তমানে অবলুপ্ত। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে স্থানীয় জমিদারদের বদান্যতায় এই চক্ররেড অঞ্চলে যে কোঠাবাড়ি গুলির পত্তন হয়েছিল সেগুলি ভক্ত ও অনুরাগীদের আনুকূল্যে বড় বড় কোঠাবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। মূল জ্ঞানবাড়িতে ভক্ত–ও অনুসন্ধিৎসুদের দেখা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী আছেন, তা নয়। হাতে গোনা দু' একজন কর্মী ছাড়া ঈশ্বরীপ্রসাদের এক আত্মীয় কেষ্টবাবুই সব ঝক্কি সামলান। ঈশ্বরী প্রসাদের কোন পুত্র সন্তান নেই। আছেন দুই কন্যা। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান বাড়ির ঐতিহ্যকে কে ভবিষ্যতে বহন করবে, তা নিয়ে ঈশ্বরী প্রসাদ মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এক জামাইকে মনের মত করে গড়ে তুলবেন। জ্ঞানবাড়ি কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠান, একটি ঐতিহ্য।

> জ্ঞানবংশের পূর্ব পুরুষদের শাখা প্রশাখার কেউ কেউ তন্ত্র সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগের চেষ্টা করলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি মাঝপথেই আটকে গিয়েছে।

সমস্যা জর্জরিত মানুষেরা প্রতিদিন বিকাল চারটে থেকেই জ্ঞানবাড়িতে সমবেত হতে থাকেন। তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশি। পাঁচটার সময় ঈশ্বরী প্রসাদ দোতলা থেকে নেমে আসেন নিজের বৈঠকখানায়। সেখানে সারা দেয়ালে অন্যান্য দেবদেবীর ছবি থাকলেও অধিকাংশই মা কালীর। ঈশ্বরী প্রসাদ উৎকণ্ঠিত মানুষের মাঝে আসন গ্রহণ করেন। পরনে গৈরিক বসন, তন্ত্রসাধকদের মত রক্তবর্ণ নয়। আসন গ্রহণ করার পর এক একটি পৃষ্ঠা ওলটাবার মত তিনি এক একজনের সমস্যা সমাধানে মগ্ন হন। সাধনায় সমৃদ্ধ হবার আগে ১৪–১৫ বছর বয়সেই ঈশ্বরী প্রসাদ অনুভব করেছিলেন তার মধ্যে এক অপার্থিব শক্তির আবির্ভাব। সে সময় একদিন স্থানীয় একটি লোক উদ্ভ্রান্তের মত তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছিল। সে ঈশ্বরী প্রসাদের পরিচিত। বালক ঈশ্বরী প্রসাদ কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি গো কর্তা এই সাঁঝের বেলা হন্‌হন্‌ করে কোথায় চলেছ? লোকটি জবাব দিয়েছিল, আমার গরুটা কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। তারই সন্ধানে যাচ্ছি যে ছোট কর্তা। ঈশ্বরীপ্রসাদ চোখ বুজে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করল, মনে হল একটি গরু যেন বসে বসে ঘাস চিবোচ্ছে। জায়গাটা তার পরিচিত। শানপুরের তেঁতুল তলা। যেন কতকটা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মত ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছিল, তুমি শানপুরে তেঁতুল তলায় গিয়ে দেখ। ঘন্টাখানেক পরে গরুটিকে সঙ্গে নিয়ে লোকটিকে ফিরতে দেখা গেল। সে ঘরের উঠোনে দাঁড়ানো ঈশ্বরীপ্রসাদকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি কি করে জানলে শানপুরে গেলে গরু পাব? ঈশ্বর হাসতে হাসতে জবাব দিল আন্দাজে গো, আন্দাজে। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম লেগে গেল। এখনও এমনি হাসতে হাসতেই ঈশ্বরী প্রসাদ বহু সমস্যার সমাধান করেন। তবে তাঁর কাছে সমস্যা জর্জরিত যে মানুষ আসেন, তারা জানেন ঈশ্বরী প্রসাদ আন্দাজে ঢিল ছোঁড়েন না। এর পেছনে এক অপার্থিব শক্তি যা আছে যা অচ্যুৎ পঞ্চানন থেকে চর্চা ও সাধনায় পরিপুষ্ট হতে হতে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

প্রায় বছর বিশেক আগের কথা। গোরক্ষপুরের কাছে এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল। যে ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল তাতে শ্রীরামপুরের দুর্গাপদ ঘোষের একমাত্র পুত্র অমিয় ছিল। দুর্গাপদ যে দুর্ঘটনার খবর পেয়েছেন অথচ ছেলের খবর পাচ্ছেন না। অনেকে নাকি দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছে। দুর্গাপদবাবু জ্ঞানবাড়ির কথা শুনেছিলেন। খোঁজ খবর নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এলেন জ্ঞানবাড়িতে। ঈশ্বরী প্রসাদ জানালেন, একটা বড় ঝাঁকুনিতে অমিয় বাঙ্ক থেকে ট্রেনের কামরার মেঝেতে পড়েছে। সামান্য চোট লাগতে পারে। বড় বিপদের সম্ভাবনা নেই। দুর্গাপদবাবু সংশয়াকুল চিত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন। ঈশ্বরী প্রসাদের আশ্বাসবাণী তাঁকে বিশেষ আশ্বস্ত করতে পারল না। অমিয় দিন দুই পরে বাড়ি ফিরে এসে জানাল,—— বাঙ্কের ওপর থেকে পড়ার মধ্য দিয়ে তার বিপদ কেটে গেছে। দুর্গাপদবাবু আজও ঈশ্বরী প্রসাদের গুণগ্রাহী। তাঁর বহু সমস্যাই ঈশ্বরীপ্রসাদজী সমাধান করে দেন।

সালকিয়ার এক অসহায় গরীব ঘরের গৃহবধূ সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে এসেছিল। তার স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুটি বাচ্চা নিয়ে আত্মীয় স্বজনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। কেউ আশ্রয় দিচ্ছে না। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে আকুল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরী প্রসাদ নিদান দিলেন আমি এই কবচটা দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও মা। ও ব্যাটা এক বদ মেয়ের খপ্পরে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেজন্য ঘরের লক্ষ্মীকে দূরে ঠেলেছে। কদিন পরেই দেখবে কাঁদতে কাঁদতে তোমায় খুঁজে বেড়াবে। তুমি আবার তোমার হারানো বিশ্বাস খুঁজে পাবে। বউটি কবচ নিয়ে ফিরে গেল।

ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, আজকের দুনিয়ায় অধিকাংশ পাপ কাজ হয় মোহ, আবেগ ও লোভের কারণে। এগুলো যেন এক একটি 'পাশ'। পাশ তো নয় যেন নাগপাশ। মা এইসব পাশ কাটিয়ে দেন। আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র। অমাবস্যার গভীর রাতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ঈশ্বরীপ্রসাদ যখন ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখন অদ্ভুত এক অনুভূতি তাঁর ওপর ভর করে। মনে হয় সমস্ত জগত তুচ্ছ মায়ের কোলের কাছে——আর কিছুই নয়। ঈশ্বরী প্রসাদ মা'র কাছে প্রার্থনা জানান, মা, আমার পূর্ব পুরুষ যে শক্তির ধারা আমায় দিয়ে গেছেন, তা যেন আমৃত্যু বহন করতে পারি। বংশের মুখে যেন চুনকালি না পড়ে। মা কালীর সাধনার জন্য নির্মিত পঞ্চমুণ্ডির আসনের পাশে নবগ্রহের আসন। সেখানেও বসতে হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, মহামায়া আমায় যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি সে ভাবেই বলেছি। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করার নেই। তবে আমার সাধনা মানুষের কল্যাণে লাগছে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারছে, এর চেয়ে পরম প্রাপ্তি আর কি হতে পারে?

চন্দন নিয়োগী

ছবি: তাপসকুমার দেব

मनोहर कहानियाँ
MANOHAR KAHANIYAN
India's largest read magazine among all periodicals in any language
With over half-a-crore readers--a monthly obsession.
Trim your media plan to the kind of people you should reach.
The Fourth National Readership Survey 1990 (IMRB-MEDIA SEARCH) has revealed what we always knew.
That MANOHAR KAHANIYAN is the largest read magazine among all periodicals in any language.
Your ads in MANOHAR KAHANIYAN can reach a staggering 52,14,000 potential target readers all over the country (Source: NRS-IV IMRB-Media Search). Readers who matter. Readers who are prospects for a wide range of products and services.
Yes, MANOHAR KAHANIYAN today is the best media buy.
मनोहर कहानियाँ
A MITRA PRAKASHAN PUBLICATION

অমৃতার অমৃতমন্থন

রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়-কথা দিয়ে যার গুঞ্জন শুরু সেই অমৃতা সিং কে নিয়ে বলিউডে আবার সোরগোল। এবার আর গোল নয়, গোলকধাঁধা। ক্রিকেটারের প্রতি দুর্বলতা বোধহয় অমৃতা কাটাতে পারেন নি। কারণ রবি-হীনা অমৃতা শেষমেশ বাঘা ক্রিকেটার টাইগার পতৌদির পুত্রবধূ হলেন। একেবারে অনাড়ম্বর বিয়ে করে চুপি চুপি টাইগারের খাঁচায় চলে এলেন 'মর্দ'-এর হিরোইন অমৃতা সিং।
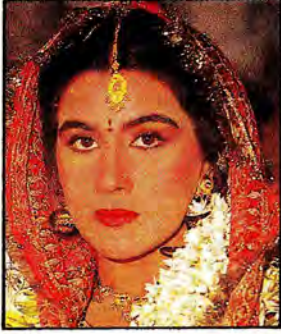
'বেতাব' সিনেমায় প্রথম পা রেখেই অমৃতার সঙ্গে ধরম-তনয় সানিকে নিয়ে 'খাশ বাত' শোনার আশা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু গুড়ি গুড়ি বয় সানি নিজের কেরিয়ারের কথা মাথায় রেখে অমৃত সন্ধান থেকে বিরত থাকেন। এরপর সানি গাভাসকারের সহ খেলোয়াড় রবি শাস্ত্রী। বলে ব্যাটে আর শুটিং-এ বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু অমৃতা নাকি শাস্ত্রীকে তেমন ভাবে পাচ্ছিলেন না। শোনা গেছে প্রেম-পরিক্রমার মাঠে শাস্ত্রী অফ স্পিন আর গুড লেংথ বজায় রেখে ছিলেন। বেচারী অমৃতার তাই আর ভালকরে ব্যাট করা হল না। শাস্ত্রী গুগলি বলে ক্লিন বোল্ড হয় রজনীশ শিষ্য বিনোদ ভারতীর কাছে। বিনোদ খান্না-অমৃতার প্রেমের পাক যখন কড়া হচ্ছে সেসময় আধ্যাত্মিক বিনোদ নাকি বেঁকে বসলেন। যাঃ চলে। অমৃতা তখন দীর্ঘদিন 'মর্দ' এর মর্দাঙ্গী মার্কা ছবি করে মনে মনে শরসন্ধান করছেন। শেষমেশ শর্মিলা পতৌদির ছাব্বিশের টগবগে তরুণ সৈফুদ্দিন আলি খান ওরফে সৈফ্। অমৃতা এখন বত্রিশের মধ্যগগনা। যৌবনের প্রতীক সৈফ-এর সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে কিভাবে সংসারের ক্রিকেট মাঠে ব্যাট করেন এখন তাই দেখার বিষয়। মডেলিং থেকে সৈফ এখন সিনেমায় পা রাখতে চলেছেন রাহুল রাওয়ালের ছবিতে। নতুন ছবির রোমান্টিক রোল করার আগে তাই বোধহয় পাকা ঘরোয়া রিহার্সাল দেবেন সৈফ। অভিজ্ঞা নায়িকা যখন অমৃতা তখন আর কথা কি?

'তানসেন' ভীমসেন যোশী

'মিলে সুর মেরা তুমহারা···'। লোক মুখে এখনও ভীমসেন যোশী। অনন্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ভীমসেনকে এবারে সম্মানিত করা হল ১৯৯১-এর 'তানসেন' শিরোপা দিয়ে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই সম্মান সঙ্গীত জগতে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য। সম্মানমূল্য এক লক্ষ টাকা। আগামী ৬ ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন আরেক সঙ্গীত প্রবাদ পুরুষ ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ। পুরস্কার ভীমসেন যোশীর হাতে তুলে দেবেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরলাল পাটোয়া। কিরানা ঘরানার সংগীত পুরুষ ভীমসেন যোশীর কাছে পুরস্কার পাওয়া কোন বিরল ঘটনা নয়। এর আগেই তিনি সম্মানিত

হয়েছেন 'পদ্মশ্রী' ও সংগীত নাটক অকাদমীর জাতীয় পুরস্কারে। এছাড়াও আরও অনেক সম্মান ও পুরস্কার ইতি মধ্যেই পণ্ডিতজীর করতলগত। এদেশের গর্ব ভীমসেন যোশীর দীর্ঘায়ু কামনা করে আলোকপাত এর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সোনার দাড়ি

সোনার পাথর বাটি কিংবা কাঁঠালের আমসত্ব বললে যা হবে তেমনটি শোনাচ্ছে তো? সোনার দাড়ি সে আবার কি হতে পারে?

হতে পারে এবং এমনও হয়। এমনিতেই চলতি কথায় অনেককে বলতে শুনি হিন্দুর দাড়ি আর মুসলমানের নারী বিশ্বাস করা যায় না। এই আছে তো এই নেই। সেলুনে

দাড়ি আর তালাকে নারী নিপাত্তা। কিন্তু মজার ব্যাপার ঘটেছে এবছর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝের পর্বে। বিদেশ থেকে বিমানে এদেশের মাটিতে অবতরণ করেন এক সুচতুর বিদেশী তস্কর। বয়স একচল্লিশ। তাই কাঁচাপাকা দাড়ি থাকতেই পারে। কিন্তু কাস্টমস বিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের চোখ কপালে উঠল যখন দেখলেন 'তস্কর'টির সাদা কালো দাড়ির ফাঁকে সোনালী দুটি দাড়ি শোভা পাচ্ছে। খাঁটি পাঁচ-পাঁচ তোলার দুটি দাড়ি! আর যায় কোথায়? সোনার পাথর বাটি যেমন হয়না সোনার দাড়িও হতে পারে না। তস্করটি এখন মামাবাড়ির চার দেওয়ালে বসে নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে।

শহর থেকে দূরে
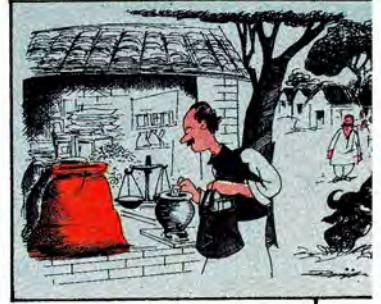
সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য লামডিং' পড়ে সব সময়ই মনে হত এমন একটি জায়গা খুঁজে পেলাম না···। অবিশ্বাস্য লামডিংকে তাই মাঝে মাঝে বিশ্বাসের জগতে নিয়ে আসতাম আর স্বপ্ন রচনা করতাম। গেল তো লামডিং। এখন বলি ঠিক তেমনই আশ্চর্যের একটি গ্রামের কথা। গুজরাতের প্রত্যন্ত অঞ্চল রাজসময়ালা। ভাবতে পারেন এই গ্রামের প্রতিটি দোকানে কেনাবেচা হয় দোকানী ছাড়া। মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছেন তেমনটি এই তিলোত্তমা নগরীতে হলে তো কথাই ছিল না। তাহলে আমরা সবাই রাজা, রাজার রাজা···। আদপেই কিন্তু রাজসময়ালা গ্রামের কোন দোকানেই চুরি হয় না। সবাই মাল-পত্তর নিজে ওজন করে নিয়ে ঠিক ঠিক হিসেব মত পয়সাপাতি রেখে আসেন। আজ পর্যন্ত চুরির কোন সালিশি করতে পুলিশকে আসতেই হয়নি এই গ্রামে। আসলে এই গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই কৃষিজীবি। তাই সকাল বেলায় দোকান নিয়ে বসলে মাঠে যাওয়া হবে না। তাই নিজেদের সাত্ত্বিকতায় বিশ্বাস রেখে তাঁরা নিশ্চিন্তে ক্ষেতের কাজ সেরে বিকেলে বাড়ি ফেরেন। চলুন না আমরাও তেমন কোন গ্রাম বা শহরের কথা ভাবি। লামডিং বা রাজসময়ালা না হোক আমাদের সততার ছোট্ট একফালি জমিও তো হতে পারে।

সংকলন: সমীর ধর

ধ্রুপদী সংগীতের আকাশে বাসবী মুখার্জি রথ

ত্র পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি। বাবা কীর্তন গাইতেন মা সেতার বাজাতেন। সমস্ত বাড়িতে বিরাজ করত এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। ছোট্ট মেয়েটির মনের ভিতর হয়ত সেই কারণে সেই বয়স থেকেই জন্মেছিল গানের প্রতি একান্ত ভালবাসা যাকে দিনযাপনের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন আরো নিবিড়ভাবে একাত্ম করে নিয়েছেন জীবনের সঙ্গে।

বাসবী মুখার্জি রথের জন্ম উত্তরপ্রদেশে। গান শেখার শুরুও সেখানেই, তারপর চলে যান বম্বেতে। এখন অবশ্য বিবাহসূত্রে তিনি কলকাতায়। স্বামী চিন্তামণি রথ কলকাতার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক। বাসবী বলেন, 'আমার এই তিরিশ বছরের জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে উত্তরপ্রদেশে আমাদের বাড়িতে, সেখানে আমার গানের প্রথম সূচনা।' প্রথমে বাড়িতে গানের শিক্ষকের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনার শুরু হলেও একইসঙ্গে স্কুলের নানদের কাছে ওয়েস্টার্ণ ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকও শিখেছিলেন বাসবী। 'আমি যখন ক্লাস টেন-এ পড়ি তখন শ্রী ভগবান দয়াল শ্রীবাস্তবকে গুরু হিসেবে পাই। তখন তিনি গান্ধী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন।' শ্রী ভগবান দয়াল ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার গায়ক। বাসবীর সঙ্গীত শিক্ষাও তাই শুরু হয় এই ঘরানা দিয়েই। এর পর তিনি পণ্ডিত কাশীনাথ শংকরের শিষ্যা হন। দীর্ঘ পাঁচ বছর এঁর কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন বাসবী। দারভাঙ্গা ঘরানার পণ্ডিত রাম সেবক তিওয়ারির কাছে শেখেন এর পরের দু'বছর। কলকাতার সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে প্রফেসর এ.টি. কাননের কাছেও কিরানা ঘরানার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য এসেছিলেন বাসবী। এক বছরের জন্য।

কিন্তু শুধু শিক্ষা লাভেই ক্ষান্ত হননি বাসবী। নিজেকে যাচাই করতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নানান প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ আসনটিও তাঁরই দখলে এসেছে। লক্ষ্ণৌ এর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, ইউথ হোস্টেলস অ্যাসোসিয়েশন, রোটারি ক্লাব, দিল্লির অল ইন্ডিয়া সঙ্গম কলা গ্রুপ ছাড়াও রয়েছে আরও বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব যাদের পৃষ্ঠপোষণা ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন তিনি।

'কানপুর থেকে মিউজিকে এম.এ. করবার পর আমি বম্বে চলে আসি। গান শেখার ইচ্ছেটা তখনও প্রবল ছিল। মনে হচ্ছিল এখনও যেন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয়নি আমার।' এরপর বাসবী বম্বের এস.এন.ডি.টি ইউনিভার্সিটি থেকে আবার সঙ্গীত দর্শনের উপর এম.এ. করেন। 'ডঃ প্রভা আত্রের প্রিয় ছাত্রীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। বম্বেতে চার বছর ওঁর কাছে গান শিখেছি।'

গান বাসবীর জীবনের এক অঙ্গ, যাকে ছেড়ে জীবনের কথা ভাবা যায় না। তাই তাঁর মন প্রাণ সব কিছু তিনি ঢেলে দিয়েছেন সেখানে। খেয়াল, গজল, ঠুমরি সব কিছুতেই সমান পারদর্শি তিনি। শুধু সুর আর সঠিক তালের সমন্বয় নয়, বাসবীর গায়কীতে আছে নিজস্বতা যার প্রভাবে তিনি সবার থেকে আলাদা, তাই তাঁর সঙ্গীতে মিশে থাকে এক আলাদা মাধুর্য। বম্বেতে থাকাকালীন সেখানকার বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বাসবী। শ্রোতাদের হাততালি ও অভিনন্দন তাকে আরও বেশি উৎসাহী করে তুলেছে। বাসবী বলেন, 'ওঁরাই আমার বিচারক। ওঁদের প্রশংসার ভিতরই আমার সবকিছুর সার্থকতা খুঁজে পাই।'

সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেই যোগ দিয়েছেন বাসবী। 'তবে এর ভিতর সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি যখন প্রভা আত্রের সেলিব্রেশনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেদিনও আমি আমার প্রাণ দিয়ে গান গেয়েছিলাম।'

বাসবী এখন কলকাতায়। স্বামী চিন্তামণি রথ সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের প্রফেসর আবার সেইসঙ্গে শিল্পীও বটে। খুব ভাল বেহালা বাজান তিনি। বাসবী বলেন, 'আমার শিল্পী জীবনে আমার স্বামীর অবদান অনেক। ও সব সময়ই আমাকে এগিয়ে দিতে চায়।'

বাসবী শুধু সঙ্গীত শিল্পীই নন, ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতকে বিশ্বের মাঝখানে ছড়িয়ে দিতেও আগ্রহী তিনি। এরজন্য একটানা একমাস ধরে বম্বে ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফরমিং আর্টস গ্যালারিতে লেকচার ওয়ার্কশপও করেছেন।

কলকাতায় এসে কলকাতাবাসীর সঙ্গে পরিচয় করতে আগ্রহী তিনি। বাসবী বলেন, 'গান ছাড়া আমার পরিচয়ের আর কি মাধ্যম আছে?' তাই যখন আগামী ডিসেম্বরে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাওয়ার ডাক পেয়েছেন তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেছেন। কারণ সবার রঙে রঙ মেলানোর এই তো সুযোগ।

বাসবীর জীবনের লক্ষ্য একজন সত্যিকারের গায়িকা হওয়া । ওঁর বিশ্বাস এই সাফল্য এনে দিতে পারে কেবল মাত্র ওঁর শ্রোতারাই। তাই বাসবীর মতে, 'গান যতটা নিজের জন্য গাই তার চেয়েও বেশি বোধহয় আমার শ্রোতাদের ভাল লাগার জন্য গাই, কারণ আমি জানি, শ্রোতাদের ভাল লাগা-ই একজন গায়ক কিংবা গায়িকার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

আলপনা ঘোষ

গোপা সেন : এক ফেমিনিস্ট শিল্পীর কথা

র সমসাময়িক অসংখ্য তরুণ শিল্পীদের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত চিত্র শিল্পী নন তিনি। ফেমিনিস্টের ব্যতিক্রমী মনন ও তার প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল তিনি ছবি আঁকেন স্পর্শাতুর রেখায়। অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারায় আঁকা হলেও তাঁর ছবি তত দুর্বোধ্য নয়। ইনটেলেকচুয়ালিটির ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে দর্শকদের বোধশক্তির বাইরে তাঁর শিল্পকর্মকে নিয়ে যেতে শিল্পী গোপা সেনের তীব্র অনীহা। মহিম রুদ্রের কাছেই তাঁর শিল্প শিক্ষা, বিমূর্ত ধারায় ছবি আঁকতে গিয়ে কখনোই তিনি ফ্যানটাসি নির্ভর নন। বিষয় নির্বাচনে বেশ থিমেটিক। তাঁর ছবি নাড়া দেয় বক্তব্যের গভীরতা, ঋজু প্রকাশভঙ্গি এবং বাস্তবতার জন্য।

মূলত জলরঙ এবং মিশ্র মাধ্যমে আঁকা গোপা সেনের ছবি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত, প্রশংসিত। দেশে বিদেশে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় তাঁর ছবি আছে। গোপা সেন ফেমিনিস্ট। মেয়েদের যে নিজস্ব সত্তা আছে, তারা মানবী, দেবী নয়, সেই বোধ সব সময় শিল্পীর চেতন এবং অবচেতনে কাজ করে চলেছে। তাঁর এই বিশ্বাস, কনভিকশনের প্রতিফলন জলরঙে আঁকা 'প্রেগন্যান্ট'। গর্ভবতী মহিলাটির মুখ লাবণ্যহীন, হীনপ্রভ। শিল্পী দর্শককে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন! সব সন্তান ধারণই কি আনন্দের বা গর্বের? অথবা মহিলাটির ইচ্ছার পক্ষে? সাদা রঙের সুষম ব্যবহার গর্ভবতী মহিলাটির নিঃসীম শূন্যতা বোঝাতে দারুণভাবে সাহায্য করে। 'কিচেন' ছবিটিও ব্যঞ্জনাধর্মী। উনুনের ধারে বসে থাকা মহিলাটির অবয়ব মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। তবে শিল্পী কখনো রোমান্টিক হয়ে পড়েন। যেমন 'লাভার' ছবিটি। পৃথিবীর কোলাহল ছাড়িয়ে এক আনন্দলোকে ভেসে যাচ্ছে প্রেমিক যুগল। এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড জর্জ হোয়াল্টকে মনে করিয়ে দেয়। 'নো স্কুল টু-মরো', ভীতিপ্রদ দৈনন্দিন স্কুল জীবন থেকে ছুটি পাওয়া, ঘুমিয়ে থাকা শিশুটির মুখে এক ধরনের পবিত্রতা। জার্মান এক্সপ্রেসনিস্ট নোলডের প্রভাব বড় বেশি স্পষ্ট।

অনেক ছবির মধ্যে আঁকা 'রিভাইজিং ফর মানডে'। একটি শিশু লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে পড়ছে। কাঠকয়লায় আঁকা এ ছবির লোডশেডিংয়ের অন্ধকার দর্শকদের ভীষণভাবে শিশুটির সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। রেনেশাস শিল্পীদের এভাবে সব সময় কাটিয়ে উঠতে না পারলেও শিল্পীর ছবি বক্তব্যের গভীরতা, এবং স্পষ্ট জীবন বোধের জন্য মনের গভীরে নাড়া দেয়। শিল্পী হিসাবে গোপা সেনের এখানেই সার্থকতা।

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মানদীর মাঝি : সেলুলয়েডে ক্ল্যাসিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ল্যাসিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্রায়ন করতে নেমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষজনদের জীবনদলিলকে কিভাবে প্রস্তুত করছেন সর্বজনীন চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে তারই সরজমিন কাহিনী।

'পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রির কোন সময়ই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—জেলে নৌকার আলো ওগুলি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস পদ্মা নদীর মাঝি অবিভক্ত বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের পদ্মার তীরবর্তী জেলে মাঝিদের কঠিন এবং সংগ্রামী জীবনের এক অবিস্মরণীয় দলিল। কোথায় যেন পদ্মা নদীর মাঝির সঙ্গে বিখ্যাত ইতালিয়ান লেখক জিরোভান্নি ভার্গার-এর সিসিলি উপকূলের চাষী মাঝিদের নিয়ে লেখা 'দি হাউস অফ দি মেডলার ট্রি'র সঙ্গে মিল আছে। দেশ কাল ছাড়িয়ে আত্মিক বন্ধনে বাঁধা এই চরিত্রগুলো। কালজয়ী, ধ্রুপদী। গৌতম ঘোষ পদ্মা নদীর মাঝির প্রথম পর্বের শুটিং করে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশ থেকে মাত্র দু'দিন আগে। ওঁর পাঁচতলার ওপরে বসার ঘরে বৃষ্টিমুখর অপরাহ্নে গৌতম এই প্রতিবেদকের মুখোমুখি। যদিও কথার ফাঁকে ফাঁকে তাকাচ্ছিলেন দূরের ব্রিজের ওপর চলমান গাড়িগুলোর দিকে—কিন্তু তাঁর মনের ক্যানভাসে তখনও ভরা যৌবনা প্রমত্তা পদ্মা। তার সেই মোহিনী এবং ভয়ংকরী রূপ। আর পদ্মাকে ঘিরে সেই মানুষগুলো—কুবের, ধনঞ্জয়, হোসেন মিঞা, কপিলা, মালা প্রমুখ। যারা কোন এক দেশের নয়—সব দেশের সব কালের।

দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় নির্মীয়মান 'পদ্মা নদীর মাঝি'কে সেলুলয়েডের ফ্রেমে বেঁধে রাখতে গৌতম ঘোষ চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর চেতন—অবচেতনে ছিল পদ্মা নদীর মাঝি। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে একের পর এক বাধা। মাঝে সময়ের দীর্ঘ বিরতি। অবশেষে আজ গৌতমের স্বপ্ন সফল। বাংলাদেশের শিবালয় উপজেলার উথলি, নালি গ্রাম এবং পদ্মার পারে পাটুড়িয়া গ্রামে ছবিটির কুড়ি শতাংশ কাজ শেষ

শ্যুটিং চলছে পদ্মাতীরে : ক্যামেরায় গৌতম ঘোষ। দূরে কপিলার ভূমিকায় রূপা গাঙ্গুলী

করলেন গৌতম। প্রথম পর্বের কাজের শেষে তাঁর অভিজ্ঞতা মনোরমই শুধু নয়, মর্মস্পর্শীও। দেখেছেন ভরাবর্ষায় পদ্মার সর্বনাশারূপ, যে পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা আবার সেলুলয়েডের পর্দায় শিল্পের প্রয়োজনে কখনও বা তুলে নিতে হচ্ছে সেই নদীরই রোমান্টিক রূপ। গৌতমের কাছে বর্ষার পদ্মা 'ভীষণ এবং সুন্দর' এর যুগলবন্দী।

'এবার বর্ষা দেরিতে এসেছে। বৃষ্টিও দেরিতে নেমেছে। তাই ঝড় বৃষ্টি মেঘ রোদ এক সঙ্গে পেয়েছি। ঠিক যখন যেটা দরকার তখনই। বন্যাও। এমন অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ পাব ভাবতেই পারিনি। ভেবেছিলাম বৃষ্টির কিছু শট নিয়ে নেব, তাহলেই হবে। প্রকৃতি যে আমাকে এভাবে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করবে ভাবতেই পারিনি। দীর্ঘ দশ বছরের টানা পোড়েনের পর যখন আমার স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে তখন প্রকৃতির এই অকৃপণ সাহায্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।' গৌতম স্মৃতিচারণার মধ্যে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

১৯৩৬ এ লেখা পদ্মা নদীর মাঝি আজ প্রায় পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে এসেও গৌতমের চেতনায় নাড়া দেয় কেন? ধনঞ্জয়, হুসেন মিঞা, কুবের, কপিলা এই চরিত্রগুলো 'আরবান' পটভূমিকায় আজও কি সর্বজনগ্রাহ্য ও সংবেদনশীল? 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস কালজয়ী। নদী-প্রান্তরের সাধারণ মানুষের সেই জীবনচিত্র ভীষণভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। চরিত্রগুলোর জীবনের ওঠানামা, মূল্যবোধ বদলে যাওয়া হোসেন মিঞা—যে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে কুবেরকে—এক অদ্ভুত চরিত্র। ময়নাদ্বীপ শুধু তার স্বপ্নেই নয়, হয়ত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। আমরা সবাই এই রকম স্বপ্নদ্বীপ গড়তে চাই। কপিলার সঙ্গে কুবেরের যে সম্পর্ক তার মধ্যে এক ধরনের জটিলতা, যখন দু'জনে শেষ মুহূর্তে ময়নাদ্বীপে চলে যায়—তার মধ্যে এক ধরনের এ্যাট্রাকশন কাজ করে যা আমার মনে হয় ফ্যাটাল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট ক্যানভাসে চরিত্রগুলির সুখদুঃখ রাগ-অনুরাগ এঁকেছেন পরম মমতায়। কিন্তু নিজে থেকেছেন নির্লিপ্ত, সংযত। আমি চলচ্চিত্রের ভাষায় সেলুলয়েডের ফ্রেমে সেই হিউম্যান এলিমেন্টগুলো দেখাতে চাই।'—বলে চলেন গৌতম। 'যাদের নিয়ে গল্প তাদের সঙ্গে পদ্মা নদীর একটা মানবিক এবং আত্মিক সম্পর্ক আছেই। পদ্মার বুকে মাছ ধরার এই কাহিনী ৭/৮ মাসের। কিন্তু ছোট ছোট প্রাকৃতিক ঘটনা জীবনকে প্রভাবিত করে। আমার মনে হয় কুবের,হোসেন মিঞা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। এরা বাস্তব নাও হতে পারে। কিন্তু এই চরিত্রগুলো একটা শিল্পীর কল্পনার মধ্যে বিচরণ করে। আমি নিজে মানুষ হয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে এদের রোমান্টিকতা, স্বপ্নময়তা অবিশ্বাস করতে পারি না—পারি না নদীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক অস্বীকার করতে। এরা বিশেষ কোন সময়ের সঙ্গে বাঁধা নেই। চিরন্তন।' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো গৌতমের মনে হয় লেখক খুবই স্বাভাবিক ভাবে ট্রিট করেছেন। জেলে জীবনের ভ্যালুজগুলো প্রকৃতির আত্মার খুব কাছে। যেমন কুবেরের সঙ্গে কপিলার সম্পর্ক। আমরা মধ্যবিত্তরা সেই সম্পর্কের রহস্যময়তা বুঝতে পারব না, তবে একথা ঠিক এই সম্পর্কের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই, ফাঁক নেই।' তাই গৌতমকে কালজয়ী এই চরিত্রগুলো সব সময় ভাবায়, হন্ট করে। কিন্তু এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দিতে গিয়ে চিত্রনাট্যে গৌতম কোন রকম পরিবর্ধন করেছেন কি? গৌতম বলেন তাঁর ছবিতে মূল কাহিনী থাকছে। কিছু চরিত্র বাদ গেছে, কিছু চরিত্র এসেছে। মাণিকবাবু বিরাট ক্যানভাসে চরিত্রগুলো বিধৃত করেছেন, ছুঁয়ে গেছেন। যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে তা হয়েছে সিনেমার ভাষায় সাহিত্যের উপস্থাপনার জন্যই।

গৌতম ঘোষের ছবিতে জল আসে এক ধরনের মেটাফর হিসেবে। অবশ্যই ব্যঞ্জনাধর্মী, প্রতীকী। যেমন দেখা গেছে 'পার' এবং 'অন্তর্জলি যাত্রা' ছবিতে। আর পদ্মা নদীর মাঝিরও প্রেক্ষাপটই তো জল। চলচ্চিত্রকার হিসেবে জল-নদী রূপে গৌতমের ছবিতে এত প্রাধান্য পায় কেন? এই ব্যাপারে গৌতম পুরোপুরি দ্বিধাশূন্য এবং তাঁর চিন্তাধারা ঋজু এবং স্বচ্ছ। জলপ্রবাহের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক থেকেই যাচ্ছে। তাঁর ছবিতে এটা যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত তিনি তা অস্বীকার করতে পারেন না। এই মানব জীবনের সঙ্গে জলের প্রবাহ আছেই। নদী কত জনপথ প্রান্তর পেরিয়ে সাগরে মিশছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে—আবার বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, জল। এটা 'রি-সাইক্লিং অব নেচার'। এর সঙ্গে মানবজীবনের প্রবাহের সঙ্গে মূল সুরটি একেবারেই অভিন্ন। নদী বা সমুদ্র যাত্রার প্রতীক। এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি। তাঁর অবচেতনে অবশ্যই ছায়া ফেলে। 'পার' এবং 'অন্তর্জলি যাত্রা'তে নদী এসেছে। তবে দু'টোর সুর কিন্তু একটু ভিন্ন। সেখানে এক না করে ফেলাই ভাল। 'পার' যেভাবে শেষ হয়েছে তারপর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সব প্রশ্নের উত্তর পরিচালক দেন না। তবে 'পার' এ চরিত্রদের নদী পেরনো—হিউম্যান এনডুরেন্স, মানুষের সহ্য শক্তির প্রতীক হিসেবে এসেছে। দর্শক 'পার' ছবির স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা অনুভব করেন। তারা যখন দুর্বারগতির নদীর বুকে ঝাঁপ দেয়—দর্শক ভাবেন তাঁরা ভেসে উঠুক, বেঁচে থাকুক। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে—যে শহর তারা একেবারেই চেনে না শুধু জীবনধারণের জন্য বেঁচে থাকার জন্য সেই শহরে আসা। কিন্তু তাদের বাঁচতে হবে, সেই বাঁচা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাদের জীবনে অনেক নদী পেরোতে হবে। তাই এখানে নদী সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাধর্মী। প্রতীকী।

অন্তর্জলি যাত্রায় নদীতে তখন ভরা কোটাল। একটা সিস্টেম সমাজ অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। বৈজু (শত্রুঘ্ন সিন্‌হা)র প্রতিবাদ করা ছাড়া অন্য রাস্তা থাকে না। এখানেও নদীর প্রেক্ষাপট প্রতিবাদ জীবন মৃত্যু।

পদ্মা নদীর মাঝিতে নদীই তো অন্যতম চরিত্র। তাছাড়া আমাদের সভ্যতা নদীমাতৃক। সভ্যতার উত্থান পতনের সঙ্গে মানব জীবনের যে ওতঃপ্রোতভাবে যোগ আছে নদীর-জলের।

আদিম সূত্রে পাওয়া যায় মানুষের অ্যাডভেঞ্চার স্পিরিট। অজানার সন্ধানে জলপথে বেরিয়ে পড়া। নদীর গতিপথ পাল্টানো, মানুষ জীবনের সঙ্গে যোগ আছে। এর প্রভাব সাহিত্যেও আছে। পৃথিবীর ৩ ভাগ জল ১ ভাগ স্থল। মানুষ সভ্যতার উষালগ্নে একটা মহাদেশের সঙ্গে আরেকটা মহাদেশের যোগসূত্র ঘটিয়েছে জলযাত্রার মাধ্যমে। এই যে নাবিক বা জেলে—এদের কখনোই মনে হয় না বিশেষ কোন দেশের বা কালের। এরা চিরন্তন। জেলেরা যে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছে, তারা ফিরতেও পারে আবার নাও পারে। এক অনির্দেশের পথের পথিক ওরা। কিন্তু প্রাকৃতিক রহস্য ভেদ করে ওরা কাজ করে। ওরা যে ফিরতেও পারে আবার নাও পারে এটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। মার্কসীয় চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী গৌতম ভাগ্যবাদে বিশ্বাস না করলেও এক্ষেত্রে ভাগ্যবাদ এসে যায়। তবে গৌতম এটাকে 'ডেসটিনি' বলার পক্ষে। ঘটনা যে ধারায় এগোচ্ছে তাতে তার জীবনধারা পাল্টে যাচ্ছে। মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জেলেদের জীবন। যেখানে ঝড় আছে, সমুদ্রোচ্ছ্বাস আছে, প্রকৃতির ভ্রূকুঞ্চন আছে, অভিশাপ আছে। তবুও রহস্যের সন্ধানে তাদের যাত্রা দুর্নিবার, তাদের গতিপথ অনিরুদ্ধ। কিন্তু সব সময় ফিরে আসা—তাদের স্বেচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।

গৌতমের জল নিয়ে চিন্তাভাবনা—মেটাফর হিসেবে ছবিতে এসেছে—অন্য মাত্রা নিয়ে। অন্য মাত্রা সংযোজন করতে।

'দখল', 'মা ভূমি' 'চেইন্স অব বণ্ডেজ' প্রভৃতি ছবি প্রমাণ করে গৌতম মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। অবশ্যই। গৌতম তা অস্বীকার করেন না। তিনি পুরোপুরি মার্কসীয় চিন্তাধারায় দীক্ষিত। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ এবং কম্যুনিজমের নির্বাসন এবং অতি সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বন্ধ, কম্যুনিজমের তাসের ঘরের পতন তাঁকে মানসিক ভাবে কতটা আলোড়িত করেছে?

গৌতম ঘোষ বলেন, 'পরিবর্তন হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন ভালোর দিকে হচ্ছে বলব না। কম্যুনিজম চলে যাচ্ছে বলে যাঁরা চিৎকার করছেন, তাও ঠিক নয়। কম্যুনিজম স্বপ্ন, একটা দর্শন। তাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

কালমার্কস অর্থনীতিকে যেভাবে ইন্টারপ্রেট করেছেন তা ভুল হতে পারে না। তবে পুরোটাই প্রসেসের মধ্যে চলছে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে এখন যা চলছে তা স্বাভাবিক-জিনিস হচ্ছে না। 'হিউম্যান ফ্যাকটরস' গুলো না ভেবে অন্যান্য 'ইনগ্রেডিয়েন্টস' গুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।'

তাহলে বাংলাদেশে গৌতম যখন বলেন: বিসমিল্লা খানের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি, তাই কাজ করতে পেরেছি নির্বিঘ্নে। গৌতম ঘোষের এই উচ্ছ্বাস কি প্রমাণ করে না তিনি অতি-মানবিক অথবা ঐশ্বরিক কিছু বিশ্বাসও করেন। যা তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারার পরিপন্থী? গৌতমের স্পষ্ট উত্তর: আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। সন্ত, ফকির-এ বিশ্বাস করি। এঁরা ঈশ্বরসেবা করুন বা নাই করুন, এঁরা জেনুইন লোক। এঁদের জীবনটাই স্বচ্ছ পবিত্র। একটা মূল্যবোধকে ভিত্তি করেই তাঁদের জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। যে মূল্যবোধ মানুষকে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসতে শেখায়, শুকিয়ে যাওয়া জীবনে করুণা ধারায় সিঞ্চিত করে এঁদের নিজেদের জীবনও। সেই অর্থে ওঁর কাছে ঈশ্বর বিসমিল্লা খান। লেনিন। মার্কস। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গৌতম ঘোষের করুণাঘন ঈশ্বর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলাদেশের পক্ষে হাবিবুর রহমান প্রযোজিত গৌতম ঘোষের পরিচালনায় এবং দু'পার বাংলার শিল্পীদের যৌথ অভিনয়ে সমৃদ্ধ 'পদ্মা নদীর মাঝি' সম্পর্কে বলতে গিয়ে গৌতম ঘোষ বলেছেন: 'দুই বাংলার জীবনায়ন ও সংগ্রামী মানসিকতার এক সফল যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি।' গৌতমকে প্রশ্ন করি তাঁর এই উক্তি সত্যিই কি বাস্তবায়িত হবে, যখন দিল্লিতে সংসদে শুনতে পাই বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মত ভারতের বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো যারা প্রত্যেকদিন রাস্তার বুকে তাজা রক্ত ঝরাচ্ছে, তাদের প্রচ্ছন্ন মদত দিচ্ছে? তাই 'পদ্মা নদীর মাঝি' কি দুই বাংলার রাজনৈতিক সীমারেখার উর্দ্ধে উঠে আত্মিক বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করবে?

গৌতম ঘোষ নিভে যাওয়া সিগারেটটা জ্বালালেন, দেশলাই এর আগুনে রাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ। সেই আগুনের তাপ তাঁর গলায়। 'দুই বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি এক। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যোগসূত্র প্রাচীন। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙে দিতে পারে। দু'টো দেশকে নিয়ে আসতে পারে অনেক কাছে।' কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কিছু অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ভারত ভাগ করেছেন। আমাদের এই উপমহাদেশে 'পার্টিশন' করে একটা জাতিকে দুই খণ্ড করেছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কূটনীতির যূপকাষ্ঠে নিজেদের গলা দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মকে হাতিয়ার করে, নোংরামির আশ্রয় নিয়ে, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ ভাগ করেছেন। কিংবা এখনও আমাদের এই উপমহাদেশের প্রতিবেশি দুই দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র রাজনীতির কথা বলে—আমাদের মন বিষিয়ে তুলছেন। শিল্পই পারে বিভেদের সেই সীমা রেখা মুছিয়ে দিতে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি শিল্পী চম্পা (মালার ভূমিকায়), কুবের (রাইখুল ইসলাম আমাদ), আসাজুল হক মিনু প্রমুখ শিল্পীরা এবং টেকনিসিয়ান, প্রোডাকশনের লোকেরা সবাই আমরা এক টিম স্পিরিট নিয়ে কাজ করছি। ভুলে গেছি, আমাদের বাড়ি এপার বাংলা ওপার বাংলা। শুধুই আমাদের দেহ নয়, আত্মাকেও ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এ দুঃখের নয়, লজ্জার। এ এক অভিশাপ। গৌতম ঘোষ কথা শেষ করার আগেই লোডশেডিং ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে। চারদিকে অন্ধকার। ব্রিজের ওপারে বহুতল বাড়িতে আলো জ্বলছে একটা দু'টো। গৌতম তাকিয়ে থাকেন সেই আলোর দিকে। হয়তো পদ্মার বুকে রাত্রির নৌকার আলোর কথা মনে পড়ছে তাঁর। যিনি আগামী দিনের আলোর স্বপ্নে বিভোর।

– প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি: নিমাই ঘোষ

সাংবাদিকের সংবাদ : কর্তব্যের বেদীতে জীবন
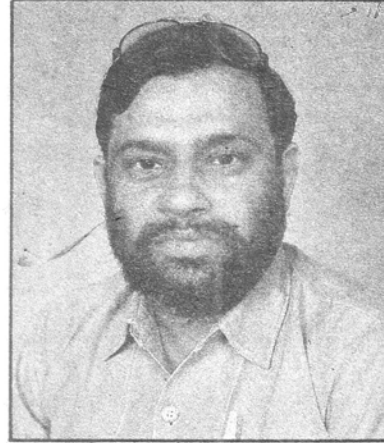
বলবীর সিং সগ্গু নরেন্দ্র শর্মা

কর্তব্যের তাগিদে একজন সাংবাদিক নির্দিষ্ট কাজ সেরে কিভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে উগ্রপন্থীদের ডেরা থেকে ফিরে এলেন, তারই কৌতূহল-কাহিনী পেশ করেছেন সেই সাংবাদিকই।

কয়েক পলকের মধ্যেই পর পর দুটো গুলি বেরিয়ে এল। আমার শরীরের দু'জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা। উষ্ণ তাজা রক্তে পোশাক ভিজে গেল। আমার দু'চোখে বাঁধা ছিল কালো পট্টি। দুটো হাতও নিচে নামিয়ে রাখার আদেশ ছিল। তীব্র যন্ত্রণায় বুঝতে পারছিলাম একটি গুলি লেগেছে বাঁ কানের ওপরে, অন্যটি ঘাড়ে।

মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল। তবু মৃত্যু ভয়ে বিচলিত হইনি। আমার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটি কথাই ভাবছিলাম যে, আমি কিছুতেই মরব না।

আচমকাই ঘটেছিল। কল্পনায়ও ভাবিনি এমন হবে। তাই অকস্মাৎ ঘটনায় আমি আশু পরিণতিকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। এক ভয়ংকর স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। হয়তো সে জন্যই মৃত্যু ভয় আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। টলিয়ে দিতে পারেনি আমার আত্মবিশ্বাস।

হাত দুটি খোলাই ছিল। চাইলে চোখে বাঁধা পট্টি খুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তার অর্থ হত মৃত্যু। আর যাই হোক তখন আমার জীবন টিকে ছিল পট্টি বাঁধা চোখের ওপরই। বিরোধিতা না করলে বেঁচেও যেতে পারতাম। সে জন্যই বন্ধ চোখের অন্ধকারে আমি মৃত্যুর দৃশ্য কল্পনা করছিলাম।

আমার কানের ওপর আর ঘাড়ে বিদ্ধ গুলির গভীরতা বেশি ছিল না। তা বুঝতে পারছিলাম আমি। তা না হলে এতক্ষণ বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই থাকত না। পর পর দুটি গুলি লাগার খানিক বিরতিতে তৃতীয় গুলিটি আমার ডান হাতে কনুই বিদ্ধ করে চলে গেল। যন্ত্রণায় অনুভব করলাম ডান হাত বেয়ে নামছে রক্তের ধারা। রক্তের সে ধারায় টলিয়ে দিচ্ছিল নিজের আত্মবিশ্বাস। মনে হচ্ছিল মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে। আর একটি গুলি, তারপর আমি···

তৃতীয় গুলিটি লাগার পর আমার ইন্দ্রিয়গুলি যেন সজাগ হয়ে উঠল। পলকেই ভেবে নিলাম আমার কি করা উচিত। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ—মৃত্যু। মুহূর্তে ভেবে নিয়ে নিজের শরীর হালকা করে দিলাম। ঘাড়টিও হেলিয়ে দিলাম একদিকে। সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম যেন আমার ধড়ে প্রাণ নেই।

এভাবে শুকনো মাটিতে পড়ে যাওয়ায় চোট অবশ্য লাগল। কিন্তু সুনিশ্চিত মৃত্যুর সামনে তা আর কতটুকু। মাটির ওপর মৃতের মত পড়ে আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছিলাম।

আমি মাটিতে মৃতের মত শুয়ে মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম। ঠিক সেসময় আমার ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল গুলির শব্দে। সেগুলি কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করে নয়। তবে কি বলবীর সিং সগ্গুকে লক্ষ্য করে? পরক্ষণে আবার মনে হল সগ্গুর যদি গুলি লাগত সে নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় চিৎকার করত। কিন্তু তেমন কোন আওয়াজ তো আমার কানে আসেনি। হয়তো সগ্গুকে ওরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ যাতে ওদের অনুসরণ না করে তার জন্য ফাঁকা আওয়াজ করছে। এরকমই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার কানে এল, 'স্কুটার স্টার্ট কর।'

সঙ্গে সঙ্গেই স্কুটার স্টার্ট করল, আর তার শব্দ ক্রমশ দূরে হারিয়ে যেতে থাকল। আমার চোখে পট্টি বাঁধা ছিল। তাই তারা গেছে না গেছে তা অনুমান করা মুশকিল ছিল। তবুও আমার মনে হচ্ছিল যে আমি বেঁচে গেছি। মাথার মধ্যে অকস্মাৎ এই ঘটনার ভয়ংকর পরণতিটি কিলবিলিয়ে উঠছিল। ভাবছিলাম কেন এমনটি হল? আমি তো আগেও বহু সন্ত্রাসবাদীর ইন্টারভিউ নিয়েছি, কিন্তু কখনোই তো এমনটি হয়নি!

মানুষ তার জীবনের জন্য যতই সতর্ক থাকুক তবু যা হবার কথা তা কেউ রুখতে পারে না। যদি তা না হয় তাহলে এমন ঘটনার শিকারই বা আমি হলাম কেন?

অন্যান্য দিনের মত আমি ওইদিনও রোজকার ডাক নিতে হালগেট গিয়েছিলাম। হালগেট হল অমৃতসরে সাংবাদিকদের প্রেস…এরিয়া। বড় বড় পত্রিকার অফিস এই হালগেট-এ। এখানেই সকল সাংবাদিকেরা যে যার পত্রিকার রিপোর্ট পাঠায়।

শোয়া বারটা নাগাদ আমি হালগেট পৌছেছিলাম। তখন ট্রিবিউনের বিনায়ক, এক্সপ্রেসের কাজমী, জনসত্তার মনোহর শর্মা, আকালী পত্রিকার মহেন্দ্র সিং, পাঞ্জাব কেশরীর বলবীর সিং সংগু আর অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুরা ওখানে দাঁড়িয়েছিল। মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড করে আমিও তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অন্যান্যদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমি ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করছিলাম, এমন সময় বলবীর সিং সংগু এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মাজী, সঙ্গে ক্যামেরা আছে?'

'ক্যামেরা আছে কিন্তু ফ্ল্যাস্ নেই।' আমি জবাব দিলাম।

তখন সংগু বলল, 'চল, ফ্ল্যাস্ কিরণ স্টুডিওতে ভাণ্ডারির কাছ থেকে নিয়ে নেব।'

মোটর সাইকেলের ডিক্কিতে ক্যামেরাটি ছিল। আমি ক্যামেরা নেওয়ার জন্য মোটর সাইকেলের দিকে পা বাড়ালাম। তখন সংগু বলল, 'শর্মাজী, যদি একটু আমার সঙ্গে চল তো ভাল হয়। আমার একটি ইন্টাভিউর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বারটায়, এখনই তো শোয়া বারটা বাজছে। তুমি আমাকে ছেড়েই চলে যাবে।'

বলবীর সিং সংগু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই না বলার উপায় নেই। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কোথায় যাবে?'

–'রামতীর্থ মার্গ। খালসা কলেজের পেছনে।' সংগুর কথায় আমি চমকে উঠলাম। চমকে ওঠার কারণ খালসা কলেজের পেছনে আঙুরের বাগান, তারপর জঙ্গল। আমি তাই সংগুকে আবার জিজ্ঞাসা করি, 'কার ইন্টারভিউ করছ?'

'এখনই তো তা বলা মুশকিল।' আসলে সংগু সাংবাদিকতার গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছে। তবে আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি যে কোন সন্ত্রাসবাদীর ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছে।

আমি হালগেট-এ কিরণ সটুডিওর ভাণ্ডারির কাছ থেকে ফ্লাস নিয়ে সংগুকে মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে রামতীর্থ মার্গের দিকে চললাম।

ছাওনী এরিয়া পেরিয়ে আমি যখন রিক্রুটমেন্ট সেন্টারের কাছাকাছি পৌছুলাম, তখন থেকে পাশে পাশে স্কুটারে করে এক শিখ যুবক আমাদের সঙ্গ নিল। যুবকটির পরনে ছিল আকাশী রঙের জিনস আর হলুদ রঙের শার্ট। সে বারবার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, তবু কিছু বললাম না।
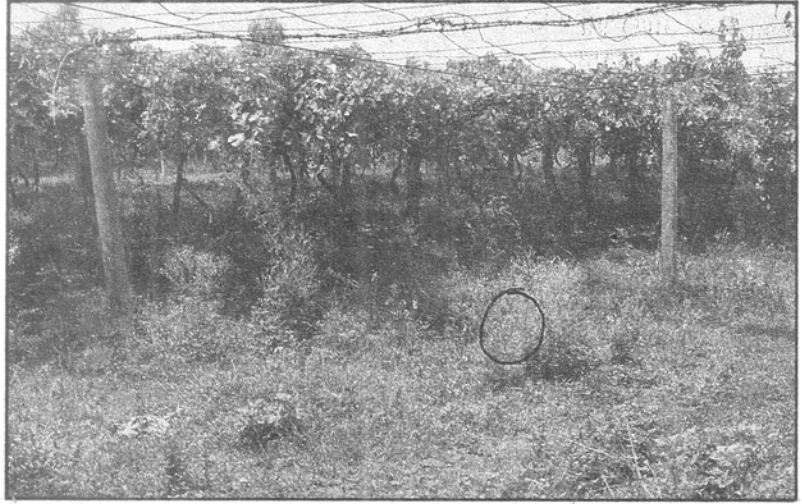
ওই যুবকটি হঠাৎই কাছাকাছি এসে সংগুকে বলল, 'তোমাকে একা আসতে বলেছিলাম, একে সঙ্গে কেন এনেছ?'

–'রামতীর্থ মার্গ! খালসা কলেজের পেছনে!' সংগুর কথায় আমি চমকে উঠলাম। চমকে ওঠার কারণ খালসা কলেজের পেছনে আঙুরের বাগান, তারপর জঙ্গল। আমি তাই সংগুকে আবার জিজ্ঞাসা করি, 'কার ইন্টারভিউ করছ?'

'এ আমার সাংবাদিক বন্ধু নরেন্দ্র শর্মা। আমাকে পৌছে দেওয়ার জন্য এসেছে। পৌছে দিয়েই চলে যাবে।' সংগু যুবকটিকে আমার পরিচয় দিয়ে বলল।

সংগুর কথা শুনে যুবকটি স্কুটারের গতি বাড়িয়ে দিল আর আমাদের বলল পেছন পেছন আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খালসা কলেজের পেছনে এসে পৌছলাম। কলেজের কাছে এসে ওই শিখ যুবকটি কৃষি বিভাগের আঙুর ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও তার পিছু নিলাম। আঙুর ক্ষেতের পাশে পৌছে যুবকটি স্কুটার মাটির রাস্তায় নামাল। তা দেখে আমি মোটরসাইকেলটিকে পাকা রাস্তায় দাঁড় করালাম। সংগুকে বললাম চলে যেতে।

কুখ্যাত সেই ঘটনাস্থল

যুবকটি কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সংগু আমাকে বলল, 'আরও কিছুটা এগিয়ে আমাকে ওই যুবকটির কাছে ছেড়ে দাও।'

আমি সে কথা রাখলাম বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলাম–'কার ইন্টারভিউ নিচ্ছ।'

সংগু বলল, 'আমি ওই মনোচহলের ইন্টারভিউ করব। এই যুবকটি তার খুব বিশ্বাসী।'

আমি যতদূর জানতাম তখন মনোচহল অমৃতসরে ছিল না। এক বিশেষ মিটিং-এ যোগ দিতে পাকিস্তান গেছে। আমি সে কথা সংগুকে বললাম আর সাবধান করে দিলাম 'দেখ কোন ধোঁকায় যেন পা না দাও।' সে কথা শুনে সংগু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'না না, এই ছেলেটি খুবই বিশ্বাসী।'

ওই যুবকের গতিবিধি আর সংগুর কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে শিখ যুবকটি

একজন সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ খুঁজে পাইনি কারণ সগ্গু আর ওই শিখ যুবকটি একে অপরের পূর্ব পরিচিত। সে কথা আমি ওদের কথাবার্তায়ও আন্দাজ করেছিলাম।

যুবকটি কিছু দূর এগিয়ে আঙ্গুর ক্ষেতের পাশে স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও তার পাশে গিয়ে মোটর সাইকেল দাঁড় করালাম। আমাদের দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গুরের ক্ষেত থেকে আরও দুজন শিখ যুবক বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল এ কে ৪৭ রাইফেল। যার হাতে রাইফেল ছিল সে আঙ্গুরের একটি মাচায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক পলকের জন্য সে যুবকটিকে দেখেছিলাম। তার চোখে দেখলাম হিংস্রতা। তবে তার চোখের হিংস্র চাউনি কিংবা এ কে ৪৭ রাইফেলের ভয় আমার কাছে কোন নতুন নয়। এর আগে আমি বহু বারই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গেছি। তাই এসব ব্যাপারকে ততটা গুরুত্ব দিইনি।

স্কুটারের যুবকটি আমাদের পাশে এসে চোখে কালো পট্টি বেঁধে দিল। আমি তাঁকে হাসতে হাসতে বললাম, 'এর প্রয়োজন কি? আমি এর আগেও আপনাদের কাছে এসেছি। মনোচহলের-ইন্টারভিউও আমি করেছি।'

কিন্তু সেই যুবকটি আমার কথা শুনল না। আমার চোখে পট্টি বেঁধে দিল। সগ্গুর চোখেও। পট্টি বেঁধেছিল খুব জোরে। একটু ঢিলে করার জন্য যুবকটিকে বললাম আমি। তখন সে ব্যঙ্গ করে বলল, 'হ্যাঁ জী, এখনই ঢিলে করে দিচ্ছি।'

সে আমার চোখের পট্টি খানিকটা ঢিলে করে খুব জোরে সামনের দিকে ধাক্কা দিল। সামলে না নিলে আমি ছিটকে পড়তাম। ধাক্কায় খানিকটা টালমাটাল হয়ে পড়েছিলাম। তিন চার পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক সে সময়ই বারবার দু'বার গুলি এসে বিঁধল আমার কানে ও ঘাড়ে। আমার আর সগ্গুর সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটতে সময় লেগেছিল মাত্র দশ বারো মিনিট।

মৃতের মত আমি মাটিতে পড়েছিলাম আট দশ মিনিট। তারপরও যখন আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না তখন ভাবলাম সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কাজ সেরে চলে গেছে। নিজেকে সামলে ধীরে ধীরে চোখের পট্টি খুললাম। এ কে ৪৭ রাইফেলধারী যে সন্ত্রাসবাদী আঙ্গুর মাচায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারও দর্শন মিলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অন্য দুই সন্ত্রাসবাদীও নেই। যখন দেখলাম কাছে পিঠে আর কেউ নেই তখন উঠে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক নজর দিলাম।

কিছু দূরে মাটিতে লুটিয়ে ছিল সগ্গু। যেভাবে কিছুক্ষণ আগে আমিও ছিলাম। মনে হল সেও বুঝি বেঁচে আছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি ওর কাছে গেলাম। সগ্গুর শরীরও রক্তে ভিজে গিয়েছিল। তারও গুলি লেগেছিল। আমি তার পা নাড়িয়ে ডাকলাম। কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। ভাবলাম কোন রকমে সগ্গুকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা যদি সত্যি আশে পাশে লুকিয়ে থাকে! তাহলে তো আমাদের আর রেহাই দেবে না।

সগ্গুর দ্রুত চিকিৎসা দরকার। কিন্তু উপায় না দেখে কোন রকমে মোটর সাইকেলের দিকে এগোলাম। মনে হল মোটর সাইকেলের আধখানা হ্যাণ্ডেল নেই। আসলে আমার কনুই-এ গুলি লাগায় এমনটি মনে হচ্ছিল। তবুও কোন রকমে মোটর সাইকেল নিয়ে প্রধান সড়কে উঠে এলাম। ঘটনাস্থল থেকে তা একশ গজের মত।

দেখতে পেলাম প্রধান সড়কের পাশে দু'আড়াইশ লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যারা ঘটনাস্থলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। তার মধ্যে ইউনিফর্ম পরা পুলিশও ছিল এবং বেশ কিছু স্বাস্থ্যবান যুবকও। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই সাহস করে আমাদের কাছে এগিয়ে আসেনি। ভয় পাচ্ছিল ওরা। আমি দ্রুত মোটর সাইকেল চালিয়ে আট কি·মি· দূরে হালগেট-এ পৌছলাম। সাংবাদিক বন্ধুদের জানালাম। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু খবর পেয়েই ছুটে গেল ঘটনাস্থলে। আমি এক বন্ধুর সঙ্গে ওই মোটর সাইকেলেই গেলাম ডাঃ চাওলার চেম্বারে। ডা· চাওলা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সমিতির সভাপতি এবং তাঁর নামও ছিল সন্ত্রাসবাদীদের হিট লিস্টে। ডাঃ চাওলা আমার চিকিৎসা করলেন।

> সে আমার চোখের পট্টি খানিকটা ঢিলে করে খুব জোরে সামনের দিকে ধাক্কা দিল। সামলে না নিলে আমি ছিটকে পড়তাম। ধাক্কায় খানিকটা টালমাটাল হয়ে পড়েছিলাম। তিন চার পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক সে সময়ই বারবার দু'বার গুলি এসে বিঁধল আমার কানে ও ঘাড়ে। আমার আর সগ্গুর সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটতে সময় লেগেছিল মাত্র দশ বারো মিনিট।

পরে জানতে পারলাম বন্ধুদের পৌছানোর আগেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সগ্গুকে তুলে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলাম সগ্গু মারা গেছে। পুলিশও তাঁর আইনানুগ কাজ কর্ম শুরু করে দিয়েছে।

আমি তো মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু সগ্গুর মৃত্যু আমার কাছে চিরজীবনের জন্য বিষাদময় হয়ে থাকল। আগে থেকে সাবধান হলে এমন মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটত না।

১২ নভেম্বর '৯০-র দুপুরের সেই বীভৎস ঘটনার এক একটি দৃশ্য আজও আমার প্রতিটি রোমকূপ কাঁপিয়ে তোলে। অবশ্য সেদিনও আমি ভয় পাইনি, আজও নয়। আমাকে বিচলিত করেছে সগ্গুর মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীরা ওকে মারল এইজন্য যে সে ছিল সি পি এমের কার্ড হোল্ডার এবং পাঞ্জাব কেশরীর সংবাদদাতা। এটাই তার দোষ। তার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের কতই না হুমকি খেয়েছে সে। কিন্তু তবুও সে পিছিয়ে পড়েনি কোনদিন। তার কলম চলেছিল সমান তেজে। হয়তো আমাকে ওরা মারতে চায় নি। কেন চায়নি, কেন ছেড়ে গেল—তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

গত ২০ বছর ধরে বলবীর সিং সগ্গু সংবাদ জগতের সঙ্গে জড়িত ছিল। চৌদ্দ পনের বছর ধরে জলন্ধরের 'নয়াজমানা'র উপসম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিল। গত দেড় বছর ধরে সে জলন্ধরের 'পাঞ্জাব কেশরী'র অমৃতসরের রিপোর্টিং করত। তার দু মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে এক মেয়ে ইকনমিক্স-এ এম·এ· অন্যজন বি·এ· বি এড।

তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সরকার মাত্র ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করেছে। দশ হাজার দিয়েছে পাঞ্জাব কেশরী আর বার হাজার দিয়েছে অমৃতসরের প্রেস অ্যাসোসিয়েশন।

বলবীর সিং সগ্গুকে খুন করার পর সন্ত্রাসবাদীরা অমৃতসরের আরেক ফ্রিলান্স সাংবাদিক অমরনাথ বর্মাকে খুন করে। তবে এ কাজ মনোচহলের নয়, খালিস্তান কমাণ্ডো ফোর্সের বলে শোনা যায়। অমরনাথ বর্মার হত্যার কিছু দিন বাদে এক সন্ত্রাসবাদীর লাশ পেয়েছিল পুলিশ। পুলিশ জানায় এই সন্ত্রাসবাদীর গুলিতেই নিহত হয়েছিল সগ্গু আর অমরনাথ। সেই লাশ সনাক্ত করতে পুলিশ কিন্তু আমাকে ডাকেনি।

বলবীর সিং সগ্গুর মৃত্যুর পর এক বছর কেটে গেল। তথাপি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা কেউই তাকে ভুলতে পারেনি। সাংবাদিকতার জন্য তার এই আত্মত্যাগ আমাকে প্রেরণা দেয়। সেজন্য আজও আমরা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কখনোই সন্ত্রাসবাদীর ভয়ে কলম বন্ধ করব না।

নরেন্দ্র শর্মা

মীনা কুমারীর সঙ্গে দুর্গা খোটে

দুর্গা খোটে : সংগ্রাম ও সাফল্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক

সাল টা ছিল ১৯৩০-৩১, সাইকেল রেস প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আমি লাহোর থেকে পুণায় আসি। সকালে সংবাদপত্রের একটি সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়ে, তাতে ছাপা হয়েছিল—বোম্বের প্রসিদ্ধ সলিসিটর লর্ড-এর কন্যা ও একটি স্বনামধন্য বংশের পুত্রবধূকে এই প্রথম দেখা যাবে 'ফরেবী জাল' অর্থাৎ 'দি ট্রেপ্ড' ছবিতে। আমার পাশেই বসে ছিলেন বোম্বের এক সাইকেল চাম্পিয়ান, জাতিতে মারাঠী—বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ কি দিনকাল পড়েছে, এখন বড় ঘরের মেয়ে বৌয়েরাও সিনেমায় অভিনয় করতে নেমেছে। স্যার পাণ্ডুরঙ শ্যাম রাও লর্ড একজন নামকরা সলিসিটর আর তাঁর বংশও খুব মর্যাদাসম্পন্ন। তাছাড়া মান সম্মানের দিক থেকে খোটে পরিবারেরও কোন তুলনা হয়না। কিন্তু দুর্গা খোটে একি করলেন, বাবার বংশ আর শ্বশুরের বংশের উপর এ কোন কালির দাগ লাগিয়ে দিলেন!' সেই মারাঠী ভদ্রলোকটি এ ব্যাপারে আমাকে এত বেশি কৌতূহলী করে তুলেছিলেন যে, সে সন্ধ্যায় আমি 'ফরেবী জাল' ছবিটি দেখতে বাধ্য হই। আর তার ঠিক অল্প সময়ের ব্যবধানে আমি ভি· শান্তারামের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে যাই। দেখি তাঁর পাশের চেয়ারেই একজন অসামান্য সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঠিক যেন মহারানীর মতই বসে আছেন। ভি· শান্তারাম সেখানেই দুর্গা খোটে নামের সেই সুন্দরী ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই আমার তিন তিনটি ছবির নায়িকা, আমার নতুন ছবি 'অমর জ্যোতি'তেও ইনি অভিনয় করছেন নায়িকার ভূমিকায়।

এক অনবদ্য ভূমিকায় দুর্গা খোটে

দুর্গা খোটে আলাপের মুহূর্তে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'আপনার বিষয়ে আমি পত্রপত্রিকায় অনেক পড়েছি, আপনিই তো একবার জার্মানীতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন।'

দুর্গা খোটের জন্ম ১৩ জানুয়ারি।১৯০৫ সালে বোম্বের এক সুবিখ্যাত সলিসিটর স্যার পাণ্ডুরঙ শ্যামরাও-এর ঘরে। পড়াশোনা করেন ক্যাথিড্রাল হাইস্কুল তথা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, সেখানে তখন শুধুমাত্র ইংরেজ এবং সম্পন্ন ঘরের ছেলে মেয়েরাই পড়াশোনার সুযোগ পেত। যখন তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্রী তখনই তাঁর বিয়ে হয় এক বিলেত ফেরৎ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক বিশ্বনাথ খোটের সঙ্গে। বাবার ইচ্ছে ছিল এমন পরিবারে বিয়ে হলে দুর্গা বিয়ের পরেও তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দুর্গা খোটের শ্বাশুড়ীর তা পছন্দ ছিল না। সে যাই হোক, বিয়ের আড়াই বছর পর স্টক মার্কেটের ব্যবসায় খোটে পরিবার বিপর্যয়ের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। তখন বিশ্বনাথ খোটেকে মাত্র ১৫০ টাকার মাসিক বেতনে চাকরি করতে হয়। দুর্গা খোটেকেও পায়ে হেঁটে অন্যের বাড়িতে গিয়ে টিউশানি করতে হয়। শুধু তাই নয় সে সময় তিনি মোহন ভওনানীর নির্বাক ছবি 'ফরেবী জাল'-এর একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হন। যদিও সে ছবি সফল হয়নি। কিন্তু ভি· শান্তারাম সে ছবিতে দুর্গা খোটের অভিনয় দেখে ভীষণ খুশি হন। তখন তিনি রাজা হরিশচন্দ্র ও মারাঠী ছবি 'অযোধ্যাচা'র জন্য নতুন নায়িকার সন্ধান করছিলেন। সুতরাং সময় পেতেই তিনি দুর্গা খোটের সঙ্গে দেখা করার জন্য বোম্বে চলে আসেন। হিন্দি আর মারাঠী ভাষায় তৈরি ছবি দুটিতেই ভি· শান্তারাম তাঁকে সুন্দরভাবে কাজে লাগান আর তারপর থেকেই দুর্গা খোটের সফলতার শুরু হয়। ভি· শান্তারামও তখন থেকে চলচ্চিত্র জগতে সুবিখ্যাত হয়ে ওঠেন। দুর্গা খোটের অভিনয় থেকে দেবকী বসুও কলকাতা থেকে ছুটে আসেন বোম্বেতে। তৈরি করেন 'আফটার দ্য আর্থ কোয়াক' এবং 'জীবন নাটক'—যে দুটি ১৯৩৫-এ প্রদর্শিত হয়। 'রাজা হরিশচন্দ্র'র সফলতার পর ভি· শান্তারাম তৈরি করেন 'মায়া মছন্দর' এবং 'অমর জ্যোতি' তথা তাঁর গুরু বাবু রাও পেন্টারকর দুর্গা খোটেকে নিয়ে অভিনয় করান তাঁর 'প্রতিমা' ছবিতে। এর সবকটিই ভীষণভাবে সফল।

১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দুর্গা খোটে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে স্টার অভিনেত্রী ছিলেন। সে সময় যদিও তাঁকে তাঁর সমকালীন অভিনেত্রী সুলোচনা (রুবী মায়ার্স), দেবিকা রানী, জুবেদা, অজমত বিবি, খুর্শীদ, যমুনা, গৌহর বাঈ, কজ্জন, মাধুরী, বিব্বো, শোভনা সমর্থ (নুতন ও তনুজার মা), ললিতা পাওয়ার, লীলা চিটনীস, নূরজাহান প্রভৃতি স্টার অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়েছিল—তবুও তিনি নিজের আসনে ঠিক একই মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

১৯৪৮ সালেই তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর, তাই বয়সের দিকে তাকিয়ে তিনি চরিত্র অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য এবং অভিনয় সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাই তাঁকে ১৯৭৮ পর্যন্ত দর্শকদের বিপুল প্রশংসার অধিকারী করে রাখে এবং বলা যায় অনেকটা দর্শকদের চাহিদা মেটাতেই তিনি সে পর্যন্ত অভিনয় করতে বাধ্য হন। তারপরই তিনি এই চলচ্চিত্র জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেন। আর আজকের নির্বাসন তাঁর বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ থেকে। এরপর যা কিছু থাকবে সে তাঁর স্মৃতি আর সেলুলয়েডে ধরে রাখা অভিনয়।

– জানকী দাস

প্রতি লীটার পেট্রলে আপনি যেতে পারেন বেশী দূরে, আর বাঁচাতে পারেন খরচ।

নীচের উপায়গুলি অবলম্বন ক'রে :

ক্লাচ ব্যবহার করবেন বুঝে সুঝে
ক্লাচের প্রয়োগ শ্রেফ্ গীয়ার বদলের সময়েই করবেন। ক্লাচ দাবিয়ে রাখলে ক্লাচ প্লেটের লাইনিং তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়, শক্তির অপচয় হয়। ফলে জ্বালানী খরচ বেশী হয়।

ফিল্টার হামেশা পরিষ্কার রাখবেন
পরিষ্কার ফিল্টার ইঞ্জিনকে ধুলো ময়লার হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে ইঞ্জিন বেশীদিন চলে আর আপনার পেট্রল খরচ কম হয়।

ইঞ্জিনের টিউনিং যেন সর্বদা ঠিক থাকে
আপনার বাহনের টানবার শক্তি যদি কম হয় বা অধিক পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়ে, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে চেক্ করান। ইঞ্জিনের টিউনিং ঠিকমত না হ'লে জ্বালানী খরচ বেশী হয় এবং সেইসঙ্গে তা বায়ু-দূষণেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সঠিক গ্রেডের অয়েল ব্যবহার করবেন
আপনার বাহনের জন্য সঠিক গ্রেড/শ্রেণীর তেলই ব্যবহার করবেন।

টায়ারে হাওয়ার প্রেসার ঠিক রাখবেন
টায়ারে হাওয়ার প্রেসার সর্বদা ঠিক মাত্রায় রাখা জরুরী। টায়ারে হাওয়ার চাপ কম হ'লে ২৫% পর্যন্ত জ্বালানীর অপচয় হ'তে পারে।

পেট্রলিয়াম কনর্জারভেশন্
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন
পোঃ বক্স নং ৫৭২, নিউ দিল্লী-১১০০০১

PETROL
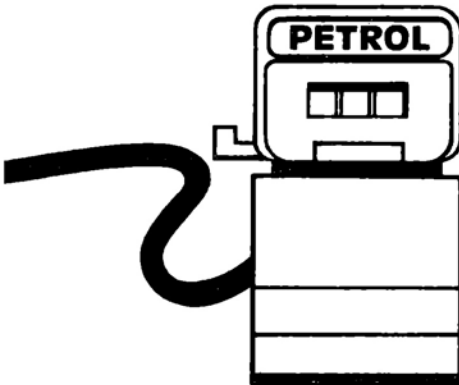
দয়া ক'রে নীচের বিষয়ে বিনামূল্যের পুস্তিকা পাঠান :

☐ আপনার গাড়ি জানুন বুঝুন ☐ ডীজেল বাঁচান
☐ ২/৩ হুইলার ☐ পেট্রল বাঁচানোর উপায়

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

রাজ্য ____________ পিন ____________

দেশ-বিদেশের হালফিল হালহকিকৎ নিয়ে কার্টুনিস্টরা কিভাবে ভাবেন এবং ছকেন, আলোকপাত-এর নির্বাচনে তেমন কিছু ব্যঙ্গচিত্র পাঠক সাধারণের জ্ঞাতব্যে পরিবেশিত হল।

সৌজন্য : 'হিন্দুস্থান টাইম্স' ১৩ অক্টোবর ১৯৯১

সৌজন্য : 'নব ভারত টাইম্স' ১২ অক্টোবর ১৯৯১

সৌজন্য : 'রাষ্ট্রীয় সহারা' ৮ অক্টোবর ১৯৯১

সৌজন্য : 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ১ অক্টোবর ১৯৯১

সৌজন্য : 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ১৩ অক্টোবর ১৯৯১

সৌজন্য : 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

Regd. No. AD-212
Lic. No. U/AD-1
ALOKPAAT
November 1991
RNI No. RN 42171/86
Rs. 9.00 Per Copy